সাংস্কৃতিকী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : কার্ত্তিক ১৩৭২

প্রকাশক
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীমন্মথনাথ পান
কে. এম্. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীকানাই পাল

ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

সূচী-পত্র

॥ ওঁ ॥ শ্রীঃ ॥

১৯০১ সালে

পুণ্যশ্লোক মতিলাল শীলের

অবৈতনিক বিদ্যালয়ে

ছাত্রাবস্থা হইতে,

সুখে দুঃখে উৎসবে ব্যসনে

৬৪ বৎসরের

অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস

করকমলে।

শ্রীসুনীতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী

২৮ শ্রাবণ ১৮৮৭ শকাব্দ

৭ ভাদ্রপদ ২০২২ সংবৎ

১৯ আগস্ট ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ ॥

অভিভাষণ*

আপনারা আমায় আপনাদের বার্ষিক সভায় আহ্বান ক'রে আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন। আমি নিজেকে এ আহ্বানের এ সম্মানের নিতান্ত অযোগ্য ব'লে মনে করি। ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনে অবস্থান আর অধ্যয়ন কর্‌বার সুযোগ আমার হয়-নি, সুতরাং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ব'লে যে গৌরব আপনারা অনুভব করেন, তা থেকে আমি বঞ্চিত। কিন্তু গত আট-দশ বছর আগে যখন আমি প্রথম শান্তিনিকেতন আশ্রম দেখ্‌তে আসি, তখন থেকেই আশ্রমের সঙ্গে মনে-মনে আমি একটি যোগ অনুভব ক'রে আস্‌ছি। তাতে আমিও যে শান্তিনিকেতনেরই একজন, এই রকম একটা ধারণার অধিকারী হ'তে পেরেছি। আর তা ছাড়া, আপাতত আমাকে শান্তিনিকেতনের একজন ছাত্র ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। শান্তিনিকেতনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা আর আদরের সঙ্গে দেখি ব'লে, আর এখানকার অধ্যাপক আর ছাত্র অনেকের স্নেহ আর প্রীতি লাভ ক'র্‌তে পেরেছি ব'লে, আপনাদের এই আহ্বান আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছি।

যে পুরুষশ্রেষ্ঠের চরণতলে ব'স্‌তে পাওয়ার ফলে আপনাদের ছাত্রজীবন মহনীয় হ'য়ে উঠেছিল,—সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হ'লেও, কৈশোরের অবসানের সময় থেকেই পরোক্ষভাবে তিনি আমার আর আমার মতন অনেকেরই গুরুদেব। আপনারা তাঁকে বরাবরই অতি নিকটে পেয়েছিলেন, পেয়ে আছেন; শ্রেষ্ঠ এক গৌরবের অধিকারী আপনারা। এই মহৎ সান্নিধ্যে আপনাদের জীবন উজ্জ্বল হ'য়েছে নিশ্চয়ই—জীবনে কতগুলি উচ্চ প্রেরণা আপনারা লাভ ক'রেছেন নিশ্চয়ই। যাঁরা আপনাদের মতন তাঁকে কৈশোরে বা যৌবনে ব্যক্তিগতভাবে আচার্য্য রূপে দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেন-নি, তাদেরও অনেকের কাছে তাঁর গান আর কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সেই প্রেরণা অন্তত কিছু পরিমাণে এসে পঁউচেছে। কারণ খালি বাঙালী বা বাঙলা-পাঠীর কাছে নয়, পৃথিবীর সব দেশের চিন্তাশীল মানুষের কাছে তিনি একজন বরেণ্য আচার্য্য, অন্যতম যুগন্ধর গুরু।

---

* শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সভাপতি কর্তৃক পঠিত (৮ই পৌষ, ১৩৩১)।

যে বাণী নোতুন ক'রে আমাদের গুরুদেব এই শান্তিনিকেতনের মধ্যে থেকে প্রচার ক'রে বিশ্বকে আহ্বান ক'রছেন, যে বাণী এই ঘৃণা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বময় জগতে লোকের মনে প্রীতি-মৈত্রী-শান্তির ভাব আন্‌তে সাহায্য ক'রবে আর ক'রছে, সেই বাণী হ'চ্ছে বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষেরই বাণী। সুদূর অতীতে ভারতে আর্য্যের সঙ্গে কোল-দ্রাবিড়-মোঙ্গোলের মিলন আর সংমিশ্রণের পর থেকে, যখন ভারতের সভ্যতা বিশিষ্টতা লাভ ক'রে দাঁড়াল', তখন-থেকেই ভারতবর্ষ এই বাণী প্রচার ক'রে আস্‌ছে। যুগ-যুগ ধ'রে ঋষি যতি ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পরিব্রাজক, সাধু সন্ত বৈরাগী, এমন কি ভারতের মুসলমান পীর ফকীর দরবেশ, সেই এক-ই বাণী বহন ক'রে আস্‌ছেন। সেই বাণী হ'চ্ছে অহিংসার আর ত্যাগের, মৈত্রীর আর করুণার, জিজ্ঞাসার আর পরিপৃচ্ছার, আর শ্রেয়ের অনুসন্ধানের। উপনিষদ্‌, মহাভারত, বৌদ্ধশাস্ত্র, মধ্যযুগের সাধুসন্তদের কবিতা গান, দক্ষিণের ভক্তদের গান প্রভৃতি যে-সমস্ত রচনায় এই বাণী রক্ষিত হ'য়ে আছে, সেই-সব রচনা; যে-সমস্ত ব্যক্তিগত আর সমাজগত আচার-অনুষ্ঠানে এই বাণীর পরিপোষকতা ক'রতে সাহায্য ক'রেছে, সেই-সমস্ত আচার অনুষ্ঠান; যে-সমস্ত সুকুমার কলায় শিল্পে গানে কাব্যে সাহিত্যে এই বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতীয় চিত্তের মনোহর প্রকাশ হ'য়েছে, সেই-সমস্ত সুকুমার শিল্প আর সাহিত্য; যে-সমস্ত গভীর দর্শনে আর অন্য আলোচনায় এই বাণীর দৃঢ় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হ'য়েছে, সেই-সব দর্শন আর চিন্তা; এক কথায়, গত আড়াই বা তিন হাজার বছর ধ'রে ভারতের যা কিছু সু-কৃতি ভারতের যা কিছু সৃষ্টি, যা মানুষকে উচ্চ-লোকে নিয়ে যেতে চায়, সে-সবই হ'চ্ছে আমাদের অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয়দের পিতৃ-পুরুষদের কাছ-থেকে পাওয়া রিক্‌থ। এই রিক্‌থ হ'চ্ছে মানব জ্ঞান-ভাণ্ডারে, মানবের সৃষ্ট সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে একটি শ্রেষ্ঠ জিনিস। এই রিক্‌থ এখন আর কৃপণের ধনের মতো কেবল ভারতবর্ষেরই সম্প্রদায়-বিশেষের পেটক-বদ্ধ রত্ন ক'রে রেখে দেবার বস্তু নয়। বাইরের লোকে এখন এই রত্নের খবর পেয়েছে—আর আমাদের কাছ থেকে এর উদ্ধার ক'রে তাকে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। সমস্ত বিশ্ব এখন এই রিক্‌থের অধিকার চায়। আর আমাদের প্রসন্ন মনে যতদূর আমাদের দ্বারা সাধ্য হবে তাদের সেই অধিকারের দাবী মেনে নিতে হবে। আমাদের কাছ থেকে বিশ্বের যা আবশ্যক তা বিশ্ব নেবেই। আমাদেরও কর্তব্য আছে—পরিবর্তে বিশ্বের কাছ থেকেও কিছু নেওয়া। বিশ্বের মানব কোথায় কখন্‌ সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ লাভ ক'রেছে, কোথায় সৎ-এর কোন্‌ দিক দেখ্‌তে

পেয়েছে তা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা ক'রে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষ থেকে প্রাপ্ত রিক্থকে আরও শোভা সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণতা উপযোগিতায় সমৃদ্ধ ক'রে তুল্‌তে হবে। তা না হ'লে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকটে আমাদের যে ঋণ আছে তা শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না। যখনই বাইরের মানুষের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগ ঘ'টেছে, আমরা তখনই তাদের কাছ থেকে তাদের শ্রেষ্ঠ জিনিস, যা আমাদের ছিল না বা থাক্‌লেও যাতে আমরা প্রাবীণ্য লাভ ক'র্‌তে পারি-নি, তা কিছু-না-কিছু তাদের শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে শিখে নিয়েছি। আর এই নেবার ফলে আমাদের জাতীয় সভ্যতা জাতীয় আত্মা বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ ক'র্‌তে পেরেছে। এইতেই না কতকটা গ্রীকের শিক্ষায় ভাস্কর্য্য-শিল্পে আর জ্যোতিষে প্রাচীন ভারতের উন্নতি; এইতেই না আমাদের জ্ঞাতি ঈরানী মুসলমানের সংস্পর্শে এসে ভারতের মধ্য-যুগের কবীর নানক প্রমুখ সন্ত গুরুদের চিন্তার আর অনুভূতির অপরূপ বৈচিত্র্য আর তার অমৃতময় প্রকাশ; এইতেই না আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, বিদেশের সাহিত্যের সোনার কাঠি ছোঁয়ানোর ফলে, নোতুন প্রাণ পেয়ে অপূর্ব শক্তি আহরণ ক'রে বিশ্বসমক্ষে দাঁড়াবার অধিকারী হ'য়েছে।—কিন্তু আমাদের দেবারও যে কিছু আছে; কাজেই এখানে নেবার কোনও লজ্জা নেই; এ হ'চ্ছে প্রদানের পরিবর্তে আদান,—এ বিনিময়, ভিক্ষা নয়। বিশ্বের অংশ আমরা, আমরা বিশ্বের সঙ্গে সাহচর্য্য ক'রে চ'ল্‌বো। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা রামমোহন থেকে আমাদের পূজনীয় গুরুদেব, সমস্ত দূরদর্শী মহাপুরুষ আমাদের এই সাহচর্য্য ক'র্‌তেই উপদেশ দিচ্ছেন, আর তাঁরা নিজেরাও সেই সাহচর্য্য ক'রে আমাদের পথ দেখিয়েছেন।

আমাদের বিশ্বভারতী বিশ্বের সাম্‌নে ভারতের আদর্শকে ধ'রে তুল্‌তে চান। মানবের সুখশান্তি পরমার্থ লাভের পথে পৃথিবীতে এ আদর্শের সার্থকতা আছে; বিশেষত পাশ্চাত্য জগতে যে আছে, এ কথা বহু পাশ্চাত্য মনীষী স্বীকার ক'রেছেন। The world must be Indianised, ভারতকে বিশ্বময় ছড়িয়ে' দিতে হবে; ভারতের সভ্যতার বাহ্য বর্ণ-চিহ্ন বা তকমা সব জাতকে পরাবার চেষ্টা ক'রে নয়, কারণ এই বর্ণ-চিহ্নটি ভেদ আর বিরোধের সৃষ্টি করে; কিন্তু ভারতের সূক্ষ্ম গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে যে পরমত-সহিষ্ণুতা আছে, ভারতের জীবনের সব দিকের মূলে যে তিতিক্ষা যে মৈত্রী যে শান্তি যে

অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান, তাদের জীইয়ে' রেখে, জাগিয়ে' রেখে, সবল রেখে ; আর বিশ্বমানবের মনে যেখানে এর অনুকূল ভাব প্রকট বা সুপ্ত, অস্ফুট বা পীড়িত হ'য়ে আছে, তার সঙ্গে ভারতের এই জীবনীবাহী শিক্ষার যোগ সাধন ক'রে। আর কেবলমাত্র সেইটি করবার চেষ্টা ক'রে নয় ; নিজেদের আত্মিক উন্নতির জন্য বিশ্বকেও আমরা ভারতের ভিতরে আনবো। কাউকে আমরা অস্বীকার ক'রবো না ; কারণ সকলেই বিরাট্ বিশ্বপুরুষের অংশ। সকলের উৎকর্ষ আমরা গ্রহণ ক'রবো, সকলের সুকৃতির ফল আমরা নেবো। খ্রীষ্টান সাধুর এই উক্তি আমাদের মন্ত্র ক'রে নিতে হবে—

> Finally, brethren, whatsoever things are true,
> Whatsoever things are just,
> Whatsoever things are pure,
> Whatsoever things are lovely,
> Whatsoever things are of good report :
> If there be any virtue, and if there be any praise,
> Think on these things.

পৃথিবীর মধ্যে সৎ চিন্তার পোষক যা কিছু, মানুষের দেহের মনের আর আত্মার স্বাধীন বিকাশের অনুকূল যা কিছু আছে, তার সম্বন্ধে আমাদের ভারতীয় প্রাণের সম্পূর্ণ অনুমোদন আর সহযোগ আছে। আমরা যে অতি সহজেই সকলকে মেনে নিয়েছি—আমাদের ঋষি আচার্য্য সাধক সকলেই বিশ্বমৈত্রীর উপদেশ আমাদের যুগ যুগ ধ'রে দিয়ে আসছেন :

> যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি,
> সর্বভূতেষু চাত্মানং—ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

'যিনি সমস্ত প্রাণীকে আপনাতে দেখেন, আর আপনাকে সমস্ত প্রাণীতে দেখেন, তিনি কারও কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে' নেন না, কাকেও ঘৃণা করেন না।'

'আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ', 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এ-সব তো আমাদের দেশের অতি সাধারণ কথা ; লাতীন লেখকের homo sum, humani nihil a me alienum puto—'মানুষ আমি, মানুষ-সংক্রান্ত এমন কিছু নেই যাকে আমি নিজের থেকে দূরের জিনিস ব'লে মনে করি'—এইরূপ ভাব আনবার মতন মানসিক অবস্থায় আসতে আমাদের বেশী পরিশ্রম ক'রতে হয় না।

আমরা মানবের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে আস্থাবান্। যদিও এখন আমরা চারিদিকে নানা অত্যাচার অশান্তি অধঃপতন অন্যায় দেখ্‌তে পাচ্ছি, তবু মোটের উপর মানুষ উচ্চ থেকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হ'চ্ছে, এটা আমরা মনে করি। অন্যায় অত্যাচার দুঃখ ক্লেশ নেই এমন সত্যযুগ কোনও কালে ছিল না ; এ কথা ইতিহাস আমাদের ব'ল্‌ছে, যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচার ক'র্‌লে এ কথা মান্‌তেই হবে। কল্পনায় এক সত্যযুগকে খাড়া ক'রে তার উপর অন্ধ ভক্তি এনে বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা ক'র্‌লে জাতীয় জীবনে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কিছু হবে না। আগেকার যুগে মানুষের অনুভূতির প্রসার ছিল অল্প, অল্প জায়গার মধ্যে নিজের গণ্ডীর অন্তর্গত ভাবরাজী নিয়েই সাধারণত তার কারবার ছিল ; সে জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী হ'লে তার সেই অল্পকেই তাকে অত্যন্ত গভীরভাবে জান্‌তে হ'ত, তার পক্ষে আর অন্য উপায় ছিল না। সাধারণ লোকে সেই অল্পটুকুর ভিতরে কি খুব গভীরভাবে নাম্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ত, বা নাম্‌ত ? হয়-তো কোথাও তা ক'র্‌ত, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা বলা যায় না। কিন্তু এখন আমাদের ভাবরাজ্য বহুবিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে। এতে গভীরতার বদলে বিস্তারের দিকেই আমাদের ঝোঁক হ'য়েছে। বিস্তার জিনিসটা মন্দ নয়, যদি তা কেবল উপর-উপর, কেবল ভাসা-ভাসা না হয়। কিন্তু যথার্থ পণ্ডিতের পক্ষে বিস্তার আর গভীরতা দুই-ই সাধন করা এখনই সম্ভবপর হ'য়েছে। আগে সে সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে সাধারণ লোক যাঁরা, তাঁদের পক্ষে দুটো সাধন করা সব সময়ে সম্ভব হবে না। একটি বিষয় আমরা ভালো ক'রে জানি, আর বাকী সবের যেন রসাস্বাদ কর্‌বার অধিকার রাখ্‌তে পারি। একটি বিষয়ে গভীর না হ'লে আমাদের তাল ঠিক থাক্‌বে না, বহু বিস্তারের ফলে আমরা পথভ্রষ্ট হ'য়ে মনো-রাজ্যে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে থাক্‌বো, জ্ঞানের লক্ষ্য আমাদের ঠিক থাক্‌বে না। আবার কোনও বিশেষ ভাবরাজীকে ভাল ক'রে জান্‌তে হ'লে কেবলমাত্র তাতেই আবদ্ধ থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। ব্যাপকভাবে দেখ্‌লে তবে প্রত্যেক জিনিসের যথার্থ পরিচয় হয়। পরিধি না থাক্‌লে কেন্দ্র কোথায় ? মানসিক রাজ্যে কেন্দ্রের যেমন আবশ্যকতা, পরিধিরও তেমনি আবশ্যকতা আছে। আমাদের মনের গতি এই যুগে হ'চ্ছে পরিধিমুখী ; আগে ছিল কেন্দ্রমুখী। শ্রেষ্ঠ মানসিক উৎকর্ষ হয় দুইয়ের সামঞ্জস্যে। নানা রাজনৈতিক কারণে, আত্মরক্ষার চেষ্টায়, বাইরের পরিধির প্রতি আমাদের দেশের লোকের একটা অশ্রদ্ধা একটা অবজ্ঞার ভাব এখন জেগে উঠেছে। যাতে বাহির এসে আমাকে ডুবিয়ে' দিতে না পারে,

আমাকে ভাসিয়ে' নিয়ে না যায়, সেই-জন্যে বাহিরকে অস্বীকার ক'রে বর্জন ক'র্‌তে পার্‌লেই, আমার কেন্দ্রকে আঁক্‌ড়ে' ধ'রে থাক্‌তে পার্‌লেই আত্মরক্ষা হবে। এইরূপ মনোভাবের কারণ বুঝ্‌তে পারা যায়, আর এর স্বপক্ষে হয়-তো যুক্তিও থাক্‌তে পারে। কিন্তু পরিধির দিকে চাইলেই কেন্দ্রচ্যুত হয় তারা, যারা জানে না কেন্দ্রের স্বরূপটি চিনে নিয়ে ঠিকমতো কোথায় তার সঙ্গে বজ্র-বাঁধনে অচ্ছেদ্য-যোগে বদ্ধ থাক্‌তে পারা যায়। আমাদের জাতীয় জীবনের জাতীয় উৎকর্ষের কেন্দ্র কোথায় তা যদি আমরা সত্যরূপে জান্‌তে পারি, আর তা জেনে, আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনে তার আবশ্যকতা প্রণিধান ক'রে, আমাদের কাছে তা কতখানি সত্য তা যদি বুঝ্‌তে পারি, তা-হ'লে বাইরে যত দূরেই আমাদের চিন্তার ব্যাসার্ধ প্রসারিত হোক্ না কেন, আমরা ঠিক্ থাক্‌বো। আগে নিজেকে জানা দরকার, ভালো ক'রে জানা দরকার; আবার সেই জানা পূর্ণ ক'র্‌তে গেলে বাহিরকেও জানা দরকার। এই দুইয়ে জড়িয়ে' পূরা এক চক্র। আত্মজ্ঞানের জন্যে বাহিরের উপযোগিতাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হয়।

আমাদের ভাবরাজ্য বহুবিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে। খ্রীষ্টীয় বিংশ শতকে আমরা অবস্থান ক'র্‌ছি। এক আমাদের নিজেদেরই ভারতীয় জগৎ র'য়েছে—তার ভাবরাজ্য কত বড়ো! আমাদের প্রাচীন কথা বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বৌদ্ধ কাল, মৌর্য্য-যবন-শক-গুপ্ত-কালের কত বিচিত্র উৎকর্ষকে অবলম্বন ক'রে, উত্তর-ভারতীয় আর দক্ষিণ-ভারতীয় আর্য্য-দ্রাবিড় জা'তের কত কীর্তি কত সৌন্দর্য্য- আর সাহিত্য-সৃষ্টিকে নিয়ে আমাদের মুসলমান-পূর্ব যুগের কথা; তারপর নানা নূতন কৃতিসম্ভার নিয়ে আমাদের মুসলমান যুগ আছে। এক ভারতেই কত না বৈচিত্র্যের সমাবেশ, কত না বিভিন্ন প্রকারের ভাবসম্পদ্। তেমনি অন্য-অন্য কত দেশে মানুষ কত না ভিন্ন রূপে সভ্য হ'য়ে, কত নোতুন জিনিস আমাদেরই জন্য উদ্ভাবন ক'রে ইতিহাসের পথ বেয়ে চ'লে এসেছে, আস্‌ছে,—আর কত ভিন্ন ভিন্ন যুগ ধ'রে। সে-সবের ছিটে-ফোঁটা তো বাঙলা-দেশেই ব'সে-ব'সে আমি আস্বাদ ক'র্‌তে পার্‌ছি। Culture বা মানসিক উৎকর্ষ এখন জাতিবিশেষের কৃতিকে অবলম্বন ক'রে নেই, Culture এখন বিশ্বমানবের সাধারণ সৃষ্টি আর সাধারণ সম্পদ্, সমগ্র জগতে এখন এক, এতে আজ কোনও জা'ত বাদ প'ড়্‌তে পারে না। এই সাত-আট হাজার বছর ধ'রে

সভ্য হবার পর মানুষ যা ক'রেছে, সে সমস্তের হক্‌-ওয়ারিসান মালেক হ'চ্ছি আমরা—অর্থাৎ সব দেশের শিক্ষিত লোকেরা। এত বড়ো একটা অধিকার—একে কি ছেড়ে দিয়ে, কারো উপর রাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে' নিজের কোণে ব'সে থাক্‌বো? এর দ্বারা আমার তো নৈতিক বা মানসিক অবনতি আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না—জগতের আর সকলের কাছে আমি হীন আমি দরিদ্র আমি ভিখিরি, এই ভাবে চিন্তা ক'রে পরের ঐশ্বর্য্যে অভিভূত হ'চ্ছি না; কারণ আমার যা আছে তা আমি জানি। আমি বাঙালী হিন্দু; মিসরের গ্রীসের চীনের আধুনিক ইউরোপের সাহিত্য কলা চিন্তা আধ্যাত্মিকতা, সব-ই আমার যুগের কল্যাণে আমার মানবত্বের দাবীতে আমি পেতে পার্‌ছি। এ-সব ছেড়ে দিয়ে কোনও অজ্ঞাত বৈদিক যুগে আমি ফিরে যেতে চাই না—পরবর্তী কালের সঙ্গে তুলনায় যে-যুগ সত্যি-সত্যিই অর্ধবর্বর, কিন্তু উপনিষদের আলো-কে কল্পনার রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে তার উপর ফেলে আমরা তাকে লোকোত্তর মহত্ত্বে শোভায় শ্রীতে মণ্ডিত ক'রে নিয়েছি। আর Back to the Vedas কথার চরম বিচার ধ'র্‌লে, একেবারে আদিকালের মানুষ হ'য়ে পাথরের অস্ত্র হাতে ক'রে পশু-হননের চেষ্টায় জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে' বেড়াতে কেউ রাজী হবে না। আরও নাই-আঁকুড়ে' হ'লে পরে, আরও এগিয়ে' গিয়ে বানরের অবস্থায় বা protoplasm অবস্থায় পঁউছে যেতে পার্‌লেই বোধ হয় অনেকে ভালো মনে ক'র্‌বেন—কিন্তু সেই অজ্ঞাতের মোহান্ধকারে আমি ফিরে যেতে চাই না। আনাতোল ফ্রাঁসের কথায়—J'ai passé l'âge heureux où on admire les choses qu'on ne comprend pas. J'aime la lumière: অর্থাৎ 'যে সদানন্দ বয়সে লোকে যে জিনিস বোঝে না সেই জিনিসের আদর করে, সে বয়স আমি পেরিয়েছি। আমি আলো ভালোবাসি।' পার্থিব সভ্যতার নানা সুবিধার, নানা দৈহিক আরামের কথা ধ'র্‌ছি না; সে-জিনিসটা খুব একটা বড়ো জিনিস নয়; কিন্তু সভ্য মানুষের, আধুনিক মানুষের স্বাধীন মন আমি পেয়েছি আমাদের এই যুগধর্মের ফলে। আর ভারতীয় ব'লে, ভারতের প্রাচীন চিন্তার আব-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছি ব'লে, আমার পক্ষে সেই মন লাভ করা অতি সহজেই ঘ'টেছে; সে সহজলভ্যতার সৌভাগ্য থেকে বহু সভ্য দেশ এখনও বঞ্চিত আছে। এই যে মনোজগতের স্বাধীনতার কথা ব'ল্‌ছি, একমাত্র এই স্বাধীনতাই বাহ্য পরাধীনতার যত কিছু আঘাতকে কোমল হাত বুলিয়ে' আরাম ক'রে দেবার চেষ্টা করে। এই মানসিক স্বতন্ত্রতা আছে ব'লেই সভ্য

মানুষ পরতন্ত্র থাক্‌লেও স্বাধীন মানুষ হিসাবে প্রাণধারণ ক'র্‌তে সমর্থ হয়,—অন্যথায় কেবলমাত্র দাস হ'য়ে পশুবৎ হ'য়ে যেত।

বাইরের পরাধীনতা যতই কেন নিষ্ঠুর যতই কেন কঠোর হোক্ না, মন যদি স্বাধীন থাকে তা হ'লে সে পরাধীনতা কিছুতেই স্থায়ী হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। সব-চেয়ে সর্বনাশকর হবে মনের স্বাধীনতার হানি। এই স্বাধীনতা-নাশের চেয়ে বাহ্য পরাধীনতা সহস্র গুণে শ্রেয়। আমি চিন্তা-শক্তিকে পরিচালনা কর্‌বার যোগ্যতা লাভ ক'রে, কী হ'চ্ছে তা জেনে কাজ ক'র্‌তে চাই; আমি জান্‌তে চাই, আমি বুঝ্‌তে চাই। যদিও সেই জানার পর, প্রতীকার ক'র্‌তে পারার শক্তি না থাকার দরুন, মনে আমি দারুণ অশান্তি বা অস্বস্তি মাত্র লাভ করি—কারণ জেনে শক্তির অভাবে প্রতীকার ক'র্‌তে না পারার মতো কষ্টকর, তার মতো বুক-ভাঙা আর কিছু নেই—কিন্তু তবুও আমি জান্‌বো; আমি pathetic, placid contentment-এ থাক্‌তে চাই না। হয়-তো কখনও উপলব্ধি বা অনুভূতির বন্যা এসে আমাকে ভাসিয়ে' নিয়ে যেতে পারে; হ'তে পারে, জানার নির্মল আনন্দে মস্ত্‌ হ'য়ে ব'সে থাকার চেয়ে, বা তার যে divine discontent তা'তে ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়ানোর চেয়ে, অনুভূতি বা উপলব্ধির রসের সাগরে ডুবে যাওয়াটাই মানুষের মন বা আত্মার পক্ষে চরম লাভ, তার পক্ষে পরমার্থ, পুরুষার্থ। কিন্তু যতক্ষণ আমার ঈশ্বর-দত্ত বা প্রকৃতি-থেকে-লব্ধ বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ তাকে মেরে আমি আত্মঘাতী হ'তে চাই না।

অস্থর্য্যা নাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাহঽত্মহনো জনাঃ॥

'অন্ধ তমোদ্বারা আবৃত অসুরদের উপযোগী অসূর্য্য নামে যে-সকল জগৎ, আত্মঘাতী হয় যে-সব মানুষ তারা পরলোকে গিয়ে সেই-সকল জগতে পঁউছয়।'

আমরা চাই, অন্ধকারের বাইরে গিয়ে আমরা যেন জ্যোতি দেখ্‌তে পাই; আমাদের প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', এবং More Light; আমাদের প্রার্থনায় আছে 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ', তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করুন; 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু', তিনি আমাদের শুভ বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন; বাইরের জগতের সৌন্দর্য্য আর মোহ যেন আমাদের অভিভূত ক'রে সার সত্যের সন্ধানের পথে বাধা না দেয়—

'হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্ পূষন্ন্‌ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

'সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত ; হে পূষাদেবতা, সত্যধর্ম দর্শনের জন্ত তুমি তা সরিয়ে' দাও।'

আমাদের প্রার্থনা, যেন 'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ,' হে দেবগণ, যা ভদ্র তা আমরা কান দিয়ে যেন শুনি ; 'ভদ্রং পশ্যেম অক্ষিভির্ যজত্রাঃ', হে পুজিত দেবগণ, যা ভদ্র তা আমরা চোখ দিয়ে যেন দেখি।

নানা দিক দিয়ে নানা প্রতিকুল অবস্থায় প'ড়ে আমাদের ভারতীয় মানবের মনের স্বাধীনতাটুকু লোপ পেতে ব'সেছে, বহু স্থলে লোপ পেয়েছে,—লোপ পেয়েছে ব'ল্‌বো না—মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছে, কারণ ভারতের সভ্যতার মূলে যে মন্ত্র আছে, সে-মন্ত্রটি অমর ; সে মন্ত্র হ'চ্ছে মানুষের মানসিক আর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মন্ত্র। ভারতের জীবনের বাইরের আবর্জনার মধ্যে, বাইরের রঙচঙ জগ্‌জগা, বাইরের প্রতিমার নশ্বর অলংকারের মধ্যে সেই মন্ত্র হ'চ্ছে অক্ষয় মণি। যতদিন উপনিষদ্ আর গীতার মধ্যে, বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে, সন্তবাণীর মধ্যে আর অন্যান্য ভারতীয় আচার্য্যদের বাণীর মঞ্জুষার মধ্যে সেই অক্ষয় নীতি বিদ্যমান থাক্‌বে, আর যতদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অনুশীলনের আর জীবনে প্রতিফলিত করণের স্বল্পমাত্রও চেষ্টা আমাদের মধ্যে থাক্‌বে, ততদিন আমরা সকল দারিদ্র্যের সকল দৈন্যের সকল অভাবের মধ্যে একেবারে নিঃস্ব হবো না—আর বাহ্য পরাধীনতার রাহু আমাদের সভ্যতাকে একেবারে পূর্ণগ্রাস্ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ভারতের নিজস্ব প্রাচীন কৃতির বিশেষত্ব কোথায়, সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে, আর তা থাক্‌বেও। কেউ কেউ ভারতের ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের বর্ণাশ্রম ভেদেই ভারতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে মনে ক'রে সেইটিকেই রক্ষা কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর। কেউ বা ভারতের সমাজবিশেষের সাধন বা সাধনের অঙ্গকে পরম পদার্থ ব'লে মনে করেন, যেন ভারতের সভ্যতার বা সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা সেখানেই। আজকালকার মতো প্রাচীন যুগে এ বিষয়ে চিন্তা কর্‌বার আবশ্যকতা ছিল না, কারণ ভারতের বাইরের জগতের প্রতিকুল শক্তির সঙ্গে ভারতের সমাজের সংঘর্ষ হ'লেও, ভারতের ভাবরাজ্যের উপর বাইরে থেকে আজকালকার মতন এতো বড়ো সংঘাত কখনও ঘটে-নি—আজকাল যেমন ক'রে খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান ইউরোপ আর আমেরিকা, আর আরব-মনের সৃষ্টি ইস্‌লাম, আর ওদিকে কিছু পরিমাণে চীন-জাপান, ভারতের মানসিক প্রগতির আর তার প্রাচীন

সভ্যতানুমোদিত জীবনযাত্রার উপরে এসে প'ড়েছে, আর আমাদের বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে। এই-সব নানা দিক্ থেকে আমাদের উপর সংঘাত এসে পঁউছানোতে, মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা কিসে ভারতের ভারতীয়ত্ব, আর সেই ভারতীয়ত্ব রক্ষা করা আমাদের পক্ষে তথা বিশ্ব-মানবের পক্ষে কল্যাণকর হবে কি না, সে বিষয়ে চিন্তা কর্'তে আর ভারতবাসীকে আশ্বস্ত কর্বার জন্য অভিমত দিতে বাধ্য হ'য়েছেন। ভারতের জীবনে যা সত্য যা শিব আর সুন্দর, তা এঁরা আংশিক-ভাবে বা পূর্ণ-ভাবে আমাদের চোখের সাম্নে ধর্বার প্রয়াস ক'রেছেন। ব্যক্তিগত পারিপার্শ্বিক, শিক্ষা আর রুচি অনুসারে এঁদের মতের ইতরবিশেষ হ'লেও, একটি বিষয়ে এঁরা সকলে একমত ; সকলেই সত্যকে শ্রেয় ব'লে মনে নিয়েছেন, আর বিশেষ পরীক্ষা ক'রে নিয়ে তবে সত্যকে স্বীকার ক'র্তে উপদেশ দিয়েছেন। সত্য নির্ণয় বড়োই কঠিন ব্যাপার ; সত্য তো কখনও পূর্ণরূপে মানুষকে ধরা দেয় না। মানুষের বুদ্ধির সাহায্যে সত্যনির্ণয় ক'র্তে হ'লে কিন্তু যুক্তিতর্কের অনুমোদিত পথ ধ'রে চলা চাই। এই পথে চ'ল্তে-চ'ল্তে, আমাদের অপ্রিয় কিছুতে যদি আমাদের নিয়ে যায়, তা-হ'লে দুঃখিত বা বিচলিত হ'লে চ'ল্বে না। যাতে আমাদের বিচলিত না ক'র্তে পারে, তদনুরূপ সত্যদিদৃক্ষুর উপযোগী দৃঢ়চিত্ততা আমাদের থাকা উচিত। এইরূপ দৃঢ়চিত্ততা, সত্যদ্রষ্টার অটল নির্ভীকতা প্রাচীন ভারতে ছিল। আধুনিক ইউরোপেও বহু ক্ষুদ্রস্বার্থ-প্রণোদিত মিথ্যার মধ্যে এই অটল সত্যানুসন্ধিৎসা যথার্থ জিজ্ঞাসুদের মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে নির্ভীকভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে' আছে। এই জিনিসটি নোতুন ক'রে ইউরোপ আমাদের দান ক'রেছে ; রেলগাড়ি, বিজ্ঞান, কলকারখানার চেয়ে এই দান-ই শ্রেষ্ঠ দান। হ'তে পারে, দু-পাঁচজন ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বা লেখক আধুনিক ভারতবর্ষকে পরাধীন, হীন, ভেদ-দ্বেষে পরিপূর্ণ দেখে, তার প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ ক'রে, প্রাচীন ভারতেরও প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখিয়েছে, প্রাচীন ভারতের লাঘব কোনও জায়গায় ক'র্তে পেলে হর্ষের আতিশয্য দেখিয়েছে, সেদিকে আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছে। কিন্তু যে কৌতূহল যে অনুসন্ধিৎসা আমাদের কাছে বুদ্ধকে অশোককে গুপ্তরাজগণকে তাঁদের যথার্থ স্বরূপে এনে দিয়েছে, আমাদের গৌরবময় অতীতকে বিস্মৃতির অতল থেকে আবার উদ্ধার ক'রেছে, Serindia বা মধ্য-এশিয়া, Indo-china ইন্দোচীন, Insul-india বা ভারত দ্বীপপুঞ্জে যে এক বিরাট্ 'বহির্ভারত' ছিল, তাতে আমাদের

পিতৃপুরুষ তত্তৎদেশের অর্ধসভ্য বা অসভ্য অধিবাসীদের সাহচর্য্যে যে বিরাট্ সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিলেন তার খবর আমাদের এনে দিচ্ছে, আমাদের পুরাতন সুহৃৎ সতীর্থ বৌদ্ধ চীনের মনোরাজ্যের সঙ্গে আমাদের পুনঃপরিচয় করিয়ে' দিয়েছে,—এক কথায়, 'আত্মানং বিদ্ধি', নিজেকে জানো, এই অনুজ্ঞা পালনের জন্য আমাদের পূর্ণ সহায়তা ক'রেছে, ক'রছে,—সে জিনিস নিতান্ত তুচ্ছ নয়, সে বিদ্যা আর সে বিদ্যালব্ধ ফলকে 'ওদের' ব'লে উপেক্ষা ক'রলে আমাদেরই হানি—মানসিক, ঐহিক, উভয়বিধ হানি।

রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা আমাদের সত্যদ্রষ্টার উচিত নিরপেক্ষভাব নিতে বলেছেন। এঁরা বিশ্বকে ভয় করেন-নি, বিশ্বকে বর্জন করেন-নি ; জ্ঞাতি, ব'লে, বন্ধু ব'লে সাদরে মনোরাজ্যে বরণ ক'রে নিয়েছেন। ভারত যেখানে বিশ্বের বা বাইরের ভয়ে পালিয়ে' বেড়াচ্ছে না, কিন্তু নিজের গৌরবে দশের মধ্যে এক হ'য়ে বিরাজ ক'রছে, আমাদের দেশের সেইরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের এই শান্তিনিকেতন আর তার এই নবীন মূর্তি বিশ্বভারতী হ'চ্ছে অন্যতম। এখানে ভারত তার নিজ কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকতে চাইছে, নিজের স্বরূপকে ভুলতে চাইছে না ; কেবলমাত্র বাহ্য-অনুষ্ঠান-গত স্বরূপকে নয়, তার অন্তরতম মানসিক আর আত্মিক স্বরূপকে ; মনের স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্ফূর্তি দিয়ে, সত্যের সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে শিব আর সুন্দরকেও বরণ ক'রে নিয়ে, জ্ঞান আর সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার থেকে রত্নরাজী আহরণ ক'রে এনে, তার দ্বারা দেশের চিত্ত আর প্রাণের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করবার চেষ্টা ক'রে।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমাদের যাদের যোগস্থাপনের সুযোগ হ'য়েছে, তাঁদের পক্ষে এই আদর্শের মূল্য বোঝা কঠিন হবে না। এখন আমাদের সকলের যত্ন করা উচিত, যাতে আমরা শান্তিনিকেতনের বা বিশ্বভারতীর যোগ্য কর্মী হ'তে পারি। আমাদের দায়িত্ব খুব-ই গুরুভার। বিশেষ এই ঘোরতর দুর্দিনে, যখন আমাদের এই যে শ্রেষ্ঠ রিক্থ—স্বাধীনচিত্ততা—তার উপর নানা দিক দিয়ে আক্রমণ আর আঘাত প্রত্যক্ষে আর পরোক্ষে এসে প'ড়ছে। বাহ্য স্বাধীনতার চেয়েও প্রার্থিত, এমন কি আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই যে মানসিক স্বাধীনতা, এর আলো-কে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে জ্বালিয়ে' রাখতে হবে—অধ্যয়ন, আলাপ, আর চিন্তার দ্বারা। কিন্তু সমষ্টিগত-ভাবে আমাদের বড়ো কাজ আছে। যারা আমাদেরই মতন এক-ই পিতৃপুরুষ থেকে জাত, আমাদেরই মতন ভারতের প্রাচীন ধনের অধিকারী, তাদেরও মনে তাদের

সেই ভারতীয়ত্বকে জাগিয়ে' রাখ্‌তে হবে। ভারতের বাইরে যে-সমস্ত গুরু, যে-সমস্ত ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষ জ'ন্মেছেন, মৈত্রী করুণা জীবে-দয়ার বাণী যাঁরা নিজ জীবনের দ্বারা প্রচার ক'রেছেন, যেমন জরথুশ্‌ত্র বা লাওৎ-সি, সোক্রাতেস্‌ বা যীশু, মানী বা সন্ত ফ্রান্সিস্‌, মন্‌সুর অল্‌-হল্লাজ বা বহাউল্লাহ্‌,—তাঁরা আমাদের নমস্য, তাঁদের আমরা আমাদের নিজেদেরই ব'লে মনে করি। যদি কেউ তাঁদের কাউকে শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র ধর্মগুরু ব'লে মেনে নেন, তাতে তাঁর ভারতীয়ত্বের সঙ্গে বিরোধের কোনও কারণ নেই। কিন্তু এ রকমও হ'তে পারে যে, কেউ-বা হয়-তো অন্ধ-বিশ্বাস-প্রণোদিত হ'য়ে, ভারতের সভ্যতার মধ্যে নিহিত ভাবসমূহের, বিশেষত তার মৈত্রীভাবের আর তার পরমত-সহিষ্ণুতার মূল্য বুঝ্‌তে না পেরে বা স্বেচ্ছায় বুঝ্‌বার সুবিধা ত্যাগ ক'রে, তার বাইরের নানা জঞ্জালকে দেখেই সেইটেকেই তার প্রাণের স্বরূপ ব'লে মনে ক'রে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; আমরা যাকে সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে, প্রাণের চেয়ে প্রিয় ব'লে যে জিনিসকে মনে করি, তার নাশের চেষ্টায় তার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ ক'র্‌তে পারে। কেউ যদি এইরূপে আমাদের এই Indianism, এই 'তহন্‌নুদ্‌', এই আমাদের 'ভারত-ধর্ম' বা 'ভারত-পন্থ', এর হানি ক'র্‌তে উদ্যত হয়, অশান্তি দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ প্রচার ক'রে চড়াও হ'য়ে আসে, তা-হ'লে সেখানে আমাদের চুপ ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না,—আমাদের সেখানে সমস্ত শক্তি নিয়ে বাধা দিতে দাঁড়াতে হবে। কারণ এই Indianism, এই আমাদের ভারত-ধর্ম, আমাদের কাছে বাইরের স্বাধীনতার চেয়ে, প্রাণের চেয়েও বড়ো জিনিস। মনে আমরা নিজের সম্বন্ধে স্বাধীন, আর পরের সম্বন্ধে উদার থাকতে চাই; এটা থাক্‌লেই আমরা সভ্য, না থাক্‌লেই বর্বর। বাইরের প্রতিকূল শক্তি সেখানেই জোর পায়, যেখানে আমরা দুর্বল: others are strong only in our weakness। আমাদের দৌর্বল্য হ'চ্ছে অজ্ঞান আর অজ্ঞান-প্রসূত ভেদ-বুদ্ধি-জনিত। ভিতর থেকে আমাদের এই দৌর্বল্যের বিপক্ষে ল'ড়্‌তে হবে, তা-হ'লেই বাইরের আক্রমণকে রোধ করা যাবে। ভারত-পন্থকে বাঁচিয়ে' রাখ্‌তে হ'লে, যারা এইরূপ মনোভাবের প্রতি সহজেই আস্থাশীল তাদের দৈহিক স্বাস্থ্যে আর স্ফূর্তিতে আর মনের আনন্দে বাঁচিয়ে' রাখ্‌তে হবে। যারা ভারতের সভ্যতার উত্তরাধিকারী হ'য়েও হেলায় তাকে বর্জন ক'র্‌ছে, ভারতের উদার মনোভাবের আর অনুসন্ধিৎসার পরিবর্তে অসহিষ্ণুতা, আর আত্মঘাতী তামসিক অন্ধ বিশ্বাস এনে দেশে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ক'র্‌ছে, বাইরের কোনও এক অর্বাচীন জাতিকে গুরু ব'লে মেনে নিয়ে, তাদের অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণগুলিকে

ধ'র্তে না পেরে কেবলমাত্র বাহ্য বিষয়ে আচারে অনুষ্ঠানে তাদের অন্ধ অনুকরণের বৃথা চেষ্টা ক'র্ছে, নানা প্রকারে পিতৃপুরুষের অপমান ক'র্ছে, আর দেশের প্রতিষ্ঠার পক্ষে অন্তরায় হ'চ্ছে,—আমাদের সমগ্র শিক্ষা সাধনা আর বোধনী আর রোধনী শক্তি দিয়ে তাদের এই পরমতাসহিষ্ণুতা আর বিদ্বেষ-ভাব, অন্ধ অনুাচকীর্ষ আর নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞতা, এই-সবের বিরুদ্ধে ল'ড়্তে হবে। ভারতীয় মনোভাবকে বাঁচিয়ে' রাখ্‌বার জন্য এই অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ একটা বড়ো আবশ্যক কার্য্য। পিতৃপিতামহদের কৃতির মূল্য বোঝেন আর তার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চান, এমন প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ের এদিকে কর্তব্য আছে। এটি রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এটি হ'চ্ছে সামাজিক সংগঠন, আর সমস্ত জা'তের মানসিক শিক্ষা। রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্য চ'ল্‌বে, তাকে বাদ দিলে হবে না, কারণ সেটি হ'চ্ছে বাইরের মুক্তির জন্য; কিন্তু সামাজিক মুক্তি, মনের স্বাধীনতা যাতে হয়,—যাতে অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত ছুঁৎ-মার্গী পুরোহিত আর ছুঁৎ-মার্গী মোল্লার আর পাদরির দলের অনুচিত প্রভাবের ফলে, আর প্রকৃত শিক্ষার অভাবে, আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে ঐহিক আর পারত্রিক নানা প্রকার ভীতি চিরকাল ধ'রে রাজত্ব ক'র্তে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া বিশেষ দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। এ জিনিসটিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে নীচু স্থান দিলে আমাদের জা'তের বাঁচ্‌বার বা অগ্রসর হবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

আমাদের শান্তিনিকেতনের বড়ো আদর্শ হ'চ্ছে Culture and Service, উৎকর্ষ-সাধন আর সেবা। এই Culture কেবল একটিমাত্র বিশেষ জা'তের বা সমাজের মনোভাবের অবলম্বনে নয়; নিজেদের ভারতীয় Culture-কে তো আগে রাখ্‌তে হবে, সে বিষয়ে কোনও কথা নেই; কিন্তু একে রাখ্‌তে হবে এর প্রসার ক'রে, এর সমৃদ্ধি এনে, সব জায়গা থেকে Sweetness and Light মাধুর্য্য আর জ্ঞানালোক আহরণ ক'রে এনে; আর Service হ'চ্ছে এই Culture-কে বিতরণ ক'রে,—নিজের জাতীয় Culture-কে জা'তের মধ্যে সুদৃঢ় করার সঙ্গে-সঙ্গে।

কিন্তু Culture বিতরণ ক'র্‌বো কোথায়? যাদের কাছে এই Culture-এর আদর, যারা শ্রদ্ধা ক'রে একে মেনে নেবে, যারা আমাদের-ই, তারা বেঁচে ব'র্তে থাক্‌লে তবে তো? তারা একে গ্রহণ কর্‌বার উপযুক্ত মানসিক অবস্থায় থাক্‌লে তবে তো? নইলে আমাদের দ্বারা সৃষ্ট বা

পুনরুজ্জীবিত অভিনব ভারতীয় Culture-এর সৌধ কেবল চোরাবালির উপর গড়া হবে মাত্র—তার কোনও সার্থকতা থাক্‌বে না, দুর্দিনে তা আকাশ-কুসুমের মতো বিলীন হ'য়ে যাবে। গ্রামকে অবলম্বন ক'রে ভারতীয় সভ্যতার অনেক কিছু শ্রেষ্ঠ অঙ্গের বিকাশ হ'য়েছে। গ্রামের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টান ক'মে আস্‌ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রপদ-বাচ্য ব্যক্তি আমরা, আমরা ভারতীয় Culture-এর উন্নতি সাধন ক'র্‌ছি বটে, কিন্তু আমরা নিজেরা শহুরে' হ'য়ে প'ড়েছি। ছবিতে গল্পে কবিতায় গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করি বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার ভয়ে আর বিজলীর বাতি নেই ব'লে গ্রামে যেতে ভয় পাই—গ্রামের বাস্তু ভিটা ত্যাগ ক'রেছি, গ্রামের জনকে বর্জন ক'রেছি। প্রত্যেক মানুষের প্রশস্ততম কার্য্যক্ষেত্র সাধারণত হ'চ্ছে, যতদূর সম্ভব, নিজের সমাজের মধ্যে। Charity begins at home। প্রতিভাশালী ব্যক্তির কথা অবশ্য আলাদা, তাঁরা কেবল জানপদ বা পৌর মাত্র নন, তাঁদের ক্ষেত্র আরও বিরাট্‌, সমস্ত দেশ বা কখনও-কখনও সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ে হ'য়ে পড়ে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিজের দেশের আর নিজের-নিজের সমাজের কথা ভুলে গেলে চ'ল্‌বে না।

শান্তিনিকেতনের Culture বা উৎকর্ষ যাতে দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তা যেন শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক ছাত্রের চিন্তার বিষয় হয়। দেশ আমাদের দারিদ্র্যের নিপীড়নে ছারে-খারে যাচ্ছে। তার উপর নানাপ্রকার সামাজিক আবর্জনা আর বিভীষিকা আছে। তার জঙ্গুলে' আওতায়, তার যত আগাছার জটের মধ্যে প'ড়ে আমাদের দেশে সমস্ত প্রাণ শুখিয়ে' যাচ্ছে, ম'রে যাচ্ছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, উপনিষদের শিক্ষা যেন আমাদের শান্তিনিকেতনের মধ্যে দিয়ে এই শুষ্ক ক্লিষ্ট মৃতকল্প দেশে অমৃতের প্রভাব আন্‌তে সাহায্য করে। যেন তার আলোর সাম্‌নে, তার তীক্ষ্ণ দর্শন আর উৎসাহশীল প্রয়াসের সাম্‌নে সমস্ত অন্ধকার সমস্ত আবর্জনা দূরীভূত হ'য়ে যায়; এখানকার কলাভবনের ছাত্রদের দ্বারা দেশের জনসাধারণের মাঝে আগেকার কালের মতো সহজ সৌন্দর্য্য-বোধ আবার ফিরে আসে। আমাদের এখানে যে পটুয়ারা তাঁদের গুরুকে আশ্রয় ক'রে শিক্ষালাভ ক'র্‌ছেন, তাঁদের মধ্যে দু-চার জনে বড়ো চিত্রকর হ'য়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল ক'র্‌বেন, এ আশা আমরা সহজেই ক'র্‌তে পারি। কিন্তু দেশের লোকের মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধ ফিরিয়ে' আন্‌বার জন্য বিশ্বভারতীর ছাত্রদের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই—যে সৌন্দর্য্য-বোধকে আমাদের দেশে এখনও

সুদূর পল্লীগ্রামে সুন্দর-সুন্দর তৈজসে নানাপ্রকার মনোহর গৃহশিল্পে ফুটে উঠ্‌তে দেখা যায়। এ বিষয়ে যাঁর দ্বারা সেখানে যেটুকু সম্ভব হবে সেটুকু ক'র্‌তে পার্‌লে, ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেকটা কাজ ক'র্‌তে, দেশবাসীর সেবা ক'র্‌তে পারা যাবে। সেইরূপ ইতিহাস দর্শন সাহিত্যের ছাত্র, সংগ্রহ-রক্ষণ আর শিক্ষার ব্রত দিয়ে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে কাজ ক'র্‌তে পার্‌বেন। গ্রাম-সংগঠন বিষয়ে আমাদের শ্রীনিকেতন থেকে কিছু পরিমাণে কাজ আরম্ভ হ'য়েছে, সেটা দেশের উপচিকীর্ষু, শান্তিনিকেতনের চিন্তাশীল ছাত্রের প্রণিধানের বিষয়। সমস্ত জা'তকে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। নইলে আমাদের Culture নিয়ে আমরা ভারতবর্ষের জনকতক ভদ্রশ্রেণীর লোক নিজের দেশেই পুরো পরবাসী হ'য়ে প'ড়্‌বো, আমাদের ভারত, ভারতীয় Culture হিসেবে, অতীতের বস্তু হ'য়ে প'ড়্‌বে,—অন্তরের শক্তির অভাবে আর ক্ষয়ে আর বাহ্য আক্রমণে। এই ক্ষয় রহিত করা-ই হ'চ্ছে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়—আমাদের Culture অবলম্বন ক'রে যাতে আমাদের জা'ত বেঁচে থাকতে পারে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া চাই। যে শিক্ষা তাঁরা এখানে পাচ্ছেন বা পেয়েছেন, কর্মজীবনে যেন তার পূর্ণতা হয়, যেন তার প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রাচীন ভাগবতধর্মের এই তিনটি জিনিস দু' হাজার বছর আগে এক অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত গ্রীকের মনকে আকৃষ্ট ক'রেছিল ; গ্রীক হেলিওদোর, বৈষ্ণব ভাগবতধর্ম গ্রহণ ক'রে তাঁর উৎকীর্ণ বিদিশা-অনুশাসনে লিখে' গিয়েছেন—

'ত্রিণি অমুত প'দানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগং—দম, চাগ, অপ্রমাদ।

'তিনটি অমৃতপদ ভালো ক'রে পালন ক'র্‌লে স্বর্গে নিয়ে যায়—দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ ; অর্থাৎ আত্মদমন, নিস্পৃহতা, আর শুভ বুদ্ধিকে পরিহার না করা।' এই তিনটি অমৃতপদ প্রত্যেক মানুষের আত্মিক উন্নতির সহায়ক। এর পালনের দ্বারা যোগ্যতা অর্জন ক'র্‌তে হবে—সমাজের সেবার জন্য, নিজের শ্রেয়স্ লাভের জন্য।

তারপর আমাদের কাজ ক'র্‌তে হবে 'প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'—শ্রদ্ধার সঙ্গে আচার্য্যদের শিক্ষাকে শ্রবণ ক'রে ; সত্যানুসন্ধিৎসা-প্রণোদিত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রে ; আর মৈত্রীপরবশ হ'য়ে সেবা ক'রে—যেখানে যে অসহায় দুর্বল আতুর আত্মবিশ্বাসহীন, তার সেবা ক'রে, তার সহায় হ'য়ে, তাকে বল দিয়ে,

তাকে জ্ঞান দিয়ে, তার মনে আত্মবিশ্বাস এনে। এইভাবে কাজ ক'র্‌লেই আমরা ব্যক্তিগত পরমার্থ লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো, আর আমাদের পিতৃপুরুষ, আমাদের জ্ঞাতি-বন্ধু-ভ্রাতা, তথা বিশ্ব-মানবের প্রতি এইরূপেই আমাদের কর্তব্য ক'র্‌তে পার্‌বো, যথাশক্তি সমাজের সম্বন্ধে আমরা কিছুটা আনৃণ্য লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো॥

শান্তিনিকেতন
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৩১

বৃহত্তর বঙ্গ

"বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটি আজকাল আমরা খুব-ই ব্যবহার করিতেছি। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের "প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্য সম্মেলন"-এর যে সকল অধিবেশন হইতেছে, সেগুলিতে "সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান" শাখা ভিন্ন, উপরন্তু একটি "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখাও স্থান পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন, পত্র-পত্রিকাতেও "বৃহত্তর বঙ্গ"কে হালের বাঙ্গালীর অন্যতম গৌরব বলিয়া আমরা নানা জল্পনা-কল্পনা, উচ্ছ্বাস-আলোচনা করিতেছি।

কথাটা কিন্তু বেশী দিনের নহে। আমার মনে হয়, ১৯২৬ সালে ভারতের বাহিরের দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচারের ইতিহাস আলোচনার উদ্দেশ্যে যখন কলিকাতায় "বৃহত্তর ভারত পরিষৎ" স্থাপিত হয়, তাহার পরে "বৃহত্তর ভারত"—এই সংযুক্ত পদটির দেখাদেখি "বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটিও ব্যবহৃত হইতে থাকে। আগে আমরা "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" জানিতাম, "প্রবাসী বাঙ্গালী" জানিতাম। ১৯০০ সালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে "বৃহত্তর বঙ্গ" শব্দদ্বয় ও তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাব দুর্বোধ্য হইত ; ১৮৫০ সালের বাঙ্গালীর পক্ষে কথাটি ও তাহার অর্থ উভয়-ই অবোধ্য লাগিত। অথচ এই কয়েক বৎসরে এই কথাটি হালের বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গৌরববোধ, আত্মপ্রসাদ ও শক্তিসংগ্রহের (এবং সঙ্গে-সঙ্গে আত্মবঞ্চনার) একটা মস্ত বড়ো সহায়ক হইয়া পড়িতেছে।

জিনিসটা আমাদের তলাইয়া বুঝা দরকার।

"বৃহত্তর বঙ্গ"—এই কথাটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ এই—ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে, অর্থাৎ অ-বাঙ্গালী যাহারা বাঙ্গালা ভাষা বলে না, এমন লোকদের মধ্যে, ব্যক্তি-গত বা সমাজ-গত ভাবে আজীবিকা-সংগ্রহের চেষ্টায় বা অন্য উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীরা গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বসবাস-কালে যে সকল কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব-বর্ধন করিয়াছে, মুখ্যতঃ সেই কৃতিত্বের বিচার, এবং সেই কৃতিত্ব-জনিত আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক শক্তির আবাহন। সঙ্গে-সঙ্গে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীদের সুখ-দুঃখের, আশা-আশঙ্কার ও বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতির আলোচনা, ও যথাযথ ইহাদের বিবর্ধন বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া, প্রবাসী বাঙ্গালীদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষা করা, তথা আধুনিক ভারতের জাতিবৃন্দের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্থানকে গৌরবের ও সম্মানের স্থান করিয়া রাখা।

সন ১৩০৮ সালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন প্রয়াগ হইতে "প্রবাসী" পত্রিকা বাহির করেন, তখন হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী বা বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত জনগণ একটু বেশী করিয়া সচেতন হইতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে "প্রবাসী" পত্রিকার মারফৎ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" শীর্ষক জীবন-চরিতাত্মক প্রবন্ধাবলীতে, যে-সব কৃতী বঙ্গ-সন্তান বিগত দুই পুরুষ ধরিয়া (এবং ক্বচিৎ তাহার পূর্বেও) বাঙ্গালার বাহিরে পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে গিয়া স্বীয় বিদ্যা- ও চরিত্র-গুণে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হন, ধারাবাহিক-ভাবে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের নিকটে তাঁহাদের সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সুপরিচিত "বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকের দুইটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে—এই বইয়ের দ্বারা বৃহত্তর বঙ্গের বোধ বাঙ্গালী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা খুব-ই বাড়িয়া যাওয়ায়, পশ্চিমের ও দক্ষিণের দূরতম প্রদেশ মাত্র দুই-এক রাত্রির, ক্বচিৎ তিন-চারি রাত্রির রেল-ভ্রমণের পথে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে প্রবাসী বাঙ্গালী আর সত্য-সত্য প্রবাসী থাকিতেছেন না, দেশের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতর যোগ রাখা সম্ভবপর হইতেছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা—প্রাচীন ভারতের বণিক্, নাবিক, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, শিল্পী ও সাধারণ ব্যক্তি—ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া, ধর্ম ও সভ্যতায় সেই-সব দেশে এক অভিনব বৃহত্তর ভারতের পত্তন করিয়াছিলেন। "বৃহত্তর ভারত", ভারতের এক গৌরবময় অবদান। ইহার-ই অনুকরণে "বৃহত্তর-বঙ্গ", এই ভাবময় সমস্ত-পদের সৃষ্টি। "বৃহত্তর ভারত"—মুসলমান-পূর্ব ভারতের কৃতিত্বের পরিচায়ক; ব্যাপক-ভাবে, আধুনিক ভারতের প্রসারের কথাও ইহার মধ্যে নিহিত। "বৃহত্তর বঙ্গ"—মুখ্যতঃ ঊনবিংশ শতকে ভারতের অন্য প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা।

এখন, এই কয় বৎসর ধরিয়া "বৃহত্তর বঙ্গ" লইয়া আমরা একটু বেশী সাত্মাভিমান হইয়া পড়িয়াছি। ইহার দুইটি কারণ আছে। এই কারণ দুইটি প্রবাসী বাঙ্গালী ও ঘরবাসী বাঙ্গালী উভয়েরই মধ্যে পরিদৃশ্যমান।

প্রথমতঃ—বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই বাঙ্গালী যেমন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর অবস্থা তেমন-ই (কোথাও কম কোথাও বা বেশী)

খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে বঙ্গের বাহিরে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীর যে সম্মান, যে প্রতিষ্ঠা ছিল, এখন তাহার কিছু-ই নাই। অনেকে ক্ষেত্রে আবার বাঙ্গালীর সম্মানপূর্ণ অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালী আর ইংরেজ সরকারের প্রিয়পাত্র নহে; ইংরেজের আশ্রয়ে উন্নতি-প্রাপ্ত বাঙ্গালীর প্রতি, বাঙ্গালার বাহিরের বহু স্থানের লোকেদের মনে যে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষ্যা ছিল, তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ফলে, রাম এবং রাবণ, উভয়েরই হাতে তাহার লাঞ্ছনা। এ ক্ষেত্রে উচ্চ পদের প্রতিষ্ঠা এবং সঙ্গে-সঙ্গে অর্থের প্রতিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত প্রবাসী বাঙ্গালীকে নৈতিক প্রতিষ্ঠায় অটল থাকিতে হইবে। কাজটি খুব-ই কঠিন। প্রবাসী বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অন্ন-সংস্থানের জন্য, অর্থোপার্জনের জন্য, বাঙ্গালার বাহিরে গিয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদের কারণ যে, যে-যে স্থানে চিরতরে সে বাসা পাতিয়াছে, সেই-সেই স্থানে শিক্ষা ও মানসিক সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য সে অনেক কিছু করিয়াছে। ইহা তাহার জাতির পক্ষে গৌরবেরই কথা। এই ইতিবৃত্তের আলোচনা ও অনুশীলন তাহাকে যথেষ্ট শক্তি দিতে পারে। এই জন্য বৃহত্তর বঙ্গের চর্চা।

দ্বিতীয়তঃ—বাঙ্গালা দেশের মধ্যে আমাদের ভিতরে একটা পরাজয় ও পরাভবের হাওয়া বহিতেছে। সকলেরই মনে এই ভাবটি অল্প-বিস্তর জাগরিত হইতেছে যে—আমাদের অবস্থা বনের হরিণের মতো—"হরিণ জগতবৈরী আপনার মাসে"। বাঙ্গালাকে সকলে মিলিয়া লুঠিতেছে, আমরা দেখিয়াও তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছি না। অন্য বিষয়েও আমরা হঠিয়া যাইতেছি। আমাদের এখন অর্থনৈতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সব রকমের আশ্রয় আবশ্যক হইয়াছে। "বৃহত্তর বঙ্গ" আমাদের একটি বড়ো আধ্যাত্মিক আশ্রয়। দৈব-দুর্বিপাকে পড়িয়া যাওয়ায়, এখন আমাদের কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। হাতী পাঁকে পড়িলে, বেঙ্গেও তাহাকে লাথি মারিয়া যায়। আমরা অতীতে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছি; যখন হইতে ভারতে ভারতীয় এবং প্রাদেশিক জাতি-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তখন হইতে বাঙ্গালী ভারতের অন্য জাতিদের পশ্চাতে কখনও থাকে নাই। "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর"—বঙ্গমাতাকে আমরা আত্মবিশ্বাসপূর্ণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে একথা বলিতে পারি। "বৃহত্তর বঙ্গ" বাঙ্গালীর অধুনাতন কৃতিত্বের একটি লক্ষণীয় নিদর্শন, ইহার চর্চায় আত্মবিশ্বাস আসিবে, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুঝিবার শক্তি আমরা পাইব,—সমগ্র বাঙ্গালী জাতি হিসাবে এই শক্তি পাইব।

বাহিরে ও ভিতরে, অন্য প্রদেশে ও বঙ্গদেশে, "বৃহত্তর বঙ্গ"-বাদ আমাদের কতটা শক্তি দিতে পারে, আমাদের বাঙ্গালী-জীবনে কি ভাবে ইহাকে সার্থক করিতে পারা যায়—তাহার আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু এই আলোচনা ঐতিহাসিক বিচার দিয়া আরম্ভ না করিলে বিশেষ কিছু ফল হইবে না।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা করিতে গেলে, তিনটি কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সে তিনটি কথা এই—

[১] বাঙ্গালা-দেশ ভারতেরই অংশ।

[২] বাঙ্গালী জাতি ভারতীয় জাতি-মণ্ডলীরই অন্তর্ভুক্ত, ভারত-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তা তাহার নাই।

[৩] বাঙ্গালার সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিরই অংশ—ভারত-বিরোধী পৃথক্ বাঙ্গালী-সংস্কৃতি নাই।

এইরূপে ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ-সূত্রে সংযুক্ত হইলেও, বাঙ্গালা-দেশের সংস্কৃতিতে দুই-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যকে আশ্রয় করিয়া, সংস্কৃতি-বিষয়ে, "বাঙ্গালা-বনাম-ভারত" এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

সংস্কৃতি-বিষয়ে এক হইলেও, অর্থনৈতিক ও অন্য বিষয়ে পার্থক্য বা বিরোধ আসিতে পারে। যেমন ইংলণ্ডের ইংরেজ ও আমেরিকায় উপনিবিষ্ট ইংরেজদের মধ্যে ঘটিয়াছিল। সেরূপ বিরোধ আসিলে, সংস্কৃতির ঐক্য কিছু-ই করিতে পারে না। তখন আত্মরক্ষা করিবার জন্য বা নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, প্রত্যেক সম্প্রদায় বা সমাজকে সচেষ্ট হইতে হয়। নিজ অস্তিত্ব বা নিজ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য বাধা প্রদান করা তখন কর্তব্য হইয়াই দাঁড়

বাঙ্গালী জাতির পূর্ব কথায়, "বৃহত্তর বঙ্গ" এই আদর্শ কত প্রাচীন? বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি অজ্ঞাত। তবে এটা ঠিক যে, মগধ হইতে আর্য্যভাষা ও উত্তর-ভারতের আর্য্যানার্য্য-মিশ্র গাঙ্গ সভ্যতা, ভারত-বিজয়ী সভ্যতা-রূপে বাঙ্গালা-দেশে আসিবার পূর্বে, এদেশে অস্ট্রিক (কোল ও মোন-খ্‌মের)-জাতীয়, মোঙ্গোল- বা ভোট-চীন-জাতীয় এবং দ্রাবিড়-জাতীয় অনার্য্য জাতি বাস করিত। মোঙ্গোল-জাতির বাস ছিল মুখ্যতঃ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে। ইহাদের নিজস্ব পৃথক্-পৃথক্ সংস্কৃতি ছিল; এবং ইহা অসম্ভব নহে যে, কোথাও-কোথাও ইহাদের মধ্যে সংস্কৃতি-গত এবং শোণিত-

গত মিশ্রণও হইয়াছিল। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির লোকেরা কিন্তু নিজ জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইতে পারে নাই। তাহা হইলে, আজ পর্য্যন্ত ইহাদের ভাষা-সংস্কৃতি জীবিত থাকিত—অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালা দেশ পূরাপূরি আর্য্যভাষী হইয়া পড়িত না। মোঙ্গোল-জাতীয় লোকেরা একটু দূরে থাকিত, ইহাদের সঙ্গেও অন্য জাতের তাদৃশ মিশ্রণ, বহুকাল ধরিয়া অন্ততঃ হয় নাই। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপজাতির লোক—ইহাদের মধ্যে কোনও সংহতি-শক্তির উদ্ভব হয় নাই; তুইটি পৃথক্ জগৎ—অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়—তুইয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় কখনও হইতে পারে নাই। ঐক্যবিধায়ক এমন কিছু বাঙ্গালা দেশে গড়িয়া উঠে নাই, যদ্দ্বারা উত্তর-ভারতের আর্য্য ভাষা ও উত্তর-ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা প্রতিহত হইতে পারিত। খ্রীঃ পূঃ ৩০০-র দিকে মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। অনুমান হয়, ২৫০ খ্রীঃ পূঃ মধ্যে কোনও সময়ে বঙ্গদেশ মৌর্য্যরাজগণের আমলে বিজিত হয়। মৌর্য্য যুগে পূর্ববঙ্গে "সংবঙ্গ" নামে সঙ্ঘ-বদ্ধ বঙ্গীয় গণ-সঙ্ঘের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সময়ে বঙ্গবাসিগণের প্রাদেশিক গৌরব বা স্বাতন্ত্র্য-বোধের কোনও পরিচয় আমরা পাই না।

মৌর্য্য যুগের পরে সুঙ্গ ও কুষাণ যুগ আসিল, গুপ্ত ও পাল যুগ আসিল। পাল যুগের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে সেন রাজাদের শাসনকাল আসিল। তার পরে ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ হইতেই বিজাতীয় ও বিধর্মী তুর্কীদের দ্বারা বঙ্গদেশ বিজিত হইল। তুর্কী-বিজয়ের বহু পূর্বেই বঙ্গদেশের অধিবাসীরা আর্য্য-ভাষী হইয়া গিয়াছে, এবং উত্তর-ভারতের সভ্যতার অংশ গ্রহণ করিয়া, আর্য্যাবর্তের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের আর্য্যীকরণ চলিতেছিল; জাতির সেই যুগান্তরের সময়ে বঙ্গবাসিগণের পক্ষে সাত্মাভিমান হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

আমাদের আজকালকার প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার মূল হইতেছে সমভাষিত্ব; খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে এই সমভাষিত্ব বঙ্গদেশে ছিল বলিয়া মনে হয় না, তখন দেশের লোকে অষ্ট্রিক-, মোঙ্গোল- ও দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর নানা ভাষা বলিত, এবং অনার্য্য ভাষা ত্যাগ করিয়া আর্য্য ভাষার বাঁধন মানিয়া লইয়া তখন এদেশের লোকেরা সবে-মাত্র একতার পথে পদার্পণ করিয়াছে। গুপ্ত এবং প্রথম পাল যুগে, বাঙ্গালার সহিত বিহার ও কাশী অঞ্চলের ভাষাগত সাম্য ছিল বলিয়া মনে হয়; তখন এক-ই প্রাকৃত বা অপভ্রংশ (খুব খুঁটিনাটি প্রাদেশিক

ভেদ হয়-তো ছিল, কিন্তু তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে) সারা পূর্ব-ভারতে আর্য্যভাষা-রূপে সর্বজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল পাল-বংশীয় রাজাদের রাজত্বের শেষ-ভাগে—খ্রীষ্টীয় দশম শতকের দিকে। তখন বঙ্গদেশেবাসীর—গৌড়-বঙ্গ জনের —"বাঙ্গালী প্রাদেশিকতা" জন্মলাভ করে নাই; বাঙ্গালারই মতো, ভারতের অন্যত্র কোথাও এরূপ ভাষাশ্রয়ী প্রাদেশিকতা তখনও উদ্ভূত হইতে পারে নাই। বাঙ্গালী তাহার ঘরোয়া ভাষাকে "প্রাকৃত" বলিত, ঘরোয়া ভাষায় সে অল্প-স্বল্প গান ছড়া প্রভৃতি লিখিত; এবং তাহা ছাড়া পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষাতেই সে বেশী লিখিত; এই ভাষা যেন ছিল সে কালের হিন্দী; এবং এতদ্ভিন্ন, উচ্চকোটির সাহিত্যরচনার জন্য নিখিল ভারতের সর্ব-প্রধান ভাষা সংস্কৃত তো ছিলই।

তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোকদের অবস্থা যেমন ছিল, তেমন-ই, একটি প্রান্ত-নিবদ্ধ, বিশেষভাবে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় গৌরব অনুভব না করিয়া, বঙ্গদেশের রাজা, পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক, কবি, শিল্পী, সকলেই এক নিখিল-ভারতীয় সভ্যতার পুষ্টিসাধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতটুকু উপায়ন ভারতমাতার চরণতলে সেদিনের গৌড়বঙ্গ-বাসী আনয়ন করিয়াছে, তাহা সে প্রাদেশিক আত্মসত্তা, অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবাসীর সত্তা বা চেতনা উপলব্ধি না করিয়াই করিয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে, গৌড়-বঙ্গ-মগধ-পতি মহারাজ ধর্মপালের আমলে, একবার বঙ্গবাসী উত্তর-ভারতের কনোজের রাজা চক্রায়ুধকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; এতদ্ভিন্ন, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারত পর্য্যন্ত, গৌড়-বঙ্গ-বাসী জয়যাত্রা করিয়াছিল। রাজনৈতিক প্রভাব ও দিগ্‌বিজয় আদি ব্যাপারে বঙ্গবাসিগণের কৃতিত্ব বিশেষ কিছু ছিল না; মাটি আঁচড়াইলেই যে দেশে ধান মিলিত, সে দেশের লোকেদের বাহিরে যাইবার আবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু সংস্কৃতির বিষয়ে প্রাচীন বঙ্গবাসীরা ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে লক্ষণীয় দান যোগাইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ যুগের ইতিহাসে বাঙ্গালার স্থান অতি উচ্চে। বৃহত্তর ভারতের পত্তনে বাঙ্গালার সহায়তাও যথেষ্ট ছিল। বিশেষ করিয়া ব্রহ্মদেশ ও সুবর্ণ-দ্বীপ বা সুমাত্রা এবং যবদ্বীপের সঙ্গে বঙ্গদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বাঙ্গালার তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বন্দর, ভারতের সভ্যতার বাহিরে প্রসারের জন্য এক প্রধান পথ ছিল। ভারতে প্রাচীন শিল্পের ইতিহাসে গৌড়-মগধ রীতির

ভাস্কর্য্য একটি প্রধান বস্তু—এই রীতির বিকাশে বাঙ্গালার বরেন্দ্র-ভূমির ধীমান্ ও বীতপাল নামক ভাস্করদ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসেও বঙ্গদেশের দান অল্প নহে। "গৌড়ী রীতি" নামক সংস্কৃত কাব্য-রচনার রীতি বাঙ্গালা দেশেই উদ্ভূত হয় বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। বাঙ্গালী কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ভারতীয় সাহিত্য-গগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ব্যাকরণ, শব্দকোষ, টীকা-টিপ্পনী গ্রন্থেও গৌড়-বঙ্গের পণ্ডিতগণ পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

মোটের উপর, বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ ভারতের সাধারণ সংস্কৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য যথোপযুক্ত ভাবে অংশ-গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই অংশ-গ্রহণ-কার্য্য যখন ঘটিয়াছিল, তখন তাহাদের বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় অর্থাৎ বাঙ্গালী বলিয়া বিশেষ গৌরব-বোধ হওয়া সম্ভবপর ছিল না—তখন বাঙ্গালা ভাষা সূতিকাগারে, এবং বাঙ্গালী জাতির বা অন্য কোনও প্রাদেশিক জাতির মধ্যে এই প্রকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনা আসে নাই। চন্দ্রগোমী, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ভট্ট ভবদেব, জয়দেব, বন্দিঘাটীয় সর্বানন্দ প্রভৃতি—ইঁহারা প্রাচীন ভারতের, ইঁহাদের লইয়া সমস্ত ভারত গৌরব করেন—বাঙ্গালী বলিয়া বিশিষ্ট বোধ বা চেতনা ইঁহাদের সময়ে কাহারও মনে ছিল না।

তুর্কী পাঠান ও মোগল যুগে বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালী তখনও পূর্ণভাবে সাত্মাভিমান হয় নাই। তুর্কী-বিজয় বাঙ্গালীর জীবনের অঞ্চল-দেশ মাত্র স্পর্শ করিয়াছিল; ইহা তাহার জীবনকে পূরাপুরি পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে যে একটা উন্মুখ আন্তর্ভারতিকতা জাগিয়া উঠিতেছিল—হিন্দু আমলে স্বাধীন-ভাবে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া তাহা বাঙ্গালীর প্রাদেশিক জীবনকে সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। কিন্তু মুসলমান রাজশক্তি আসিয়া, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য তাহা ব্যাহত করিয়া দিল। আসন্ন আপদ্ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্গালী কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিল, বাধ্য হইয়া সে তাহার গ্রাম্য জীবনের মধ্যেই অঙ্গ-সংহরণ করিয়া লইল। খ্রীষ্টীয় ১২০০ সালের পর হইতে, ১৮৫০ সালের দিকে ইংরেজের সঙ্গে মিলিয়া ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, সাড়ে-সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর যে জীবন ছিল, তাহা মোটের উপর গ্রাম্য জীবন ছিল। যখন রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ, উড়িয়া, তেলুগু, কানাড়ী, পাঞ্জাব ও উত্তর-ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, এই সব জাতি

মারামারি কাটাকাটি করিয়া বা মিলন করিয়া ভারতের মধ্যযুগের বা মুসলমান-যুগের ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে নিযুক্ত, তখন, কবির ভাষায়—

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে,
পায়নি সংবাদ,
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ।
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্মল
শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি' ॥

মুসলমান যুগে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে নিজ সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার প্রয়াসের ফলে, বাঙ্গালী সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিল। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে একটা 'গাঁউয়া' গেঁয়ো ভাব কায়েমী হইয়া গেল। হিন্দু যুগে, বাহিরকে লইয়া তাহার যেটুকু কারবার ছিল—ভারতের অন্য প্রদেশকে লইয়া, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, সিংহল, তিব্বত প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের দেশকে লইয়া ছিল—সেটুকু আর বজায় রহিল না। বাঙ্গালী নিজ সংকীর্ণ গ্রাম্য সমাজ ছাড়িয়া ক্বচিৎ বাহিরে যাইত—সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য মিথিলা ও কাশী, এবং তীর্থ-যাত্রার জন্য পুরী, গয়া, কাশী, পরে বৃন্দাবন, ক্বচিৎ কাঞ্চী, রামেশ্বর, দ্বারকা—ইহা-ই তাহার দৌড় ছিল। এতদ্ভিন্ন, কখন-সখন (বিশেষতঃ মোগল-বিজয়ের পরে) কোনও-কোনও বাঙ্গালী জমিদার, দিল্লী-আগ্রা পর্য্যন্ত যাইতেন, বাদশাহের দরবারে সেলাম দিবার জন্যে, জমিদারির সনদ আনিবার জন্য। বাঙ্গালী মুসলমান এবং সম্ভবতঃ দুই চারিজন বাঙ্গালী হিন্দুও বহির্বাণিজ্যের জন্য ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত জাহাজে করিয়া এদিকে বর্মা, মালয়দেশ ও দ্বীপময় ভারত, ওদিকে দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল, গোয়া, গুজরাট, এবং আরব-দেশ পর্য্যন্ত যাইত। কিন্তু এই সাগর-যাত্রাটুকুও ফিরেঙ্গী "হর্মাদ" বা পোর্তুগীস বোম্বেটিয়াদের উৎপাতে বন্ধ হইয়া গেল, বাঙ্গালী পুরাপুরি ঘরবাসী বনিয়া গেল, তাহার জীবনে সাগরের ছাপ আর পড়িল না। "কালাপানি" পার হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, এবং তখন পণ্ডিতেরা এই কলিযুগে সাগর-যাত্রা নিষিদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর একটা গৌরবের পথ এই ভাবে অবস্থা-গতিকে রুদ্ধ হইয়া গেল; মুসলমান

রাজশক্তি-ও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিল, কোনও সাহায্য করিতে পারিল না। মোগল-পূর্ব যুগে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কবিভারতীর মতো এক-আধজন বাঙ্গালী, বৌদ্ধ হইয়া সিংহলে গিয়া বাঙ্গালার সঙ্গে বাহিরের যোগের পুনরানয়নের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তখন গেঁয়ো ঘরমুখা বাঙ্গালীর কাছে তাহার কুঁড়েঘরের প্রদীপটি-ই প্রিয় হইয়া গিয়াছিল, সে বাহিরের আলো-কে আলেয়া ভাবিয়া তাহার পিছনে ঘুরিতে ভয় পাইল।

"বৃহত্তর বঙ্গ" বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, তদনুরূপ বাঙ্গালীর প্রসার মোগল-পূর্ব যুগে একমাত্র চৈতন্যদেবের প্রভাবে নূতন করিয়া ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখানেও আমাদের সময়ের মতো সজ্ঞান "গৌড়িয়াপনা" বা বাঙ্গালীয়ানা একেবারেই ছিল না। চৈতন্যদেব আসিয়া বাঙ্গালীকে আর "ঘ'রো" ও "কুণো" থাকিতে দিলেন না; তিনি যে নাম-প্রচারের আহ্বান শুনাইলেন, তাহাতে সে আর নিজ কুটীর বা গ্রামে নিবদ্ধ থাকিতে পারিল না, তাহাকে বাহিরে আসিতে হইল; রাজনৈতিক বিষয়ে না হউক, আধ্যাত্মিক জীবনে তাহাকে আর একবার বড়ো হইতে হইল, ভারতীয় হইতে হইল। চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর মধ্যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল বাঙ্গালা দেশের নহেন—তিনি বাঙ্গালীত্বের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া কেবল বাঙ্গালীয়ানার বড়াই করা অশোভন ও অনুচিত হইবে, এবং সেরূপ করিলে তদ্দ্বারা চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্রের অমর্য্যাদা করা হইবে। পুরীতে জনৈক উড়িয়া পণ্ডিতের কাছে শুনিয়াছিলাম—চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে গভীর ভক্তির সহিত তিনি বলিতেছিলেন—"মহাপ্রভু লোকোত্তর পুরুষ ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের কোনও বিশেষ জাতির নন; তাঁহার বাল্য-জীবন ও প্রথম-যৌবন অতিবাহিত হইয়াছিল বাঙ্গালীদের মধ্যে; দক্ষিণীদের মধ্যে ও হিন্দুস্থানীদের মধ্যে তিনি মধ্য-জীবনের কিয়দংশ অতিবাহিত করেন, এবং তাঁহার শেষ জীবন তিনি যাপন করেন উড়িয়াদের মধ্যে।" চৈতন্যদেবের শিক্ষায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইল; বাঙ্গালী পুরীতে গেল, সুদূর বৃন্দাবনের তীর্থগুলির উদ্ধার করিল, বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব চিন্তা ও দর্শনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিল। হিন্দু যুগের পরে, আবার বঙ্গের বাহিরে, গৌড়-বঙ্গের পণ্ডিতের, ভক্তের ও কর্মীর গমন ও অধিষ্ঠান হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসারের সঙ্গে, বাঙ্গালী ভাবের—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের—প্রচার বাহিরের প্রদেশে কিছু-কিছু হইল বটে, কিন্তু তখনও এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সজ্ঞান

ও সাত্মাভিমান বাঙ্গালীয়ানা দেখা দিল না। তাহার মুখ্য দার্শনিক ও সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ হইল সর্বভারতীয় সংস্কৃত ভাষায়।

মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালা-দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মানসিংহ আসিয়া পূর্ব-বাঙ্গালার দেবমূর্তিকে আম্বেরে লইয়া গেলেন, সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পুরোহিত গেল। বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেব তদ্রূপ জয়পুরে হিন্দু রাজার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজপুতানার বা রাজস্থানের কতকগুলি রাজ্যে, মথুরা বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালী গোস্বামীদের অধিষ্ঠান হইল। বাঙ্গালী জ্যোতিষী, পণ্ডিত বিদ্যাধর, জয়পুর-নগর স্থাপনের সময়ে, সরাঈ রাজা জয়সিংহের সহায়ক হইলেন। ষোড়শ শতক হইতে শ্রীরূপ-সনাতন-জীব প্রমুখ বৈষ্ণব গোস্বামিগণের অবস্থানের ফলে, বৃন্দাবন বাঙ্গালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। এই সব কৃতিত্বের জন্য বাঙ্গালী মর্য্যাদার বড়াই কেহ করেন নাই—ভারতের আর পাঁচটি জাতির মধ্যে অন্যতম জাতি হিসাবে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ এই-সব কার্য্য করিয়াছিলেন।

মোগল-যুগে উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাঙ্গালার যোগসূত্র আরও সুদৃঢ় হইল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ফারসীর চর্চা বাড়িল। উত্তর-ভারতের রাজ-দরবারে বাঙ্গালার মলমলের চাহিদা বেশী করিয়া হইতে লাগিল। বাঙ্গালার বাঁশের কুঁড়ের চাল-রচনার ধাঁচা, রাজপুত-মোগল বাস্তুশিল্পে pavilion বা বিমান-গৃহ নির্মাণে গৃহীত হইল, ইহার ফলে রাজপুত-মোগল বাস্তুশিল্পে "রেওটী" নামক বাঁকা-ছাত বিমানের উদ্ভব হইল। বাঙ্গালাদেশের কুটীরের মতো হাল্‌কা-ধরনে তৈয়ারী ছোটো বাসবাটীর নাম উত্তর-ভারতে হইয়া গেল "বাঙ্‌লা" (বা বাঙ্‌লা) বাড়ি।

মুসলমান-যুগের চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়া বাঙ্গালাদেশ হইতে আর কোনও লক্ষণীয় আন্তর্ভারতীয় আন্দোলন উদ্ভুত হয় নাই। ধর্ম-সম্বন্ধীয় আন্দোলন বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীয়ানার কোনও স্থান ছিল না। সজ্ঞান "বৃহত্তর বঙ্গ" তখন হয় নাই, যদিও প্রশংসনীয় ভাবে বঙ্গভাষীর প্রভাব বঙ্গের বাহিরে কোনও-কোনও দেশে গিয়া পহুঁছিতেছিল।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতে বাঙ্গালাদেশে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাদুর্ভাব ঘটিতে থাকে। পারস্য-রাজ্যের আরমানী-জাতীয় প্রজারা ষোড়শ শতক হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত, বাঙ্গালা দেশেও তাহাদের গতায়াত ছিল। ১৩৫০ সালের পূর্বেই আরমানীরা কলিকাতায় একটি ব্যবসায়-

কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের দ্বারা তৈয়ারী এই ক্ষেত্রে, ১৬৯১ সালে ইংরেজ Job Charnock যোব চার্নক ইংরেজদের একটা আড্ডা স্থাপিত করিয়াছিলেন। ধীরে-ধীরে দেশ-মধ্যে ইংরেজদের প্রভাব ও প্রভুত্ব বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে, দুর্বল নবাব সিরাজুদ্দৌলার রাজ্য কালে, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল। অজ্ঞান, স্বার্থান্ধ, কুচক্রী, মনুষ্যত্ব-বিহীন কয়েকজন বাঙ্গালী ও বঙ্গ-প্রবাসী জমিদার, সমাজ-নেতা, সেনানী ও ধনী ব্যক্তি মিলিয়া, স্বদেশকে ইংরেজের হাতে তুলিয়া দিল।

অষ্টাদশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে বাঙ্গালীর যে অধোগতি হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরেজ বাঙ্গালাদেশে রাজা হইয়া বসিল, এবং বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষময় ইংরেজের রাজ্যের প্রসার ঘটাইল। বাঙ্গালারই পয়সায়, এবং কেবল পয়সার জন্য যাহারা কাঁচা মাথা দিতে প্রস্তুত, এরূপ তেলেঙ্গা ও ভোজপুরিয়া সিপাহীর সাহায্যে, ইংরেজ ধীরে-ধীরে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রায় সমগ্র ভারত জয় করিয়া ফেলিল। ইংরেজ-শাসনের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে, ইংরেজের তল্পিদার-হিসাবে বাঙ্গালীরও বিস্তার ঘটিল। যেখানে-সেখানে ইংরেজের ছাউনি, ইংরেজের তহশীল, ইংরেজের পুলিস, ইংরেজের দপ্তর, ইংরেজের আদালত, ইংরেজের ইস্কুল, ইংরেজের ডাকঘর ও ইংরেজের দোকান বসিল, যেখানে-সেখানে ইংরেজি-জানা কেরানি, রাজকর্মচারী, শিক্ষক, উকিলের দরকার হইল, এবং বাঙ্গালী অল্প দু'পাতা বা কিছু বেশী করিয়া ইংরেজি পড়িয়া, সেখানকার ইংরেজি-নবীস লোকের অভাব দূর করিল। হাসপাতাল হইল, ইংরেজ ডাক্তারের নীচে বাঙ্গালী ডাক্তার গিয়া হাজির হইল। কেবল বাঙ্গালী মজুরের যাইবার দরকার হইল না—দৈহিক শ্রমের দ্বারা যাহারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে এমন অশিক্ষিত লোকের অভাব উত্তর-ভারতে ছিল না। আর বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কেহ গেল না; কারণ ইংরেজের সাহচর্য্যে আসিয়া ব্যবসায়-কার্য্যে বাঙ্গালীর উৎসাহ ও প্রবৃত্তি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। ওদিকে উত্তর-ভারত হইতে দলে-দলে বণিক্, চাকর, দরোয়ান, মজুর আসিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে কায়েম হইয়া বসিল, পরে বাঙ্গালাদেশ-ময় ছড়াইয়া পড়িল। বিহারী আসিল, হিন্দুস্থানী আসিল, উড়িয়া আসিল; পরে মারওয়াড়ী ও পাঞ্জাবী আসিল—এখন ভাটিয়া ও গুজরাটী আসিতেছে, নেপালী আসিতেছে, তেলুগু আসিতেছে, তমিল মালয়ালীও আসিতেছে।

এইরূপে বাঙ্গালার বাহিরে ইংরেজের আমলে ও ইংরেজের আশ্রয়ে নবীন যুগের এক "বৃহত্তর বঙ্গ" যেমন প্রতিষ্ঠিত হইল, তেমন-ই—সে দিকে আমরা কোনও দৃষ্টি দেই নাই—সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এক-একটি "বৃহত্তর বিহার", "বৃহত্তর হিন্দুস্থান", "বৃহত্তর মারওয়াড়", "বৃহত্তর উড়িষ্যা" এবং হালে "বৃহত্তর পাঞ্জাব", "বৃহত্তর গুজরাট", "বৃহত্তর অন্ধ্র", "বৃহত্তর তামিল-নাড", "বৃহত্তর কেরল"-ও স্থাপিত হইতে লাগিল। "বৃহত্তর বঙ্গ" এখন অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার বুকের ভিতরে এই সকল "বৃহত্তর অন্য প্রদেশ" বেশ বাড়-বাড়ন্ত অবস্থায়, বেশ জাঁকাইয়া বিদ্যমান; আমরা স্বেচ্ছায় ইহাদের নিগড় পরিয়া রহিয়াছি, এবং ইচ্ছা করিলেও নিজেদের মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

ইংরেজ-আমলে এই যে "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা খুব সচেতন, খুব সাত্মাভিমান বটে—কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীর গর্ব করিবার বড়ো কিছু-ই নাই; একদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, নবীন যুগের এই "বৃহত্তর বঙ্গ" বাঙ্গালী জাতির পক্ষে চরম অগৌরবের। ভারতবর্ষের রাজধানী হইতে সুদূর কোণে অবস্থিত একটি প্রদেশের অধিবাসী, একটি গেঁয়ো জাতি,—মধ্য-যুগের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাহার কোনও স্থান ছিল না, রাজপুত, মারহাট্টা, কানাড়ী, তেলুগুর মতো, উত্তর-ভারতের হিন্দু আর মুসলমানের মতো, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস গড়িতে কোনও লক্ষণীয় সহায়তা যে করে নাই, যাহার একমাত্র গর্বের বস্তু হইতেছে কিছু পরিমাণে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা এবং মধ্য-যুগের আন্তর্ভারতিক ভাব-জগতে চৈতন্যের ব্যক্তিত্বকে দান করা,—সেই অনাদৃত গেঁয়ো জাতি, তাহার নেতাদের অশ্রুত-পূর্ব নীচতা ও মূর্খতার বশে, মুষ্টিমেয় বিদেশীর হাতে স্বদেশকে বিকাইয়া দিল; এবং পরে যখন তাহার দেশে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সেই অর্থ দিয়া বাহির হইতে সিপাহীদের কিনিয়া, এই বিদেশীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জয় করিতে লাগিল, বাঙ্গালীরা, অম্লান-বদনে নহে, মহোল্লাসে—সেই বিদেশীর পিছনে-পিছনে চলিল। গরীবের হঠাৎ বড়ো-মানুষি ঘটিল, আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল। সাহেবদের সঙ্গে-সঙ্গে, বড়ো-সাহেবের নীচে বাঙ্গালী ছোটো-সাহেব হইয়া উঠিল। উড়িষ্যা-প্রদেশের জনৈক বিখ্যাত জন-নেতার ভাষায়—ruling race-এর সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালী একটি intermediate ruling race হইয়া দাঁড়াইল।

এই ময়ূর-পুচ্ছে দেহ আবৃত করিয়া বাঙ্গালীর মন অহমিকায়—"হাম্-বড়া"-ভাবে পূর্ণ হইল ; ইংরেজ-কর্তৃক নূতন বিজিত প্রদেশে তাহার সর্দারি করিতে যাওয়ার মধ্যে যে কতখানি দৈন্য ছিল, তাহা সে বুঝিতে পারল না। স্থানীয় লোকেরাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না ; তবে ইহাতে তাহাদের মনের অন্তস্থলে অজ্ঞাত- বা প্রচ্ছন্ন-ভাবে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যে একটুখানি জুগুপ্সা, বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব না আসিয়া গেল, তাহা নহে। ইংরেজের সাহচর্য্যের বলে, নূতন-লব্ধ ইংরেজি শিক্ষার দম্ভ ও মোহে, সে ভারতের সুপ্রাচীন সুসভ্য জাতিগুলিকে বহু স্থলে হেয় ভাবিতে লাগিল। সূর্য্যের তাপ লোকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু বালির তাপ কেহ সহিতে চাহে না। বঙ্গের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালীদের যে স্থানীয় লোকে আর তিষ্ঠিতে দিতেছে না, তাহার অন্তর্নিহিত অন্যতম কারণ বোধ হয় এই-ই ;—বিশেষতঃ এখন, যখন সকলেই বুঝিতেছে যে সরকার-বাহাদুর আর বাঙ্গালীর প্রতি মোটেই প্রীত নহেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাতী পাঁকে পড়িলে বেঙ্গেও আসিয়া লাথি মারিয়া যায়—এ প্রবাদ অতি সত্য অভিজ্ঞতার ফল।

গভীর-ভাবে তলাইয়া দেখিলে, এই "বৃহত্তর বঙ্গ" লইয়া হৈ-চৈ করা খুব শোভন ব্যাপার হইবে না। বাঙ্গালীদের "বৃহত্তর-বঙ্গ"-র দেখাদেখি মহারাষ্ট্রীয়েরা "বৃহন্মহারাষ্ট্র" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—"বৃহন্মহারাষ্ট্র" লইয়া সভা-সমিতিও হইয়া গিয়াছে। সকলেই বৃহৎ, সকলেই মহান্। কিন্তু "বৃহন্মহারাষ্ট্র" যে-ভাবে প্রসারিত হইয়াছিল, সে-ভাবে "বৃহত্তর- বঙ্গ" প্রসার লাভ করে নাই। আবার প্রাচীন কালে (অর্থাৎ মুসলমান- ও হিন্দু-যুগে) যদি আমরা "বৃহত্তর বঙ্গ"-র কথা কল্পনা করি, তাহা হইলে তাহার প্রতিষ্ঠাও যে সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্-ভাবে হইয়াছিল, তাহা বুঝিতেও দেরী লাগে না। আধুনিক কালের "বৃহত্তর বিহার", "বৃহত্তর উড়িষ্যা" যে-ভাবে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইতেছে, তাহা আবার বঙ্গদেশের বুকের উপরে প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর-মারওয়াড়", "বৃহত্তর গুজরাট" ও "বৃহত্তর পাঞ্জাব" হইতে পৃথক্। ইংরেজের "বৃহত্তর ইংলাণ্ড" লইয়া ইংরেজ জাতি গর্ব করিয়া থাকে, তাহাদের গর্ব করিবার অধিকারও আছে। আরবের "বৃহত্তর আরব", যাহা আরব দেশ ছাপাইয়া ইরাক বা মেসোপোতামিয়া, শাম বা সিরিয়া, মিসর, সূদান, ত্রিপোলি, তুনিসিয়া, আল্-জযাইর বা আল্জিয়র্স, মঘ্রব বা মরোক্কো পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, স্পেন, কর্সিকা, সিসিলি, মাল্টা, পারস্য, মধ্য-এশিয়া এক সময়ে যে "বৃহত্তর আরবদেশ"-এর পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল, সেই "বৃহত্তর আরব" লইয়া খালি আরব কেন, আরব-জাতির মাওয়ালী বা শিষ্য, অথবা

ভাব-জগতের প্রজা, অন্য মুসলমান জাতিও গর্ব করিয়া থাকে। প্রাচীন-কালে ভারতের ভাব-রাজ্যের, ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রসারের ফলে, এশিয়ার প্রায় সর্বত্র যে "বৃহত্তর ভারত" সংস্থাপিত হইয়াছিল, যাহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা সেরিন্দিয়া বা প্রাচীন মধ্য-এশিয়ায়, ইন্দোচীন বা ব্রহ্ম-শ্যাম-কম্বোজ-চম্পায়, ইন্দোনেসিয়া বা মালয়দেশ ও দ্বীপময়-ভারতে, তথা ভোট বা তিব্বত, চীন, আনাম, কোরিয়া ও জাপানে দেখিতেছি, তাহা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের অবদান—আমরা অধঃপতিত ভারতীয়েরা এই কথা স্মরণ করিয়াও এখন ধন্য হইতে পারি। কিন্তু এখনকার "বৃহত্তর ভারত"? যে ভাবে আড়কাঠির সাহায্যে কুলি চালান দিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা, ফিজি, গায়েনা, জ্যামেকা প্রভৃতি দেশে এই নূতন বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কি আমাদের বুক উৎসাহে দশ হাত হইতে পারে? এই বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে—অথবা নিগ্রো ক্রীতদাসদের আগমনের ফলে আমেরিকার সংযুক্তরাষ্ট্রে যে "বৃহত্তর আফ্রিকা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে—কেহও কি "বৃহত্তর ইংলাণ্ড"-এর তুলনা করা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিবে?—"রামচন্দ্র" ও "রামছাগল", উভয়ের মধ্যে "রাম" শব্দটি সাধারণ—অতএব এই দুই শব্দ সামান্য-ধর্মী—ইহা এই ধরনের হাস্যজনক কথা হইবে।

আধুনিক "বৃহত্তর বঙ্গ" আমরা জানি। ইহার যে কোনও সার্থকতা ছিল না, ইহার দ্বারা যে ভারতের কোনও কাজ হয় নাই, তাহা কেহ বলিবে না। কিন্তু সমর্থ রামদাস দ্বারা অনুপ্রাণিত শিবাজী কর্তৃক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বৃহন্মহারাষ্ট্র যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও যে ভাবে তাহা অষ্টাদশ শতকে পেশোয়াদের দ্বারা ভারতবর্ষময় বিস্তৃত হয়, বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া পশ্চিমে ও দক্ষিণে একটু ঘুরিয়া আসিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়; এবং তদ্দর্শনে মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী ও মহারাষ্ট্র-সরস্বতীর নিকটে, মহারাষ্ট্র-শক্তি ও মহারাষ্ট্র-বুদ্ধির সমক্ষে, মস্তক অবনত না করিয়া পারা যায় না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতে হিন্দু-সংস্কৃতির সংরক্ষণ এই বৃহন্মহারাষ্ট্র দ্বারাই হইয়াছিল। এ কথা সত্য বটে, সর্বত্রই যে বৃহন্মহারাষ্ট্র, সন্ন্যাসী রামদাস ও ছত্রপতি শিবাজীর এবং ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী ও পেশোয়া বালাজী বাজী রাওয়ের মহান্ আদর্শ—"গো-ব্রাহ্মণ" রক্ষার আদর্শ (অর্থাৎ হিন্দুর সংসার ও সমাজ এবং হিন্দুর জ্ঞান ও সাধনা রক্ষার আদর্শ) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা নহে; বাঙ্গালাদেশে নাগপুর হইতে কতকগুলা মারহাট্টা লুঠেরা ("বার্গীর্") আসিয়া, পশ্চিম-বাঙ্গালার প্রজাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার

করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি "বর্গী" নামের সঙ্গে এখনও জড়িত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ অপচার দুই দশ স্থলে হইয়াছিল বলিয়া, আদর্শের মহত্ত্ব এবং অন্যত্র তাহার কার্য্যকরতা খর্ব হয় না। উত্তর-ভারতের হিন্দী কবি ভূষণ যে বলিয়াছিলেন, শিবাজী আসিয়া হিন্দুর "চোটী বেটি রোটী" অর্থাৎ হিন্দুর মাথায় শিখা বা ধর্ম, হিন্দুর মেয়ের সম্মান, এবং হিন্দুর রুটী অর্থাৎ অন্ন বা অর্থনৈতিক জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য উক্তি। বিজেতা ধর্মান্ধ মুসলমান —কি বিদেশী মুসলমান, কি হিন্দু-সন্তান মুসলমান, যেখানে যাহা ভাঙ্গিয়াছিল, ধ্বংস করিয়াছিল, লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুশক্তি তাহার উদ্ধার করিয়াছে, তাহাকে জীয়াইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে উত্তর-ভারতে, কাশীতে এবং অন্যত্র, সংস্কৃত-বিদ্যা রক্ষা পাইয়াছিল—অনেকটা পেশোয়াদের পৃষ্ঠ-পোষিত মহারাষ্ট্র-পণ্ডিতদের চেষ্টায়। গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির, কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মন্দির, মহারাষ্ট্রীয় রানী অহল্যাবাঈয়ের কীর্তি। উজ্জয়িনীতে গিয়া দেখিলাম, মহারাষ্ট্র রাজশক্তির প্রভাবেই অত বড়ো হিন্দুতীর্থটি পুনরায় প্রাণ পাইয়া টিঁকিয়া আছে। সুদূর দক্ষিণে তমিলদেশ তাঞ্জোরেও মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুর পূর্ণ প্রভাব। এ একেবারে অন্য জিনিস; এ জিনিস উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে ও তৃতীয়-পাদে বাঙ্গালী কিছু-কিছু বুঝিতে পারিত—কিন্তু 'হিন্দু' নামের মর্য্যাদা যাহারা ভুলিতে বসিয়াছে এমন অতি-আধুনিক বাঙ্গালী এ জিনিস বুঝিবে না।

ইংরেজদের middlemen হইয়া, অর্থাৎ তাহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া আমাদের হালের বৃহত্তর-বঙ্গের প্রসার। ইহা নায়েবি গোমস্তাগিরি দারোগাগিরির মতোই ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে সত্যকার আত্ম-প্রসাদের যে কিছু-ই নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালী তাহার এই তল্পিদারির, এই ফড়িয়াগিরির অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। ইংরেজি শিখিয়া বাঙ্গালী যে জিনিসটি ভারতবর্ষের অন্য সব জাতির তুলনায় অনেক আগেই পাইয়াছিল—তাহার মনের আধুনিকতা, মনের সংস্কার-মুক্ত ভাব— তাহা তাহাকে এমন একটি স্থানে উন্নীত করিয়াছিল, যেখানে উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধেও সাধারণ ভারতবাসীর (বিশেষতঃ অ-বাঙ্গালী ভারতবাসীর) পক্ষে পঁহুছানো, একেবারে অসম্ভব না হইলেও, বিশেষ কঠিন ব্যাপার ছিল। দুইটি জিনিস বাঙ্গালী ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া পাইয়াছিল,—জ্ঞানলিপ্সা অর্থাৎ নূতন

খবর, বাহিরের জগতের খবর জানিবার আকাঙ্ক্ষা;—এবং স্বাধীন চিন্তা। তাহার স্বাধীনতার স্পৃহা এবং জাতীয়তার উন্মেষও এই স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই উদ্ভূত হয়।

বঙ্গের বাহিরে গিয়া বাঙ্গালী চাকুরিজীবী এই দুইটি বস্তু ভারত-মাতার সেবায় উপস্থাপিত করিল। প্রবাসী বাঙ্গালী উত্তর-ভারতে ও অন্যত্র যেখানে-যেখানে গিয়াছে, প্রায় সর্বত্রই ইংরেজি ইস্কুল খুলিয়াছে, অথবা ইংরেজি ইস্কুল খুলিতে সাহায্য করিয়াছে; ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। টাকা-কড়ি দিয়াছে, জমি দিয়াছে, বিনা বেতনে পরিশ্রম করিয়াছে। এই শিক্ষা-প্রচারের দ্বারা, বিচার করিয়া দেখিলে, এক হিসাবে সে নিজের পায়েই কুড়ুল মারিয়াছে; স্থানীয় লোকেরা ইংরেজি-শিক্ষিত হইলে, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা যে ও-সব দেশে আর থাকিবে না, সে কথা প্রবাসী বাঙ্গালীরা চিন্তা করেন নাই;—এই সকল ইংরেজি ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় প্রাদেশিক স্বার্থবোধ তাঁহাদের একেবারেই ছিল না, সমগ্র ভারতের হিতৈষণা ইহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বাঙ্গালী উকিল ও অন্য স্বাধীন ব্যবসায়ীর হাতে ইংরেজি সংবাদপত্রের দ্বারা রাজনৈতিক শিক্ষাও প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালী-ই "ভারত-মাতা"-র কল্পনা ও বোধ ভারতময় প্রচার করে, "স্বদেশী" মন্ত্র বাঙ্গালীর দ্বারাই প্রচারিত হয়। ইংরেজ রাজসরকারে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা আগে যাহা ছিল, তাহার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, শিক্ষা ও দেশাত্মবোধের মন্ত্র বাঙ্গালী যখন প্রচার করিল, ভারতের লোকেরা তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল না,—বাঙ্গালার বাহিরের লোকেদের চরিত্রে এ বিষয়ে গ্রহণশক্তিও যথেষ্ট ছিল।

আধুনিক বৃহত্তর বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে চাকুরিগত-প্রাণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের দ্বারা। এইরূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতে সব প্রদেশে নাই, বা ছিল না। চাকুরি-জীবী ছাড়া, বাঙ্গালী কারিগর ও ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরে ও কাশীতে কিছু-কিছু আছে, এবং বহু তীর্থবাসী কাশী ও বৃন্দাবনে প্রবাসী হইয়া আছেন। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকীর্ণতা ও উদারতা, উভয়-ই বৃহত্তর বঙ্গে বিদ্যমান। নিজের সম্প্রদায়ের বা সামাজিক গণ্ডীর বাহিরে কিছু দেখিলে, সে জিনিসকে সহজে বুঝিতে না পারা, বা বুঝিবার জন্য তাদৃশ চেষ্টা না করা—ইহা এক সাধারণ সংকীর্ণতা; বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত নহে। সংকীর্ণতার আনুষঙ্গিক আর একটি অবগুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বিদ্যমান—অনুচিত দম্ভ বা অহমিকা। অ-বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত কতকগুলি

সাধারণ গালি এই সংকীর্ণতা ও দম্ভ হইতে উদ্ভূত। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই সংকীর্ণতার সঙ্গে-সঙ্গে আবার আত্মভোলা উদারতাও দেখা যায়। নিজের অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া স্থানীয় লোকের মধ্যে শিক্ষা ও অন্য বিষয়ে উন্নতি বিধানের চেষ্টার দৃষ্টান্ত, বহু প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে দেখা গিয়াছে।

বাঙ্গালী যেখানে-যেখানে বাস করিয়াছে, তাহার শিক্ষা ও রুচি অনুসারে সে সাধ্য-মতো সেখানকার লোকেদের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু—

The evil that men do lives after them ;
The good is oft interred with their bones.

—প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। ইংরেজি শিক্ষার ফলে, উত্তর-ভারতের নানা স্থানে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। যেখানে এই শ্রেণীর অভাব বা অল্পতা ছিল, ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হওয়ায়, এবং ইংরেজি-শিক্ষিত কেরানি ও কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক ইত্যাদির আবশ্যকতা হওয়ায়, এই ইংরেজি-জানা স্থানীয় ব্যক্তি বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্বত্র দেখা দিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী ইংরেজি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া, এবং শিক্ষাদানে ও অন্য রূপে, ইংরেজের সহায়তা করিয়া, বাঙ্গালার বাহিরে এই শ্রেণীর উদ্ভবে অংশ-গ্রহণ করিয়াছে। যেমন-যেমন এক-এক পুরুষের লোক অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, তেমন-তেমন এখন তাহাদের কৃত জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা বাঙ্গালার বাহিরের লোকেরা ভুলিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালীর উদারতার কথা ভুলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু বাঙ্গালী যে সরকারের পিয়ারা ছিল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ-কেহ যে তুচ্ছতার সহিত বাহিরের লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার করিত, সে কথা তাহারা মনে করিয়া রাখিতেছে। এখন সরকার ও জনসাধারণ এক হইয়াছেন—অবস্থা-গতিকে প্রবাসী বাঙ্গালীর উচ্ছেদসাধন ঘটিতেছে। ইহার উপর বিধাতার মার আছে ; বিহারের ভূমিকম্পে কয়েক মিনিটের মধ্যে, বিগত তিন-চারি পুরুষ ধরিয়া বিহারে বাঙ্গালী যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার অনেকখানি ভূমিসাৎ হইয়া গেল ; বিহারে প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর বঙ্গ" এখন হতশ্রী, মৃতপ্রায়।

দক্ষিণ ভারতে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর আবশ্যকতা তেমন হয় নাই, কাজেই বাঙ্গালী চাকুরিয়াকে সেখানে যাইতে হয় নাই। ওদিকে বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইনের প্রসাদে তেলুগু, তমিল ও মালয়ালী কেরানি আসিয়া এখন বাঙ্গালীর ঘরের ভিতর চড়াও হইতেছে।

এই অবস্থার প্রতিকার কী? "বৃহত্তর বঙ্গ"-র দুরবস্থা, বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী জাতির নিজের দুরবস্থারই অংশ মাত্র। বাঙ্গালা দেশের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর—জীবন-সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। অথচ এ-দিকে তেমন কেহ চিন্তা করিতেছেন না। "ওরিএন্টাল" নৃত্য, তরুণী-নৃত্য, বিভিন্ন সিনেমা-ওয়ালাদের নব-নব "অবদান", যৌনতত্ত্ব লইয়া রচিত উপন্যাস, সহশিক্ষা, ফুটবল, এবং অবসর মতো একটু-আধটু নিজ পঙ্গু সমাজের নিন্দা-কটূক্তি ও সঙ্গে-সঙ্গে "রাশ্যা" অর্থাৎ রুষদেশের প্রগতির প্রশংসাময় আলোচনা—এই পথে আমাদের যুবকদের মন চালিত হইতেছে। নিজ পারিপার্শ্বিকের, অর্থাৎ যে সমাজের মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার কোনও কাজ করিবার কথা উঠিলে, সমগ্র ভারতীয় অথবা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রসঙ্গ তুলিয়া এ সমস্ত ছোটো কথা চাপা দিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। হিন্দু হিন্দু-সমাজের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিলে, এই চেষ্টাকে আমরা communalism বলিয়া গালি দেই। দেশের ভিতরে তো আমাদের এই অবস্থা। বাহিরের অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিবারই সময় পাই না—প্রতিকারের চিন্তা তো দূরের কথা।

বিহার এবং সংযুক্ত-প্রদেশের (উত্তর-প্রদেশের) পূর্ব-অঞ্চলের কতকগুলি চিন্তাশীল প্রবাসী বাঙ্গালী, যাঁহারা নিজেদের অবস্থার সম্বন্ধে চিন্তিত এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সম্বন্ধে ভীত, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি—চাকুরির দিকে তাকাইয়া থাকিলে "বৃহত্তর বঙ্গ" আর টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই প্রবাসী বাঙ্গালীকে ঝুঁকিতে হইবে। এ-দিকে প্রতিযোগিতা খুব-ই আছে, তবে ঈর্ষ্যাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, আত্মলঘুতাবোধপূর্ণ প্রতিযোগিতা বোধ হয় এখনও ততটা দেখা দেয় নাই,—যে প্রকারের প্রতিযোগিতা চাকুরির ক্ষেত্রে ও "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোকের ব্যবসায়ে বিদ্যমান দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালীদের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে সকল বাণিজ্য ও ব্যাপার, সেগুলির একটা বড়ো অংশ প্রবাসী বাঙ্গালীদের হাতেই থাকা উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বেনারসী কাপড়ের কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্র-গৃহস্থের বিবাহে বেনারসী জোড় ও সাড়ী (অভাবে বিষ্ণুপুরের চেলীর জোড় ও সাড়ী) না হইলে চলে না। বেনারসীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এমন জরীর কাজযুক্ত চেলী বা রেশমের বস্ত্র বিষ্ণুপুরে এখনও তৈয়ারী হয় নাই, তবে হওয়া উচিত; এতদ্ভিন্ন, বেনারসী জরীর-কাজের কাপড়ের একটি আভিজাত্য আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে

বেনারসী কাপড়ের এত আদর থাকায়, এ ভীষণ দুর্দিনেও বেনারসী বস্ত্র-শিল্প কতকটা রক্ষা পাইয়াছে—এ-কথা বেনারসী কাপড়ের ব্যবসায়ীর মুখে শুনিয়াছি। এই কাজ কাশী-প্রবাসী বাঙ্গালী কিছু-কিছু হাতে লইয়াছেন। আরও বেশী লোকের এই প্রকারের কাজে নামা উচিত। বাহির হইতে যে ঘিয়ের, মাছ ও অন্য খাদ্যদ্রব্যের চালান আসে, সেদিকেও আমাদের অবহিত হইতে হইবে। বাঙ্গালাদেশের মাল যাহা বাঙ্গালার বাহিরে অন্য প্রদেশে যায়, তাহা যথা-সম্ভব প্রবাসী বাঙ্গালীর হাত দিয়া যাহাতে যাইতে পারে, তদ্বিষয়েও চেষ্টা করা উচিত। ব্যাপারটি সোজা বা সহজ-সাধ্য নহে। এক তো আমাদের বাণিজ্যের উপযুক্ত বুদ্ধি বা তদ্বিষয়ে রুচি নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রতিকূলতা-ও অনেক। পয়সা উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনও sentiment বা সুকুমার ভাব নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যে যাহারা টাকা করিতে নামে, তাহারা (অন্য বহু ব্যবসায়েরই মঁতো) অনেক সময়ে নির্মম হৃদয়হীনতার ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙ্গালার সহিত গুজরাটের কলওয়ালা ও বণিগ্‌দিগের ব্যবহার আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত।

বৃহত্তর বঙ্গে বাঙ্গালীর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য চেষ্টা—আমার মনে হয়, এ বিষয় এখন কিছুকালের জন্য ধামা-চাপা থাক্। এখন ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সাহিত্যিক ব্যসনের সময় এখন নাই। প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েরা ঘরে বাপ-মায়ের সঙ্গে বাঙ্গালা বলিবে, এবং অন্ততঃ বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে শিখিবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে এইটুকু হইলেই যথেষ্ট। যাতায়াতের সুবিধার প্রসাদে, বঙ্গের সঙ্গে "বৃহত্তর বঙ্গ"র যোগসূত্র আর সহজে নষ্ট হইবার নহে; কিন্তু বৈবাহিক আদান-প্রদান যতদিন স্বশ্রেণীর বা স্বজাতির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে, ততদিন প্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা, আম্বেরের 'শিলামতা' যশোহরেশ্বরীর পুরোহিতদের মতো অথবা করৌলীর গোস্বামীদের মতো দাঁড়াইবে—স্বশ্রেণীর পাত্রপাত্রী পাওয়া কঠিন; ভাষায়, জীবনযাত্রায় তাঁহারা রাজস্থানীদের মতো হইয়া গিয়াছেন বলিয়া, সুদূর বাঙ্গালা দেশ হইতে জামাই-বউ পাওয়া ইঁহাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার পড়িয়াছে;—তবে কাশীতে প্রয়াগে আগ্রায় বৃন্দাবনে ও অন্যত্র উপনিবিষ্ট স্বশ্রেণীর প্রবাসী বাঙ্গালী ঘরের সঙ্গে উহাদের বেশির ভাগ করণ-কারণ করিতে হয়। স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ বদ্ধ হইলে, অর্থাৎ বিবাহ-বিষয়ে আধুনিক হিঁদুয়ানি যে ভাবে চলিতেছে তাহা অচল হইলে, প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবার বেশি দেরি আর থাকিবে না।

"বৃহত্তর বঙ্গ" যাঁহাদের লইয়া, তাঁহারা আর একটি জিনিস সহজে করিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা বঙ্গদেশের তথা ভারতের সেবা করিতে পারেন। বাঙ্গালীর সহিত অন্য প্রদেশের লোকেদের, এবং অন্য প্রদেশের লোকেদের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় তাঁহাদেরই দ্বারা ভালো করিয়া হইতে পারে। এই কাজের জন্য তাঁহাদের মাতৃভাষা ভালো করিয়া শেখা উচিত, এবং স্থানীয় ভাষাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষার মতো করিয়া লওয়া উচিত। হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া সাহিত্যে কতকগুলি বাঙ্গালী সম্মানের স্থান করিয়া লইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে কম আনন্দের ও গৌরবের কথা নহে। রাধানাথ রায়, অমৃতলাল চক্রবর্তী, নবীনচন্দ্র রায়, বাবা যমুনাদাস, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—ইঁহারাই যথার্থ বৃহত্তর-বঙ্গের সেবক। হিন্দী, উর্দু, রাজস্থানী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, মারহাট্টী প্রভৃতি ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করা—এ দিক্ দিয়াই তাঁহাদের বঙ্গবাণীর সেবা সার্থক হইতে পারে। অবশ্য যাঁহার শক্তি আছে, যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সেই অবস্থাতেই তিনি অনুবাদ-সাহিত্য অথবা সত্যকার রস-সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর বঙ্গ" ধরিব না—সেখানে "বৃহত্তর ভারত" বিদ্যমান ;—সেখানে দু-পাঁচজন বাঙ্গালী থাকিলে একত্র মিলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা গান, বাঙ্গালার বিশিষ্ট সংস্কৃতি লইয়া আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু বিদেশীর সমক্ষে বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালার তিলক কপালে পরিয়া বেড়াইলে, সমগ্র ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য একত্বের বিরুদ্ধেই কতকটা কার্য্য করা হইবে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ভারতের বাহিরে কোথাও "বৃহত্তর বঙ্গ" গড়িয়া উঠে নাই। বর্মা—সে তো এতাবৎ ভারতের অংশ হইয়াই ছিল। বর্মায় প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালী মুসলমান (কৃষক ও নাবিক শ্রেণীর লোক) যায়, কিছু-কিছু হিন্দু কেরানি যায়; অন্য প্রদেশ হইতে তেলুগু ও তমিল কুলি, শিখ পাহারাওয়ালা, হিন্দুস্থানী দরোয়ান, উড়িয়া মালী ও মিস্ত্রি, এবং গুজরাটী খোজা ও ভাটিয়া, তমিল হিন্দু চেট্টি এবং মুসলমান চুলিয়া ও লাব্বে যায়। তাহারা এতাবৎ বর্মীদের সংস্কৃতিতে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। সকলের এক উদ্দেশ্য—কোনও রকমে বর্মার লোকেদের কাছ হইতে পয়সা উপার্জ্জন করা, অথবা চাকুরি-জীবী হইলে, কোনও রকমে চাকরিটুকু বজায় রাখা। বর্মায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অভাব নাই; এবং বর্মী জানেন, বেশ ভালো রকম বর্মী

জানেন, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীও অপ্রচুর নহে। কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী হিন্দু বর্মার বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ভাব-গত আত্মীয়তা বাড়াইয়া তুলিতে পারিয়াছেন? ভারতবর্ষীয়েরা বর্মীদের কাছে "কালা খোয়ে" অর্থাৎ "সাগর পারের কুকুর" মাত্র রহিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে ক্রমে একটি তীব্র ভারতীয়-বিদ্বেষ দেখা যাইতেছে—তাহার বহু নিষ্ঠুর পরিচয় আমরা খবরের কাগজে পড়িতেছি। ভারতীয় সংস্কৃতি বর্মীদের দ্বারে পহুঁছাইয়া দিতে-ই বা কয় জনে চেষ্টা করিয়াছেন? বর্মীদের সম্বন্ধেও আমরা কতকটা অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছি—তাহাদের ব্যাবহারিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোনও খবর আমাদের কাছে পহুঁছায় নাই।

বর্মার বাহিরে অন্যত্র বাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য। শ্যামদেশে দুই এক জন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও কেরানি; মালয়েও তাই, অধিকন্তু দুই-চারি জন ব্যারিস্টার; এবং পূর্ব-আফ্রিকায়, কেনিয়ায় ও তাঙাঞ্জিকায় দুই-চারি জন বাঙ্গালী আছেন শুনিয়াছি। ইংলাণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্মানিতে কিছু কিছু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী গুরুকুল-বাস করিতে যান মাত্র, স্থায়ী ভারতীয় অধিবাসী খুব-ই কম। সুতরাং ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর বঙ্গ"-র কথা উপস্থিত ক্ষেত্রে কাজের কথা নহে।

উপসংহারে খালি এই কথা বলিতে চাই—বাঙ্গালী ঘরে বড়ো হইলেই তবে বাহিরেও বড়ো হইবে। "বৃহত্তর বঙ্গ"-কে একটি জীবন্ত আদর্শ হিসাবে সার্থক করিতে গেলে, প্রবাসী বাঙ্গালীর দায়িত্ব খুব-ই আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ দায়িত্ব, ঘরবাসী বা বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর। বাঙ্গালী চারিত্র্য-যুক্ত হইলে, ঘরে-বাহিরে, পথে-প্রবাসে সবত্র তাহার জয় হইবেই।

"বৃহত্তর বঙ্গ", "বৃহত্তর বঙ্গ" বলিয়া চীৎকার করিয়া কোনও লাভ নাই। ইংরেজের middleman হইয়া, ইহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া যে বৃহত্তর-বঙ্গের প্রতিষ্ঠা, তাহার কোনও স্থায়ী ফল দেখা যাইতেছে না। উৎকট বাঙ্গালীয়ানা লইয়া বাঙ্গালী ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্য যে অস্ত্র, আত্মপ্রসারের জন্য সে অস্ত্র অনেক সময়ে মোটেই উপযোগী হয় না। সমগ্র ভারতের একাত্মতা-বোধ ভিন্ন আন্তঃপ্রাদেশিক ঐক্য হওয়া সম্ভবপর নহে। এক প্রদেশ কর্তৃক অন্য প্রদেশের উপরে, আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়া, অন্য বিষয়ে প্রভাব চলিতে পারে না; অর্থনৈতিক প্রভাব ও চাপ কেহ সহ্য করিবে না। আমাদের প্রাণপণে গুজরাট, মারওয়াড়, পাঞ্জাব

প্রভৃতি প্রদেশের অর্থনৈতিক exploitation বা শোষণের প্রতিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু ঐ সব প্রদেশ হইতে যদি কোনও মানসিক বা আধ্যাত্মিক বস্তু আমরা পাই, তাহা সাদরে গ্রহণ করিব। সমগ্র ভারত এক, ভারতের অখণ্ড ও অচ্ছেদ্য একত্ব—এই বোধ আমাদের ভারতীয় সাংস্কৃতিতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। ব্রিটিশ আমলে নূতন যুগে এই কথা-ই বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে প্রথম নূতন করিয়া শুনাইয়াছে—ইহাতেই তাহার প্রধান গৌরব। বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ ভূদেব রবীন্দ্রনাথের বাণী, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ভারতের একতাবোধকে দৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছিল; তাই ১৯০৪ হইতে ১৯২০ পর্যান্ত বাঙ্গালীর মানসিক ও আদর্শগত নেতৃত্ব সমগ্র ভারত এক রকম মানিয়া-ই লইয়াছিল। অবশ্য বাঙ্গালীর কল্পনা ও চিন্তাশক্তি এবং শিক্ষা-বিষয়ে যোগ্যতা ইহার মূলে ছিল। এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেমন অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির বৃদ্ধি হইতেছে, এদিকে তেমনি ঘরে বাঙ্গালা দেশে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া আমরা শক্তিহীন হইতেছি। ঘর সামলাইয়া লইলেই বাহির আপনা হইতেই নিজেকে সামলাইবে। জ্ঞানে, চারিত্র্যে, কর্মশীলতায় বাঙ্গালী আবার যখন বড়ো হইবে, এবং উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত যথার্থ মানুষের সংখ্যা বাঙ্গালীদের মধ্যে যখন বেশি করিয়া দেখা দিবে, তখন-ই বাঙ্গালী যেখানে যাইবে সেখানেই নূতন ভাবে এক গৌরবময় "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে॥

উদয়ন

ভাদ্র ১৩৪১

কলিকাতা, তালতলা সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখার সভাপতির অভিভাষণ (অংশতঃ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)।

পশ্চিম-আফ্রিকার সংস্কৃতি ও ধর্ম

১৯১৯ সালে ছাত্র-রূপে গুরুকুল-বাস করিবার জন্য লণ্ডনে উপস্থিত হই। বাসা ঠিক করিয়া লইয়া বসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রথমেই লণ্ডনের সুবিখ্যাত সংগ্রহ-শালা ব্রিটিশ-মিউজিয়ম দেখিতে যাই। এই অপূর্ব সংগ্রহের মধ্যে, অপ্রত্যাশিত-ভাবে একটি অনপেক্ষিত বস্তু-সম্ভারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে—সেটি হইতেছে, পশ্চিম-আফ্রিকায় নিগ্রোদের শিল্প। আর পাঁচজনের মতো আমিও ভাবিতাম, আফ্রিকার নিগ্রোরা জঙ্গলী বর্বর জাতির মানুষ, তাহাদের মধ্যে সভ্য জাতির মতো উচ্চ অঙ্গের চিন্তা ও ধর্ম এবং সভ্যতা ও শিল্প কিছু-ই নাই। কিন্তু পশ্চিম-আফ্রিকার Nigeria নাইগিরিয়া-দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের Benin বেনিন্-জনপদের নিগ্রোদের কৃতি, চারি-পাঁচ শত বৎসরের পূর্বেকার তৈয়ারী ধাতুশিল্প—ব্রঞ্জের নৃমুণ্ড, মূর্তি ও মূর্তি-সমূহ, ব্রঞ্জের পাটায় ঢালা ও খোদিত মানব ও পশু-পক্ষীর চিত্র, এবং হাতীর-দাঁতের মূর্তি, কাঠের কাজ ও অন্য কারুশিল্প—এ-সব দেখিয়া চোখ খুলিয়া গেল, একটা নূতন রাজ্যে যেন আমি প্রবেশ করিলাম। আফ্রিকার সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম-আফ্রিকার সম্বন্ধে, কৌতূহল জাগরিত হইল; হাতের কাছে—ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আর অন্যত্র—এ বিষয়ে যাহা পাইলাম পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে আফ্রিকার নানা আদিম জাতি ও তাহাদের ধর্ম, সভ্যতা ও শিল্প সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে সমর্থ হইলাম। দেখিলাম, রসগ্রাহী ইউরোপীয় শিল্পী এবং কলাবিৎ পণ্ডিতের চোখে আফ্রিকার আদিম-প্রকৃতিক শিল্প-চেষ্টার সার্থকতা এবং সৌন্দর্য্য ধরা দিয়াছে। আফ্রিকার বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে তাহাদের জীবনকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম, সভ্যতা ও শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য শিব ও সুন্দরের যে লক্ষণীয় প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা বিশ্ব-মানবের নিকট গ্রহণযোগ্য। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আফ্রিকার আদিম জাতির লোকেরা যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে, অন্য পাঁচটি জাতির সভ্যতায় যেমন, তেমনি ইহাতেও লজ্জা ও ঘৃণার জিনিস কিছু-কিছু থাকিলেও, গৌরব ও আদরের বস্তু যথেষ্ট আছে। সব-চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, আফ্রিকার আদিম জাতির লোকেদেরও এ বিষয়ে চোখ ফুটিতেছে; তাহারা এখন সব বিষয়ে নিজেদের পশ্চাৎপদ, অসহায়, ও ইউরোপের প্রসাদ-পুষ্ট বলিয়া মনে করিতে চাহিতেছে না; অবশ্য

ইউরোপের হৃদয়বান্ উদার-প্রকৃতিক সত্য-কাম মনের প্রভাবেই তাহাদের চোখের পটী খুলিয়া যাইতেছে—ইউরোপের মিশনারিদের দ্বারা আনীত খ্রীষ্টানি সভ্যতা আর ইউরোপের যন্ত্র-শক্তির প্রভুত্বের মোহ কাটাইয়া এখন দরদের সহিত, অন্তর্মুখী দৃষ্টি দিয়া, নিজেদের সংস্কৃতির বিচার করিয়া দেখিতে শিখিতেছে—তাহাদের সব বিষয়ে (এমন কি, নিজেদের দেশোপযোগী জীবন-যাত্রা সম্বন্ধেও) যে দীনতাবোধ যে হীনতা-ভাব ছিল, তাহা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে সমর্থ হইতেছে। ইহা কেবল আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের পক্ষে নহে, উপরন্তু সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে একটি আনন্দের সংবাদ।

১৯১৯ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ইংলাণ্ডে অবস্থান করি, তখন আফ্রিকার শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হই। ঐ দুই বৎসরের মধ্যে পশ্চিম-আফ্রিকার নাইগিরিয়া-দেশের Lagos লেগস্-শহরের কতকগুলি ইংলাণ্ড-প্রবাসী নিগ্রো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাহাতে একটু অন্তরঙ্গ ভাবে এই অঞ্চলের নিগ্রোদের আচার-ব্যবহার ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে কতকটা ওয়াকিফ-হাল হইতে পারি—এই পরিচয়ের ফলে ইঁহাদের সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ একটা শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হয়।

সমগ্র আফ্রিকায় মোটের উপরে সাতটি বিভিন্ন ও বিশিষ্ট জাতির লোক বাস করে। ইহারা হইতেছে [১] Semitic শেমীয়, [২] Hamitic হামীয়, [৩] Bushman বুশ্‌মান্, [৪] Hottentot হটেণ্টট, [৫] Bantu-বাণ্টু নিগ্রো, [৬] Sudanic সূদানী বা বিশুদ্ধ-নিগ্রো ও [৭] Pygmy বামন-নিগ্রো। এই কয় জাতির মধ্যে [১] শেমীয় ও [২] হামীয় জাতিদ্বয় ভাষায় ও সম্ভবতঃ রক্তে পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত। হামীয় জাতি আফ্রিকার সমস্ত উত্তরখণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। মিসরের সুসভ্য প্রাচীন অধিবাসীরা হামীয় ছিল। আলজিয়র্স, ত্যুনিস ও মোরোক্কোর Berber বের্বের জাতির লোকেরা, সাহারা-মরুর Tuareg তুআরেগ জাতি, পূর্ব-আফ্রিকার Somali ও Galla সোমালি ও গাল্লা জাতি—ইহারাও হামীয়। হামীয়েরা শ্বেতকায় মানবের শ্রেণীতে পড়ে। এদিকে, আরব-দেশ, পালেস্তীন ও সিরিয়া, এবং বাবিলন ও ও আসিরিয়া শেমীয়দের দেশ। পালেস্তীন ও সিরিয়া এবং পরে আরব হইতে শেমীয় জাতির লোকেরা উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় গিয়া নিজেদের জাতি হামীয়দের মধ্যে উপনিবিষ্ট হয়, এবং হামীয়দিগকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত

করে। বিশেষতঃ মুসলমান আরবেরা তো মুসলমান ধর্ম ও আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা করিয়া, মিসর হইতে মোরোক্কো পর্যন্ত সমগ্র হামীয় দেশকে এক নূতন আরব-দেশ বানাইয়া তুলিয়াছে। আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোদের সঙ্গে, জাতি ভাষা ও সংস্কৃতিতে, শ্বেতকায় সুসভ্য শেমীয়-হামীয়দের কোনও সম্পর্ক নাই। মুসলমান আরব ও বের্বের প্রভৃতি সভ্য সুসংহত সাত্মাভিমান জাতির লোক, ইহারা নিজেদের রক্ষা করিতে জানে, কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোর মতো ইহারা কখনও অসহায় ছিল না। আমি এই শেমীয় ও হামীয়দের কথা বলিব না। হামীয়দের সঙ্গে দক্ষিণ সাহারায়—পশ্চিম-সূদানে—বিশুদ্ধ নিগ্রোদের মিশ্রণের ফলে, Hausa হাউসা, Fulani, Fulbe বা Peul ফুলানি, ফুল্‌বে বা প্যল্‌ প্রভৃতি কতকগুলি সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে; তাহাদের কথাও বলিব না। [৩] বুশ্‌মান ও [৪] হটেণ্টট জাতির লোকেরা হামীয় ও শেমীয়দের মতো পরস্পরের জ্ঞাতি; ইহারা দক্ষিণ-আফ্রিকায় বাস করে, ইহাদের সভ্যতা অতি নিম্ন স্তরের; ইহাদের কথাও উপস্থিত প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। মৌলিক জাতি হিসাবে ইহারা কৃষ্ণকায় নিগ্রো হইতে একেবারে পৃথক্‌। [৭] Pygmy বা বামন-জাতীয় লোকেরা এক প্রকার খর্বকায় নিগ্রো, ইহাদের সভ্যতা বলিতে কিছু-ই নাই, জাতিতে ও সংস্কৃতিতে ইহারা বোধ-হয় পৃথিবীর সর্ব-মানবের মধ্যে সব-চেয়ে নীচু অবস্থায় বিদ্যমান; Congo কঙ্গো-দেশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ইহাদের কিছু-কিছু পাওয়া যায়। ইহারা অন্য নিগ্রোদের থেকে পৃথক্‌ জাতি। খাস নিগ্রো বা কাফরী জাতি দুইটি বড়ো শ্রেণীতে পড়ে—মধ্য- ও দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিবাসী বাণ্টু-নিগ্রো, এবং পশ্চিম-আফ্রিকা ও উত্তর-মধ্য-আফ্রিকার অধিবাসী সূদানী বা শুদ্ধ-নিগ্রো। আকৃতিতে, প্রকৃতিতে এবং সংস্কৃতিতে ইহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও, ভাষায় এবং সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়।

পশ্চিম-আফ্রিকার শুদ্ধ-নিগ্রোরাই আফ্রিকার নিগ্রো-জগতের সব-চেয়ে বিশিষ্ট প্রতিনিধি। এই শুদ্ধ-নিগ্রোরা আবার ভাষা হিসাবে অনেকগুলি উপ-জাতিতে পড়ে। পশ্চিম-আফ্রিকার শুদ্ধ-নিগ্রো উপজাতি-সমূহের মধ্যে এই কয়টি প্রধান—নাইগিরিয়ার Nupe নূপে, Ibo ইবো ও Yoruba য়োরুবা; Gold Coast বা 'স্বর্ণোপকূল' অঞ্চলের এখনকার Ghana গানা রাষ্ট্রের Chi বা Twi চী বা ত্বী জাতি – এই জাতির অন্তর্গত Ashanti আশাণ্টি বা Fanti ফাণ্টি, Ewhe এহ্বে প্রভৃতি কতকগুলি উপশাখা; এবং ফরাসীদের অধিকৃত

পশ্চিম-আফ্রিকার Baule বাউলে, Mandingo মান্দিঙ্গো, Mossi মোস্‌সি, Songoi সোঙ্গোই, Senufo সেনুফো, Wolof উওলোফ প্রভৃতি কতকগুলি উপজাতি। Yoruba য়োরুবা এবং Ashanti আশান্টি জাতির লোকেরা দৈহিক শক্তিতে, বুদ্ধিতে ও কর্ম-চেষ্টায় সমগ্র পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের অগ্রণী ; ইহারা, এবং পূর্ব-আফ্রিকার Uganda উগাণ্ডা অঞ্চলের বাণ্টু-নিগ্রো-জাতীয় Baganda বাগাণ্ডারা, আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো-জাতির মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত,—বিদ্যা, বুদ্ধি ও সংহতি-শক্তিতে ইউরোপীয়দের সঙ্গেও পাল্লা দিতে ইহারাই সমর্থ হইয়াছে।

আমার সঙ্গে যে নিগ্রো ভদ্রলোকদের আলাপ হয়, তাঁহারা সকলেই য়োরুবা জাতির। (এখানে একটা কথা জানাইয়া রাখি ; ইংরেজি-শিক্ষিত নিগ্রোরা নিজেদের Black Man 'কালো মানুষ' বলিয়া উল্লেখ করিতে লজ্জা পান না, কিন্তু 'নিগ্রো' Negro শব্দের বিকৃত রূপ Nigger 'নিগার' ইংরেজিতে গালিব্যঞ্জক হওয়ায়, ইঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে Negro 'নিগ্রো' শব্দ আর ব্যবহার করিতে চাহেন না,—যদিও এই শব্দগুলির মূল হইতেছে লাতীন ভাষার Niger 'নিগের' শব্দ, যাহার অর্থ 'কালো' অথবা 'কালো মানুষ'—African 'আফ্রিকান' শব্দ-ই ইঁহারা এখন পছন্দ করেন, এবং সহানুভূতিসম্পন্ন ইউরোপীয়গণ-ও এখন African শব্দ-ই ব্যবহার করেন।) ইঁহাদের কাছে শুনিলাম যে, নাইগিরিয়া দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ য়োরুবাদের দ্বারা অধ্যুষিত। য়োরুবারা সংখ্যায় ৩০ লাখের উপর। ইহাদের মধ্যে ১০ লাখ খ্রীষ্টান, ১০ লাখ মুসলমান, ও ১০ লাখ Pagan অর্থাৎ যাহারা তাহাদের পুরাতন স্বভাবজ ধর্ম পালন করিয়া থাকে। এখন (১৯৬৫ সালে) য়োরুবাদের সংখ্যা ৫০ লাখেরও অধিক হইবে। ধর্মের জন্য ইহাদের মধ্যে আত্মকলহ নাই। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মদ্বয় দ্বারা আক্রান্ত হইলেও, য়োরুবা ধর্ম এখনও বেশ জোরের সঙ্গে চলিতেছে। এই ধর্মের দেবতারা সাধারণ মন্দিরে ও তীর্থে এবং গৃহস্থের গৃহে যথারীতি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। য়োরুবারা চাষ-বাস করে, যে অঞ্চলে ইহারা বাস করে সে অঞ্চলটা খুব ঘন-বসতি ; নিজের জমিতে নারিকেল, তাল-জাতীয় এক রকম গাছের বীজের তেল, চীন-বাদাম, কোকো, তুলা, মেহগনি কাঠ, এই সব উৎপন্ন করিয়া ও রপ্তানি করিয়া এখানকার চাষী আর ছোটো জমিদারেরা বেশ সমৃদ্ধ। য়োরুবা-দেশে অনেকগুলি বেশ বড়ো-বড়ো শহর আছে, যেমন Lagos লেগস্ (দেড়-লাখের উপর অধিবাসী), Ibadan ইবাদাঁ (প্রায় আড়াই-লাখ অধিবাসী), Ogbomosho

ওগ্বোমোশো (নব্বই হাজার), Ilorin ইলোরিঁ (পঁচাশী হাজার), Abeokuta আবেওকুটা ও Iwo ইবো (প্রত্যেকটি পঞ্চান্ন হাজার করিয়া); এ ছাড়া, পঞ্চাশ বা তিরিশ হাজার লোকের বাস অন্য শহরও কতকগুলি আছে। এই সব শহরে ইহাদের রাজা আছে, প্রাচীন পদ্ধতিতে নিজেরাই শহরের সব কাজ চালায়—আধুনিক, ইউরোপীয় রীতি কার্য্যকর মনে করিলে গ্রহণেও বাধা নাই। Ife ইফে-শহর ইহাদের ধর্মের কেন্দ্র। য়োরুবা দেশের পশ্চিমে Dahomey দাহোমে, আর Togo তোগো, আর তাহারও পশ্চিমে Gold Coast 'স্বর্ণোপকূল', (এখনকার স্বাধীন রাষ্ট্র Ghana গানা), যেখানে বিখ্যাত Ashanti আশান্টি নিগ্রো জাতির বাস; এই-সব দেশেরও বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা।

শ্রীযুক্ত Nathaniel Akinremi Fadipe (বা Fadikpe) নাথানিয়েল্ আকিঁর‍্যামি ফাডিপে (বা ফাডিক্‌পে)—এই নামের একটি য়োরুবা ছাত্রের সঙ্গে তখন (১৯২০ সালে) লণ্ডনে আলাপ হইয়াছিল। পরে ১৯৩৮ সালে আবার ইংলাণ্ডে ইহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। ফাডিপে-কে তাহার নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করি—তাহার পুরা নাম তখন জানা হয় নাই। সে বলে যে Fadikpe নামটি Ifa-di-kpe এই তিনটি শব্দের সমবায়ে গঠিত, ইহার অর্থ, Ifa 'ইফা'-দেবতার দান, 'ইফা-দত্ত'। আমি তখন তাহাদের প্রাচীন ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করি। ফাডিপে নিজে ছিল খ্রীষ্টান, কিন্তু দেখিলাম, তাহাদের প্রাচীন ধর্ম সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও জুগুপ্সার বা ঘৃণার ভাব নাই। Ifa ইফা দেবতার সম্বন্ধে বলিল যে, এই দেবতার পুরোহিতেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, Ife ইফে-শহর ইহার পূজার কেন্দ্র. ষোলটি সুপারি-জাতীয় ফল (ইহাকে Kola-nut 'কোলা-ফল' বলে) লইয়া পুরোহিতেরা ষোল বার গোল বা চৌকা আকারের একখানি কাঠের বারকোষে ফেলেন, কয়টি ফল হাতে রহিল কয়টি পড়িল, তাহা ধরিয়া বারকোষের উপর ষোল্ বার দাগ কাটিয়া হিসাব করিয়া তাঁহারা দেবতার আদেশ বা অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। ফাডিপের কথা শুনিয়া মনে হইল, খ্রীষ্টান হইলেও এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যে তাহার আস্থা আছে। তবে সে আমাকে খোলসা করিয়া বলিল, খ্রীষ্টান ঘরের ছেলে, প্রাচীন Pagan বা স্বভাবজ ধর্মের খবর সে ঠিক-মতো সব জানে না; তবে তাহার জাতির এক-তৃতীয়াংশ এখনও এই ধর্মকে জীবন্ত রাখিয়াছে। পরে একজন মুসলমান য়োরুবা রাজার সঙ্গে দেখা হয়, ইনি লণ্ডনে তাঁহার রাজ্য বা জমিদারি সংক্রান্ত মোকদ্দমার জন্য আসিয়াছিলেন। ইনি ইংরেজি জানিতেন না, তবে ইঁহার সেক্রেটারি Herbert Macaulay

হর্বর্ট্ মেকওলে নামে একটি য়োরুবা ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত মেকওলের নামটি ব্রিটিশ হইলেও, ইনি খাঁটি আফ্রিকান, এবং জাতীয়তাবাদী; ইনি য়োরুবাদের নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য বিশেষ গৌরব বোধ করেন। শ্রীযুক্ত মেকওলে বিলাতে পাস-করা ইঞ্জিনীয়ার বা পূর্তকার ছিলেন, এবং স্বদেশের একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ইঁহার কাছে য়োরুবা ধর্ম ও সমাজের রীতি-নীতির খবর কিছু-কিছু পাই। জনৈক য়োরুবা পাদ্রি য়োরুবা ভাষায় (য়োরুবাদের ভাষায় নিজস্ব লিপি ছিল না, ইউরোপীয় সংস্পর্শ ও প্রভাবের ফলে রোমান লিপি এখন য়োরুবাদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে) য়োরুবা ধর্ম সম্বন্ধে একখানি বই লিখেন, ইহার ইংরেজি অনুবাদ হইয়াছে, এই ইংরেজি বই ইঁহার কাছে ছিল, ইনি আমায় উহা পড়িতে দেন। বইখানি পড়িয়া খুশী হই, কারণ ইহাতে মিশনারি-সুলভ গোঁড়ামি ছিল না, গ্রন্থকার কতকটা দরদের সঙ্গে তাঁহার জাতির ধর্ম, পিতৃপুরুষের ধর্ম বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ সহানুভূতিশীলতা বেশ ভালো লাগিল। য়োরুবা খ্রীষ্টান পাদ্রি, পূর্ব-পুরুষ যে খ্রীষ্টান বা য়িহুদী ছিল না, তজ্জন্য লজ্জিত নহেন; গোড়াতেই তিনি বলিয়াছেন যে, সুসভ্য ইউরোপের লোকেরাও এক সময়ে Pagan ছিল, য়োরুবাদের ধর্মের মতো ধর্ম-ই তাহারা পালন করিত। য়োরুবা-দেশে অনেক সামন্ত রাজা আছেন, অন্য শিক্ষিত ভদ্রলোক আছেন, ইঁহাদের কেহ-কেহ আবার বিলাতে শিক্ষিত, কিন্তু ইঁহারা স্বধর্মের জন্য লজ্জিত নহেন, বরং কেহ-কেহ সেই ধর্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টিত। এই গৌরব-বোধ এবং রক্ষণশীলতা এই বিশিষ্ট আফ্রিকার জনগণের মানসিক শক্তিরই পরিচায়ক।

য়োরুবাদের জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশী পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য জনগণের মধ্যেও এই ভাব এখন দেখা যাইতেছে—বিশেষ করিয়া স্বর্ণোপকূলের (বা গানার) Ashanti আশান্টি জাতির মধ্যে। Kumasi কুমাসি ও Accra আক্রা নগরদ্বয় আশান্টি জাতির রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। আক্রাতে সম্পৃক্ত Gan গাঁ জাতির লোকও বাস করে। মুসলমান এবং প্রাচীনধর্মী য়োরুবারা এবং বহু খ্রীষ্টান য়োরুবা ইউরোপীয় পোষাক পরে না, নিজেদের উষ্ণদেশোপযোগী ঢিলা জামা ও ইজার এবং গায়ের চাদর ব্যবহার করে; আশান্টিরাও তেমনি রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া জন-সাধারণ পর্য্যন্ত সকলে পায়ে সাবেক চালের নিগ্রো চপ্পল বা চাপ্লি-জুতা পরে, ও গায়ে নিজেদের জাতীয় পোষাক, রঙ্গীন

ছাপা কাপড়ের চাদর, জড়াইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার কোনও শহরে—খুব সম্ভব চিকাগো-তে—একটি বিশ্বধর্ম-মহাসভা হয়; ১৮৯৩ সালের সভা, যেখানে পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজন-সমক্ষে হিন্দু আদর্শের অন্যতম প্রধান কথা, ধর্ম-বিষয়ে উদারতার বাণীর প্রচার করেন, তাহার মতো অত বিরাট্ ব্যাপার না হইলেও, এই সভায় নানা জাতির ও নানা ধর্মের প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হন। এই প্রতিনিধিদের নামের তালিকা কোথায় দেখিয়াছিলাম—দুঃখের বিষয় তাহা হইতে আবশ্যক তথ্যটুকু টুকিয়া লওয়া হয় নাই—এই তালিকায় একজন আশান্টি ভদ্রলোকের নাম দেখিয়াছিলাম; ইনি কুমাসি নগর হইতে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক-ধর্ম-সম্মেলনে অন্য পাঁচটা ধর্মের নেতাদের সমক্ষে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাঁহার আশান্টি-জাতির মধ্যে উদ্ভূত Paganism বা স্বভাবজ ধর্মকে তিনি আধুনিক যুগের সভ্য মানুষের উপযোগী বলিয়া মনে করেন;—এই বোধের বশবর্তী হইয়া তিনি নিজ ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। এই সংবাদের পিছনে যে অখ্যাত অবজ্ঞাত অত্যাচারিত আফ্রিকান্ জাতির পুনরুজ্জীবনের সুসমাচারের মতো কতখানি গুরুত্ব বিদ্যমান, সহৃদয় মানব-প্রেমী মাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিবেন। আশান্টি ধর্ম, তাহার প্রতিষ্ঠা কোন্ দার্শনিক বিচার এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপরে, তাহা আমরা জানি না।* জগৎ-সমক্ষে এতাবৎ কেবল ইহা-ই ঘোষিত হইয়াছে যে, এই ধর্মের পরিপোষক নিগ্রোরা নরবলি দিত, এবং নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ইহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীরই জীব ছিল। নরবলির কথা অস্বীকৃত হয় নাই এবং হইবারও নহে; ধর্মের নামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নরবলি বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখনও পরোক্ষভাবে আছে। যেমন, রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে Inquisition বা বিধর্মীদের দমনের নামে জীবন্ত মানুষকে পোড়াইয়া মারা অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; যেমন, ধর্মের নামে বিধর্মীদের বধ বা সর্বনাশ এখনও চলিতেছে। কিন্তু ইহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে এবং জাগ্রৎ বা সুপ্ত মানসিক শক্তি সম্বন্ধে, ইউরোপীয় মিশনারি ও অন্য ব্যক্তির উক্তি বহুশঃ একদেশ-দর্শী, স্বার্থান্ধ এবং মিথ্যা।

* পরে এসম্বন্ধে নূতন তথ্য যাহা পাইয়াছি আমার ইংরেজি বই **Africanism—the African Personality** (১৯৬০, প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা)-তে নিবদ্ধ একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

য়োরুবাদের নৈতিক জীবন সম্বন্ধে একটি কথা বলিব—ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে অসহায় ও পশ্চাৎপদ জাতির মানুষের সম্বন্ধে কত অনুচিত ধারণা প্রচারিত হয়। হর্বর্ট্ মেকওলে নামে যে য়োরুবা ভদ্রলোকটির উল্লেখ করিয়াছি, তিনি একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমায় বলিয়াছিলেন :—

"দেখুন মিস্টার চাটর্জি, আমাদের কালো মানুষ, জঙ্গলী, অসভ্য, বর্বর ব'লে ইউরোপীয় লোকেরা গা'ল দেয়, তারা আমাদের 'সভ্য' কর্‌বার জন্য, 'উন্নত' কর্‌বার জন্য পাদ্রি পাঠায়। কিন্তু সত্য কথা এই যে, ওরা এসে আমাদের সাবেক চালের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবন আর নৈতিক জীবন সব বরবাদ ক'রে দেয়। সেকেলে' আফ্রিকান্‌রা বাপ-পিতামহের কালের যে জীবন পালন ক'রে আস্‌ছিল, সেটা সভ্যতায় উন্নত না হ'তে পারে, কিন্তু তার মধ্যে চুরির আর মিথ্যা-কথা বলার আর সামাজিক অন্যায়ের স্থান ছিল না। এখনও সাবেক সত্যবাদিতা আর নীতিনিষ্ঠতা থেকে আমাদের পাড়াগাঁ অঞ্চলের লোকে ভ্রষ্ট হয়নি। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামকে ইংরিজিতে bush বলে। দু-ধারে bush অর্থাৎ জঙ্গল, ক্ষেত, গ্রাম—তার মাঝখান দিয়ে বড়ো সড়ক গিয়েছে। রাস্তায় জলের কষ্ট, কুয়োর রেওয়াজ কম, water-hole অর্থাৎ ডোবা বা পুখুরও কম। দোকান-হাট, হোটেল, সরাইয়ের পাট বড়ো নেই। ভোরের বেলা গাঁয়ের স্ত্রীলোক মাথায় এক কলসি জল আর পিঠে এক কাঁদি না'রকল আর এক কাঁদি কলা নিয়ে নিজের গ্রাম থেকে দু-পাঁচ মাইল হেঁটে বড়ো সড়কের ধারে একটা বড়ো গাছের তলায় সব রেখে দিলে। জলের কলসির মাথায় একটি না'রকল মালা, তাতে তিনটে ঢিল; কলার কাঁদির উপরে দুটো ঢিল, আর না'রকলের কাঁদির গায়ে পাঁচটা কি সাতটা ঢিল—এই সব সাজিয়ে' রেখে দিলে। দিয়ে বাড়ি চ'লে গেল। ঢিল রাখার মানে, যদি রাহী লোকের তেষ্টা পায়, তবে গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডায় জলের কলসি দেখে তা থেকে জল কিনে খেতে পার্‌বে—এক মালা জলের দাম তিন কড়া—আমাদের দেশে এখনও কড়ি চলে; খাবারের দরকার হ'লে, দু কড়া দিয়ে একটা কলা, পাঁচ বা সাত কড়া দিয়ে একটা না'রকল নিতে পার্‌বে। সন্ধ্যের দিকে জল আর ফলের মালিক স্ত্রীলোকটি গ্রাম থেকে আস্‌বে, হিসেব ক'রে দেখ্‌বে, জল এতটা নেই, তার বদলে জলের কলসির পাশে এতগুলি কড়ি; তেমনি না'রকল আর কলা পথ-চল্‌তি লোকেরা

যা নিয়েছে, তার বদলে হিসেব ক'রে কড়ি দিয়ে গিয়েছে। জল আর ফলের বদলে ঠিক হিসাব-মতো কড়ি বুঝে পেয়ে, স্ত্রীলোকটি তার বাকী জিনিস নিয়ে খুশী মনে ঘরে ফিরে যাবে। লোকচক্ষুর অগোচরে এই রকম বিকি-কিনিতে কেউ জুয়াচুরি করে না—এখনও আমাদের এতটা নৈতিক অবনতি হয়নি। কিন্তু 'সভ্যতা'-র ছোঁয়াচ লেগে, নৈতিক অবনতির আরম্ভ হ'য়েছে।" শ্রীযুক্ত মেকওলে আরও বলিলেন—"দেখুন, আমাদের সমাজের বাঁধন ছিল, জন-মত ছিল; অন্যায় অনুচিত যা-খুশী তা লোকে ক'র্‌তে পার্‌ত না। এখন তা পারে, কারণ ইংরেজের আইনে বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু আগে good form বা স্বরীতি অনেক ছিল, তাতে ক'রে আমাদের ভালোই হ'ত। এই ধরুন না, বিয়ের ব্যাপারে। কোনও উৎসবে, অথবা হাটের দিন হাটে, বিয়ের-বয়সের ছোক্‌রা একটি মেয়েকে দেখ্‌লে। তাকে বিয়ে কর্‌বার তার ইচ্ছে হ'ল। সে কোনও বন্ধুকে জানালে। বন্ধু গিয়ে ঠাকুরদাদা বা ঠাকুরমা-সম্পর্কের কোনও আত্মীয়কে ব'ল্‌লে। তখন, মেয়ের ঘর যদি ভালো হয়, তা-হ'লে বাপ মা সম্বন্ধের জন্য কথা পাড়্‌লে ঘটক দিয়ে। তার পরে পাত্র-পক্ষ আর পাত্রী-পক্ষ, উভয় পক্ষ থেকে গোপনে অনুসন্ধান চ'ল্‌ল—অপর পক্ষের বাড়ির লোকেরা কেমন, তাদের অবস্থা কেমন, আর পাত্র বা পাত্রীর ঊর্ধ্বতন কোনও পুরুষে এই তিনটি রোগ কারো কখনো হ'য়েছিল কিনা—উপদংশ, কুষ্ঠ আর উন্মাদ রোগ। এই অনুসন্ধানে দু-পক্ষ উত্‌রে গেলে, তবে ভদ্র আফ্রিকান ঘরে বিয়ের কথা পাকা হ'ত।

যাহাদের ব্যক্তি-গত আর সমাজগত নৈতিক ধর্ম এই রকম ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, বড়ো-বড়ো ইমারত খাড়া করিতে বা সাহিত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে দর্শনে উন্নত হইতে না পারিলেও, তাহাদের যে একটা উঁচু দরের সংস্কৃতি ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কোনও জাতির মধ্যে উদ্ভূত ধর্ম, সেই জাতির মৌলিক প্রকৃতি, তাহার আধিভৌতিক পারিপার্শ্বিক, তাহার আজীবিকা ও জীবন-যাত্রার উপায়, প্রচুর অবসরের ফল-স্বরূপ তাহার চিন্তা, তাহার শিক্ষা, এবং অন্য চিন্তাশীল বা সুসভ্য জাতির সহিত সংস্পর্শ ও সংস্পর্শের জন্য বাহির হইতে আগত প্রভাব—এই-সবের উপরে নির্ভর করে। পশ্চিম-আফ্রিকার দক্ষিণে সাগরোপকূল অঞ্চলের নিগ্রোদের সঙ্গে এখন হইতে সাড়ে-চারি শত কি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে অন্য কোনও সুসভ্য জাতির সংস্পর্শ ঘটে নাই—ঐ সময়ে পোর্তুগীসদের সহিত

বাণিজ্য-সূত্রে ইহাদের প্রথম সংযোগ ঘটে। শিল্পের ক্ষেত্রে পোর্তুগীস প্রভাব সামান্য কিছুটা হয়-তো পড়ে, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কতটুকু পড়িয়াছিল তাহা বিবেচ্য ; অনুমান হয়, বেশি পড়ে নাই। আরব ও বের্বের, তুআরেগ প্রমুখ হামীয় মুসলমানদের আগমন ইহাদের মধ্যে ঘটে আরও পূর্বে, কিন্তু সে প্রভাব প্রথমটায় উত্তর অঞ্চলের নিগ্রোদের মধ্যে Niger নাইগার নদীর দুই ধারে নিবদ্ধ ছিল। ইহার পূর্বেই নিগ্রোদের ধর্মের লক্ষণীয় সমীক্ষা ও অনুষ্ঠান, দেবতাবাদ ও পূজারীতি নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের ধর্ম বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই অঞ্চলের আফ্রিকার ধর্মকে আফ্রিকান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আফ্রিকান জাতির প্রৌঢ় চিন্তা ও চেষ্টার ফল বলিয়াই ধরিতে হয়। ইবো, নূপে, য়োরুবা, এম্বে, আশান্টি, বাউলে, মান্দিঙ্গো প্রভৃতি পশ্চিম-আফ্রিকার জাতিগুলির মধ্যে যে-সব ধর্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান দেখা যায়, ভাষা ও উপজাতি হিসাবে সেগুলির মধ্যে কিছু-কিছু অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলে, এক-ই প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে সঞ্জাত বলিয়া, ইহাদের ধর্ম-বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সহজেই নির্ধারিত করা যায়।

তুলনামূলক আলোচনা করিব না, এ বিষয়ের অধিকারী আমি নই,—কেবল য়োরুবা জাতির ধর্মের স্থূল বা প্রধান কথাগুলি বলিবার চেষ্টা করিব। য়োরুবাদের ধর্ম লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আলোচনা হইয়াছে, পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য কোনও জাতির বা জনগণের ধর্ম লইয়া অত আলোচনা হয় নাই। য়োরুবারাও নিজেদের ভাষায় এ সম্বন্ধে বই লিখেছে। Colonel A. B. Ellis, R. E. Dennett, Leo Forbenius, Stephen S. Farrow —ইহাদের বই হইতে অনেক তথ্য পাইয়াছি। আফ্রিকার শিল্প বিষয়ে লিখিত বই হইতেও কিছু-কিছু পারিপার্শ্বিকের খবর মিলিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, Geoffrey Parrinder, J. Olumide Lucas, E. Bolaji Idowu, W. R. Bascom—ইহাদের বই ও প্রবন্ধ আছে। য়োরুবা ধর্মকে পশ্চিম-আফ্রিকার জনগণের ধর্মের প্রতিভূ-স্থানীয় বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়।

•

য়োরুবাদের মধ্যে ধর্মের প্রধান একটি অঙ্গ, দেবতাবাদ ও দেবকাহিনী, খুব লক্ষণীয়-রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। মনোজ্ঞ দেবকাহিনী না হইলে, সাধারণ্যে ধর্মের প্রচার বা প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু দেব-কাহিনী-রচনার উপযোগী কল্পনা ও রসবোধ সকল জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মিসরীয়, মেসোপোতামীয়,

ভারতীয়, গ্রীক, জর্মানিক, কেল্টিক—এই কয়টি জাতি এদিকে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহা সর্বত্র মেলে না। সমস্ত আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে—হামীয়-শ্রেণীর মিসরীয়দের পরেই—য়োরুবা জাতির মানুষেরা এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখের যোগ্য। ইহাদের দেবজগৎ কতকগুলি ব্যক্তিত্বশালী দেব ও দেবীর দ্বারা অধ্যুষিত; জগতের বা বিশ্বমানবের কল্পিত দেবলোকে, Pantheon অর্থাৎ 'সুধর্মা'-সভায়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া য়োরুবা দেবতারাও স্থান পাইবার যোগ্য।

এই-সব দেব-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া য়োরুবাদের ও তাহাদের সংপৃক্ত অন্য জাতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট শিল্পকলার সৃষ্টি হইয়াছে—কাষ্ঠ, ধাতু ও মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি ও পাত্রাদিতে এই শিল্পকলা দৃষ্ট হয়। আফ্রিকান শিল্প-জগতে ইহার স্থান প্রথম শ্রেণীতে, এবং বিশ্বমানবের শিল্পের মধ্যেও সৌন্দর্য্য-গুণে ও সার্থকতায় ইহার স্বকীয় বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত হইয়াছে।

য়িহুদী ধর্ম ও তৎসংপৃক্ত খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম যাঁহারা মানেন, তাঁহাদের কেহ-কেহ এই তিন ধর্মের বাহিরের লোকেদের সম্বন্ধে নানা তুচ্ছতাজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহার করেন—যেন ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ তাঁহাদেরই জ্ঞাত, আর কেহ জানে না, জানিতে পারে না। এইরূপ মনোভাবের পরিচায়ক একটি ইউরোপীয় শব্দ হইতেছে Pagan, Paganism: যাহারা বাইবেল ও কোরানের আপ্ত বাক্য মানে না, তাহারা বর্বর, জঙ্গলী, ধর্ম বিষয়ে পাড়াগেঁয়ে' ভূত; pagan-শব্দের মৌলিক অর্থ—'গ্রাম্য'। অন্য ভাবে বলা যায় যে, অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত কোনও ধর্মগুরুর উক্তি যে ধর্মের প্রতিষ্ঠা নহে, যে ধর্ম অনাদিকাল হইতে কোনও দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ও সেই দেশের অধিবাসীদের হৃদয়, চিত্ত ও সংস্কৃতির প্রকাশ-স্বরূপ স্বাভাবিক ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ স্বভাবজকে ধর্মকে Paganism বলা যায়; এই অর্থে এই শব্দ প্রয়োগে আমাদের আপত্তি নাই। কিছুকাল হইল, বঙ্গদেশে ও উত্তর-ভারতে সুপরিচিতা গ্রীক মহিলা শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী, মুখোপাধ্যায়-জায়া, আমাদের ভারতীয় Paganism—আমাদের স্বভাবজ ধর্ম হিন্দুধর্মক স্বীকার করিয়া, হিন্দু-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে চিন্তাশীল ও অতি উপাদেয় পুস্তক A Warning to the Hindus লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত Pagan, Paganism শব্দের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। য়োরুবা ধর্ম এইরূপ এক স্বভাবজ ধর্ম।

আফ্রিকার জনগণের মধ্যে প্রচলিত এইরূপ স্বভাবজাত ধর্মের প্রকৃতি বা স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, ইহার বাহ্য অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ বা দিক্ ধরিয়া, ইউরোপীয়গণ প্রথমটায় ইহার নাম দিয়াছিলেম Fetishism : fetish অর্থাৎ কোনও সৃষ্ট বস্তুতে দৈবী শক্তির আরোপ করিয়া সেই fetish-কে সম্মান করা, বিপদ্বারণ মাদুলি বা তাবিজের মতো ধারণ করা। আফ্রিকার সাধারণ লোকে হয়-তো একটি প্রস্তর-খণ্ড, কিংবা কোনও ফলের বীজ, কিংবা বস্ত্র-খণ্ড, কিংবা জন্তুবিশেষের অস্থি-খণ্ড, পক্ষিবিশেষের পালখ, বা ধাতুর কোনও দ্রব্য, কাষ্ঠের কোনও মূর্তি, এইরূপ কোনও একটি বস্তুর সম্বন্ধে বিশ্বাস করিল যে, স্বাভাবিক-ভাবে অথবা কোনও প্রক্রিয়ার ফলে ঐ বস্তুতে ঐশী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে সেই বস্তুকে তাহারা পূজা করে, বা পবিত্র বলিয়া ধারণ করে। এইরূপ বিশ্বাস বা আচরণ কিন্তু আফ্রিকার বন্য জাতির মধ্যেই নিবদ্ধ নহে; সুসভ্য ইউরোপীয় লোকেদের mascot বা সৌভাগ্য-আনয়ন-কারী দ্রব্য ধারণ বা গৃহে রক্ষণ করার রীতিকে Fetishism-ই বলিতে হয়। সুতরাং, কেবল এই জিনিসের দিকেই নজর রাখিয়া, ইহার একটি বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আফ্রিকার জনগণের মধ্যে উদ্ভূত এই স্বভাবজাত ধর্মকে Fetishism বলা চলে না। তেমনি, ইহা কেবল Animism অর্থাৎ 'দ্রব্যাত্মবোধ'-ও নহে—প্রত্যেক বস্তু বা দ্রব্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত এক প্রাণ-শক্তি বিদ্যমান, কেবল এই বিশ্বাসও নহে।

নানা যুগে, নানা দেশে ও নানা জাতির মধ্যে উদ্ভূত এইরূপ বিভিন্ন স্বভাবজ ধর্মের আপসের মধ্যে ঝগড়া নাই—সকলেই পরস্পরকে পারমার্থিক সত্যের পথের পথিক বলিয়া শ্রদ্ধা করে। নিজেকে একমাত্র সত্যধর্ম বলিয়া ভাবিয়া অন্য ধর্মকে হেয় জ্ঞান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি, কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে য়িহুদী ধর্মে বিশেষ করিয়া দেখা দেয়; পরে এই ভাব খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মেও সংক্রামিত হয়। অন্য ধর্মের বিলোপ সাধন করিয়া নিজের ধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মূলে হইতেছে এইরূপ ধারণা। স্বভাবজ ধর্মগুলি এই পাপ হইতে মুক্ত। আর একটি জিনিস বিচার করিবার—ইহাদের মধ্যে বাহ্য নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, স্বভাবজ ধর্মগুলির আলোচনায় ইহা দেখা যায় যে, বিভিন্ন পরিবেশ সত্ত্বেও মানব বিভিন্ন দেশে ও কালে স্বাধীন-ভাবে কতকগুলি সাধারণ উপলব্ধিতে আসিয়া পহুঁছিয়াছে; যেমন, বিশ্বাত্মবাদ বা বিশ্বাত্মানুভূতি—সর্বভূতে ঐশী শক্তি বা শাশ্বত সত্তার অবস্থান; যেমন,

কল্পনাতীত নির্গুণ পরব্রহ্ম ও তাহার সগুণ দেবতাময় প্রকাশ; যেমন, জন্মান্তরবাদ। এখানে যদি আমরা সর্বত্র ভারতের প্রভাব খুঁজি, তাহা হইলে আমাদিগকে জাতীয়তাদোষ-দুষ্ট বলিতে হয়; ধর্মের ক্ষেত্রে, "আমার জাতি-ই সব-চেয়ে বড়ো, আমার জাতির মধ্যেই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাবর্ষণ হইয়াছে", এই চিন্তা, ঐশী শক্তির অপমান করে। চীনের 'তাও'-বাদ, ভারতীয় নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্মের বা বিশ্বনিয়ন্তৃ ঋতের কল্পনার ছায়া নহে—উহা স্বতন্ত্রভাবে চীনা ঋষির উপলব্ধিতে আসিয়াছে,—এইভাবে দেখিলেই আলোচ্য উপলব্ধির সহজ মানব-সাধারণত্ব সূচিত হয়।

য়োরুবারা আমাদের নির্গুণ ব্রহ্মের মতো এক ঐশী শক্তিতে আস্থাবান্; এই শক্তির নাম Olorun 'ওলোরুঁ'। পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য জাতির লোকেরাও এইরূপ আস্থা পোষণ করে, তবে তাহাদের নিজ-নিজ ভাষায় তাহারা বিভিন্ন নামে তাঁহাকে অভিহিত করে। য়োরুবাদের মধ্যে খ্রীষ্টানেরা তাহাদের যিহোবাকে ও মুসলমানেরা তাহাদের আল্লাহ্‌কে ওলোরুঁর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে; খ্রীষ্টান য়োরুবারা এই নামেই পরমেশ্বরকে ডাকে। 'ওলোরুঁ' শব্দের অর্থ 'স্বর্গের স্বামী'। তাঁহার অন্য নামে তাঁহার মহিমা ব্যক্ত হয়—Eleda 'এলেদা' অর্থে 'স্রষ্টা', Alaye 'আলায়ে' অর্থে 'জীবনের স্বামী', Olodumare 'ওলোদুমারে' অর্থে 'সর্বশক্তিমান্', Olodumaye 'ওলোদুমায়ে' অর্থে 'স্বয়ম্ভূ', Elemi 'এলেমি' অর্থে 'পরমাত্মন্', Oga-Ogo 'ওগা-ওগো' অর্থে 'মহামহিম', Oluwa 'ওলুৱা' অর্থে 'প্রভু'। হিন্দুদের নির্গুণ ব্রহ্মের মতো গভীর দার্শনিক তথ্যে বা তত্ত্বে য়োরুবাদের পঁহুছানো সম্ভবপর হয় নাই; তবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', কারুণিক, ন্যায়কারী, পাপপুণ্যের বিচারক ঈশ্বরের ধারণা ইহারা ওলোরুঁর কল্পনায় করিতে পারিয়াছে।

এই সর্বশক্তিমান্, এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে কিন্তু সাধারণভাবে উপচার দিয়া পূজা করা হয় না। বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির ও মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের জীবনের পরিচালক হিসাবে, ইহারা কতকগুলি Orisha 'ওরিশা' বা দেবতার কল্পনা করে। এই ওরিশাদের সংখ্যা কোনও মতে ২০১, কোনও মতে ৪০১, কোনও মতে ৬০০। অনেক য়োরুবার ধারণা, ওরিশারা প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে নিজ শক্তি বা গুণের দ্বারা দেবতার পদে উন্নীত হন। কিন্তু য়োরুবা দেব-কাহিনী বা পুরাণ-কথা মতে, ওরিশাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস অন্য দেশের দেবতাদেরই মতো। ওলোরুঁ পৃথিবী-পালনের জন্য একজন পুরুষ দেবের

সৃষ্টি করিলেন—Obatala 'ওবাতালা', অর্থ 'সাদা-ঠাকুর', 'শ্বেতিমরাজ', বা 'জ্যোতিরীশ্বর'; এবং ওবাতালার পত্নী হইলেন Odudua 'ওদুদুআ' অর্থাৎ 'কৃষ্ণবর্ণা' বা 'কালী'—এই দেবী 'ওদুদুআ', ওলোরুঁর সৃষ্টা নহেন, তিনি প্রকৃতি, অনন্তকাল ধরিয়া পৃথক্ অবস্থান করিয়া আসিতেছেন। ওবাতালা-ওদুদুআ কতকটা আমাদের পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির মতো। ওবাতালাকে য়োরুবারা শুচিতার ও কল্যাণের দেবতা বলিয়া পূজা করে, তিনি-ই শিব বা মঙ্গলময়, মানবের স্রষ্টা ও ত্রাতা; কিন্তু ওদুদুআর চরিত্র ইহাদের হাতে ঘৃণ্যরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ওবাতালা হইতেছেন দ্যৌষ্পিতা, ওদুদুআ পৃথিবী-মাতা,—তাই পৃথিবীর পাপ ও পঙ্কিলতা ওদুদুআর চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে—ওদুদুআ পতি ওবাতালাকে ত্যাগ করিয়া মৃগয়াপ্রিয় জনৈক অন্য দেবতাকে আশ্রয় করেন। ওবাতালা ও ওদুদুআর এক পুত্র Aganju 'আগাঁজু' ও এক কন্যা Yemaja 'য়েমাজা'। ইহারা পরস্পরের সহিত বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হয়। ইহাদের দুই সন্তান, Obalofun 'ওবালোফুঁ' অর্থাৎ 'বাক্‌পতি' এবং Iya 'ইয়া' অর্থাৎ 'মাতা', ইহারা হইতেছে আদি মানব-মানবী। ইহাদের আর এক পুত্র Orungan 'ওরুঙ্গান'-এর দুর্বৃত্ততার ফলে য়েমাজার মৃত্যু হয়। য়েমাজার মৃত্যুর পরে তাহার দেহ স্ফীত হয়। দেহের রক্ত মাংস মেদ হইতে পনের জন প্রধান দেবতার উদ্ভব হয়। এই দেবতারা এখন য়োরুবা জাতির পূজিত। ইঁহাদের অনুরূপ দেবতা পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য জাতিগুলির মধ্যেও আছেন।

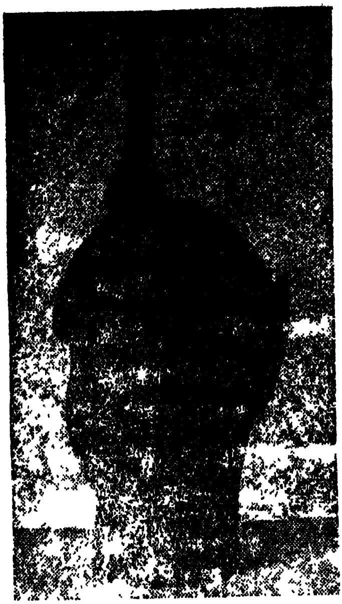
এই পনের জন দেবতার মধ্যে প্রধান হইতেছেন এই কয়জন :—

[১] Shango 'শাঙ্গো'—ইনি বজ্রের দেবতা, য়োরুবারা ইঁহার খুব-ই পূজা করে। আকাশে মেঘের মধ্যে এক পিত্তলময় প্রাসাদে শাঙ্গো নিজ গণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করেন। তাঁহার অসংখ্য ঘোড়া আছে। শাঙ্গোর রূপ কাঠের মূর্তিতে প্রদর্শিত হয়—শ্মশ্রুমান্ দেবতা, ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন। শাঙ্গোর তিন স্ত্রী—তিন জনেই য়েমাজার দেহ হইতে সম্ভূত, তিনজনেই তিনটি নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; ইঁহাদের মধ্যে প্রধানা হইতেছেন Oya 'ওইয়া', ইনি বিশাল Niger নাইগার নদীর দেবী। শাঙ্গো পাপের শাস্তি দেন। শাঙ্গোর অন্যতম অনুচর হইতেছে Oshumare 'ওশুমারে' বা 'রামধনু' —ইহার কার্য্য হইতেছে, পৃথিবী হইতে শাঙ্গোর পিত্তলময় প্রাসাদে মেঘমালার মধ্যে জল শোষণ করিয়া লওয়া। Double-axe বা যোড়ামুখ কুড়ালি শাঙ্গোর বিশেষ আয়ুধ বা বর্ণ-চিহ্ন। শাঙ্গোর সম্বন্ধে এই স্তোত্রটি খুব-ই জনপ্রিয়—

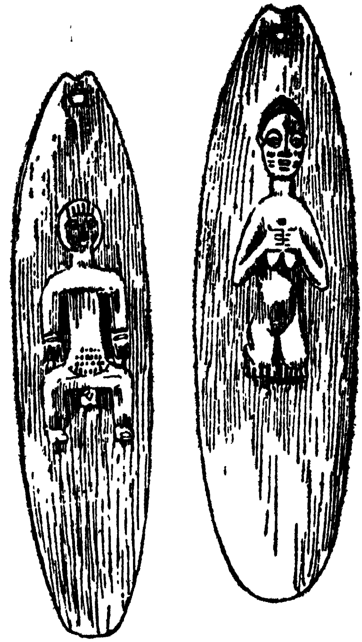


বিশ্বমাতা ওদুদুআ

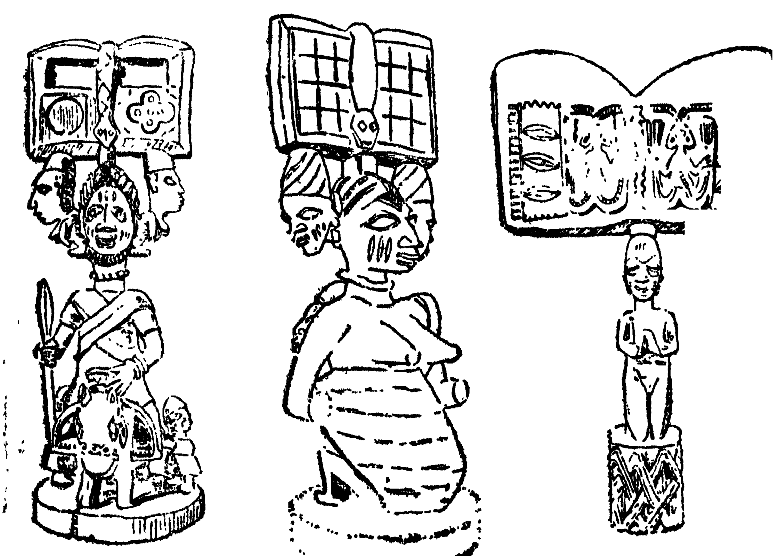
(য়োরুবা জাতির দেবতা—কাঠের মূর্তি)



ব্রঞ্জে ঢালা সাগর-পতি 'ওলোকুঁ'-র মূর্তি



কাঠের 'ভেম্‌রা'



বজ্রের দেবতা শাঙ্গো ও তাঁহার দুই পত্নী (কাঠের মূর্তি)

হে শাঙ্গো, তুমি-ই প্রভু।
তুমি অগ্নিময় প্রস্তরখণ্ড-সমূহ হাতে করিয়া লও,
পাপীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য।
তোমার ক্রোধ প্রশমন করিবার জন্য।
ঐ প্রস্তর যাহাকেই লাগে, তাহার বিনাশ ঘটে ;
অগ্নি বনানীকে খাইয়া ফেলে,
বৃক্ষরাজি ভগ্ন হয়,
সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হয়॥

[২] Ogun 'ওগুঁ'—লৌহ, যুদ্ধকার্য্য এবং শিকারের দেবতা। যে কোনও লৌহখণ্ডে ইহার অধিষ্ঠান। বৃত্তিতে যাহারা লোহার বা কামার এবং সিপাহী ও শিকারী, তাহাদের দ্বারা বিশেষভাবে পূজিত।

[৩] Orishako 'ওরিশাকো', Orisha Oko অথবা Oko 'ওকো'—কৃষির দেবতা, পুরুষ। অন্য নিগ্রো জনগণের মতো য়োরুবাদের মধ্যে কৃষিকার্য্য মেয়েরাই করিত, সেইজন্য 'ওকো'-র পূজকেরা বেশির ভাগ-ই স্ত্রীলোক।

[৪] Shopono 'শোপোনো' বা 'শ-প-ন'—বসন্ত-মারীর দেবতা।

[৫] Olokun 'ওলোকুঁ' বা 'সাগর-পতি'—সমুদ্রের দেবতা, বা বরুণ।

[৬] Ifa 'ইফা'—ভবিষ্যদ্বাণীর দেবতা।

[৭] Aroni 'আরোনি'—বনদেবতা; ইহার সম্বন্ধে য়োরুবাদের কল্পনা বিশেষ কবিত্বময়। এতদ্ভিন্ন অন্য অনেকগুলি দেবতারও পূজা আছে।

উপর্য্যুক্ত Orisha ওরিশা বা দেবতাদের পরেই হইতেছে প্রেত ও পিতৃ-পুরুষদের সম্মান। ইহাদের মধ্যে নানা প্রকারের প্রেতের কল্পনা আছে। পিতৃলোক হইতে প্রেতগণ পৃথিবীতে আগমন করে। এক শ্রেণীর লোক প্রেতের অভিনয় করিয়া, ইহাদের শ্রাদ্ধের অনুরূপ ধর্মানুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করে। যাহারা প্রেত সাজিয়া আসে, তাহাদের Oro 'ওরো' বলে। ইহারা রাত্রে সারা-গা-ঢাকা উলুখড়ের বা অনুরূপ বস্তুর পোষাক পরিয়া বাহির হয়, এবং ছিদ্র-যুক্ত ডিমের আকারের চেপ্টা ছোটো কাঠের ফিরকি বা ফলায় দড়ি বাঁধিয়া, সেই দড়ি দিয়া কাঠের ফলাটি বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া তদ্দ্বারা এক অদ্ভুত আওয়াজ করিতে-করিতে আসে। এইরূপ ঘুরনি-ফলার গায়ে কখনও-কখনও পুরুষ বা স্ত্রী-মূর্তি খোঁদা থাকে। এই ফলাগুলি ৬ ইঞ্চি হইতে ২॥ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এবং ঘুরাইবার কালে আকার অনুসারে ইহা

হইতে সূক্ষ্ম বা গম্ভীর ধ্বনি নির্গত হয়। এইরূপ ঘুরনি-ফলাকে ইংরেজিতে Bull-roarer বলে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এবং অন্য বহু আদিম জাতির মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানে ইহার রেওয়াজ আছে। আমাদের হিন্দু অনুষ্ঠানে এ জিনিস অজ্ঞাত। কিন্তু ত্রিপুরায় আদিবাসীদের মধ্যে এই বস্তু দেখা যায়—স্থানীয় বাঙ্গালায় ইহাকে 'ভেম্‌রা' বলে। ইহাদের পূজার রীতিতে এমন অনেক উপকরণ ও ক্রিয়া প্রচলিত, যাহা কেবল ইহাদের মধ্যেই মিলে—সে-সকল ইহাদের ইতিহাস ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ফল।

দেবতা ও প্রেত ভিন্ন, য়োরুবারা পাপ-পুরুষ বা শয়তান Eshu 'এশুর' অর্থাৎ 'অন্ধকারের রাজা'র পূজা করে।

য়োরুবাদের শিশুকালেই পুরোহিতেরা ঠিক করিয়া দেন, কোন্ দেবতা তাহার ইষ্টদেবতা হইবে—সারা জীবন ধরিয়া সেই দেবতাকেই বিশেষ ভাবে পূজা করিতে হইবে। প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যেক আস্তিক য়োরুবা নিজ ইষ্টদেবের-নাম লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করে। জলে নামিয়া স্নান করিবার সময়ে অনেকে দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র বলিতে থাকে—মন্ত্র অবশ্য য়োরুবা ভাষায়। ইহাদের দেবতাদের মন্দির খড়ের-চালে ঢাকা সাধারণ কুটীর মাত্র, যে রকম কুটীরে বা গৃহে ইহারা নিজেরা অবস্থান করে। সাধারণের জন্য বিভিন্ন দেবতার মন্দির থাকে, আবার সম্পন্ন বা দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ির আঙ্গিনায় বা ঠাকুর-ঘরে ঠাকুরের মূর্তি থাকে। আবার বৃক্ষরাজিময় কোনও পবিত্র স্থান মন্দিরের মতো ব্যবহৃত হয়। কোনও গাছকে আশ্রয় করিয়াও পূজা হয়। সাধারণ খাদ্যসম্ভার, ফল প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া, মদ ঢালিয়া, ডিম ভাঙ্গিয়া এবং নানা প্রকার পশু ও পক্ষী জবাই করিয়া পূজা হয়। আমরা যেমন দেবতাকে ফুল দিয়া পূজা করি, সেরূপ পুষ্পদানের রীতি ইহাদের পূজায় অজ্ঞাত। বিশেষ দেবতার পুরোহিতেরা বিশেষ প্রকারের বর্ণচিহ্ন ধারণ করে। যেমন, ওবাতালার পুরোহিতেরা কেবল সাদা রঙের কাপড় পরে, গলায় শ্বেতবর্ণের মালা ধারণ করে। ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করার বিধি আছে। পশুবধ করিয়া, হয় সমস্ত অগ্নিসাৎ করা হয়, না হয় তাহার রক্ত লইয়া দেবতার দ্বারে মাখানো হয়। ফল ও খাদ্যের নৈবেদ্য ও বলির পশুর মাংস প্রসাদ-রূপে উপাসকদের দ্বারা ভক্ষিত হয়। সাধারণ-অনুষ্ঠান-মূলক পূজা ভিন্ন, ব্যক্তিগত প্রার্থনারও রীতি সুপরিচিত —ওলোরু, শাঙ্গো, ইফা প্রভৃতি বিশেষ দেবতার নিকট রুচি-মতো লোকে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করে।

ইহাদের মধ্যে আত্মার অবিনাশিত্বের পূরা বোধ আছে।

য়োরুবাদের মতে, মানুষ নিজ পাপপুণ্যের ফল ভোগ করে। সঙ্গে-সঙ্গে পুনর্জন্মবাদও ইহারা মানে। তবে পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে ইহাদের বিচার খুব গভীর নহে। মানবাত্মার শেষ বিশ্রাম-স্থান, Olorun ওলোরুঁ বা পরমেশ্বর।

দেখা যাইতেছে যে, সুদূর পশ্চিম-আফ্রিকার তথা-কথিত বন্য বর্বর নিগ্রো মানুষ, আমাদেরই মতো, এক-ই ভাবে আশা আশঙ্কা জুগুপ্সা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত, এবং সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যে ধর্ম-মত তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম-মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুসভ্য, শিক্ষিত ও পরমত-সহিষ্ণু হিন্দুর সংস্পর্শে আসিলে, ইহাদের আধ্যাত্মিক জীবন কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা বলা কঠিন; তবে এটুকু মনে হয়, আমাদের সংস্কৃতির মজ্জায়-মজ্জায় যে চিন্তাধারা বিদ্যমান, যে "যত মত, তত পথ", তাহার কল্যাণে য়োরুবারা ও অনুরূপ অন্য আফ্রিকান জাতির লোকেরা, নিজের ধর্মের মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধান পাইত, এবং অন্য ধর্মের অন্ধ অসহিষ্ণুতার ফল-স্বরূপ আত্ম-দৈন্য-স্বীকারের অপমান হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইত ॥

ভারতবর্ষ
কার্ত্তিক, ১৩৪৯
(স্বল্প পরিবর্তিত)

শ্রীজয়দেব কবি

'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা কবি শ্রীজয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্বাপেক্ষা শ্রুতি-মধুর গীতি-কবিতার কবি বলিয়া তিনি সর্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে সম্মানিত হইয়া আছেন। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের নাম উল্লেখ করিতে হইলে সহজেই তাঁহার নাম আসিয়া পড়ে—অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, শ্রীহর্ষ, ভর্তৃহরি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, বিহ্লণ, জয়দেব। বাস্তবিক, নিখিল ভারত ব্যাপিয়া যাঁহাদের যশ বিস্তৃত, সেই শ্রেণীর প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলিতে হয়। এক মহাকবি কালিদাসের ভারত-ব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব তুলিত হইতে পারে; জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি কবির পরবর্তী কালের ভারতীয় সাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। জয়দেবের জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ১২ ও ১৩-র শতকের পরেও সংস্কৃত কাব্য ও শ্লোক রচনার ধারা অব্যাহত ছিল বটে, কিন্তু উত্তর-ভারত তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে এবং ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভবের ফলে পরবর্তী শতক-সমূহে সংস্কৃতে কাব্যাদি রচনা রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইল, এবং আর পূর্বের মতো জনপ্রিয় থাকিতে পারিল না; এই জন্য এই ধারা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, বিশেষ করিয়া উত্তর-ভারতে। মুসলমান-যুগে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি বড়ো বড়ো কবি নিজ প্রতিভার প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের আবির্ভাব ইহা-ই প্রমাণিত করিয়াছিল যে, মুসলমান-যুগে অনেকটা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও হিন্দুর কাব্য-প্রতিভা তাহার অর্ধ-সহস্র বা সহস্র বর্ষ পূর্বেকার কৃতিত্বের প্রতিস্পর্ধী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিত, শ্রীনীলকণ্ঠ দীক্ষিত প্রভৃতি কবিগণ মুসলমান-যুগেও সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব বর্ধন করিয়া গিয়াছেন: তাঁহাদের কাব্য নাটকাদি ও অন্য পুস্তক, প্রাচীন হিন্দু-যুগের কবিদের রচনার মতোই সাদরে আলোচিত হইবার যোগ্য; ভারতের সংস্কৃতি-পূত চিত্তের বিগত কয়েক শতক ধরিয়া যে বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহা ইঁহাদের রচনাতেই বহুল পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের ও বিদ্যাগর্ভ সাহিত্যের নদী অবিলুপ্ত গতিতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেও, খ্রীষ্টীয় ১৩-র শতকের আরম্ভ

হইতে, জয়দেব কবির পর যে সংস্কৃতের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটিল এবং নূতন ভাষা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইল, সে কথা স্বীকার করিতে হয়। জয়দেব হইতেছেন যুগ-সন্ধির কবি, তাঁহার রচনায় প্রাচীনের বিজয়া ও নবীনের আগমনী উভয়-ই যেন যুগপৎ ঝংকৃত হইয়াছে। তিনি ছিলেন, ইংরেজি কথায়, the first of the moderns and the last of the ancients.

শ্রীকৃষ্ণলীলা—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকথা—অবলম্বন করিয়া অতি মনোহর ও শ্রুতি-মধুর কবিতা ও গানের রচয়িতা বলিয়া-ই, অতি সহজে শ্রীজয়দেব—অন্ততঃ সম্প্রদায়-বিশেষের জনগণের সমক্ষে—দিব্য অনুপ্রাণনার দ্বারা প্রণোদিত রসিক-ও কবি-রূপে এবং ভক্ত-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। রাধা ও কৃষ্ণের স্বর্গীয় ও শাশ্বত প্রেমকে মানব আকারে রূপ-দান করিয়া নবীন হিন্দু সমাজের সমীপে রসের অনন্ত ভাণ্ডার-রূপে উপনীত করা হয়; তুর্কী-বিজয়ের পরে, যখন মুখ্যতঃ সূফী-মতাবলম্বী ফকীর ও প্রচারকদের চেষ্টায় ভারতে জনগণের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম অল্পে-অল্পে প্রসার লাভ করিতে থাকে, এবং ভারতের ধর্মজীবন ও সংস্কৃতি যখন এইভাবে বিদেশী ধর্মের অভ্যুত্থানে ও প্রসারে বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে দেশের হৃদয়ে সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্য, পুনরুদিত ভক্তিবাদকে আবাহন করা হইল; ভারতের সাধক ও ভক্তগণ দেশের মধ্যে ভক্তির ধারার প্রবাহ ফিরাইয়া আনিতে বা তাহাতে নবীনতা দান করিতে চেষ্টা করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামচন্দ্রলীলা এই ভক্তিমার্গের প্রধান পরিপোষক-রূপে দেখা দিল। ধীরে ধীরে জয়দেব কবির 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি ধর্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা পাইল, এবং স্বয়ং জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুগৃহীত বৈষ্ণব ভক্ত ও মহাপুরুষের সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। আধুনিক ভারতের বৈষ্ণব ভক্তকথার মধ্যে জয়দেব অচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত হইলেন, বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধকদের মধ্যে তাঁহার সম্মাননীয় আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসাধারণের মধ্যে এইভাবে ভক্ত-রূপেই তাঁহার নাম সুপরিচিত; যে-সকল ভক্তিপূত ইতিবৃত্ত পাঠে মানুষের মন ভগবদভিমুখী হইয়া উন্নীত হয়, জয়দেবের নামের সহিত বিজড়িত কাহিনী-গুলি সেই ইতিবৃত্ত-সমূহের অন্যতম হইয়া এখন বিদ্যমান। এইরূপে মানুষের ধর্মজীবনে অনুপ্রাণনা আনিবার সৌভাগ্য ভারতের অতি অল্পসংখ্যক কবির পক্ষে ঘটিয়াছিল; ব্যাস ও বাল্মীকি এবং কতকটা কালিদাস ভিন্ন আর কোনও কবি এইভাবে সাহিত্যেতিহাসের দৃঢ় পার্থিব ভূমি হইতে পুরাণ-সুলভ কাহিনী ও মধ্য-যুগের ধর্মসাধনার গগনপথে উন্নীত হইতে পারেন নাই।

শ্রীজয়দেব কবির জীবৎকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই—তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, এবং গৌড়-বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের সভার অন্যতম কবি ছিলেন। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় ১৯০৬ সালের Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকার ১৬৩-১৬৯ পৃষ্ঠায় Sanskrit Literature in Bengal during the Sena Rule নামে তাঁহার মূল্যবান্ প্রবন্ধ-মধ্যে জয়দেবের কথা পূর্ণভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্য পাঠে আমরা জয়দেবের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জানিতে পারি। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার নাম রামা দেবী (বা বামা দেবী, অথবা রাধা দেবী), তাঁহার পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী, এবং পরাশর নামে তাঁহার এক প্রিয়বন্ধু ছিলেন যিনি 'গীতগোবিন্দ'র গান গাহিতেন। জয়দেব তাঁহার সমসাময়িক অন্য কবিদের উল্লেখ করিয়াছেন—উমাপতিধর, শরণ, আচার্য্য গোবর্ধন ও ধোয়ী কবিরাজ। অন্যত্র ইঁহাদের কথা শুনা যায়; ইঁহাদের রচনাও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজ গ্রাম কেন্দুবিল্বের নাম তিনি গীতগোবিন্দে করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেব নামে একাধিক কবি উদ্ভূত হন, কিন্তু গীতগোবিন্দ-কার জয়দেব ভিন্ন আর কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। জয়দেব নামে এক ছন্দঃ-সূত্র-রচয়িতা ছিলেন, ইনি আলংকারিক অভিনবগুপ্ত (খ্রীষ্টাব্দ ১০০০) কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছিলেন, এবং হর্ষট (খ্রীষ্টাব্দ ৯০০) ইঁহার ছন্দঃ-সূত্রের একটি টীকা প্রণয়ন করেন, সুতরাং ইনি আমাদের জয়দেবের কয়েক শতক পূর্বেকার লোক। রামায়ণ-কথা অবলম্বন করিয়া রচিত 'প্রসন্ন-রাঘব' নাটকের রচয়িতা আর-এক জয়দেব ছিলেন, ইঁহার পিতার নাম মহাদেব ও মাতার নাম সুমিত্রা, ইনি কৌণ্ডিন্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহার গুরুর নাম ছিল হরিমিশ্র, ইনি গীতগোবিন্দ-কার জয়দেবের কাছাকাছি সময়ের হইবেন, কারণ ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত কাশ্মীরীয় কবি জহ্লণ-কৃত 'সূক্তিমুক্তাবলী' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে 'প্রসন্ন-রাঘব' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এই জয়দেবের আর কোনও পরিচয় নাই, তবে কেহ-কেহ অনুমান করেন, ইনি বিদর্ভের অর্থাৎ উত্তর-মহারাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। 'চন্দ্রলোক' নামে অলংকার-গ্রন্থও ইঁহার রচিত। বাঙ্গালা দেশে ইঁহার খ্যাতি তাদৃশ বিস্তৃত হয় নাই। 'জয়দেব' বলিলে আমরা 'গীতগোবিন্দ'কার জয়দেবকেই বুঝিয়া থাকি। আমাদের জয়দেব বাঙ্গালার কবি ছিলেন, তাঁহার কেন্দুবিল্ব

এখন কেঁদুলি নামে তাঁহার পীঠস্থান-রূপে পরিচিত। বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরে এই গ্রামে পৌষ-সংক্রান্তির বার্ষিক মেলায় এখনও তাঁহার স্মৃতি উদ্‌যাপিত হয়। ষোড়শ শতকে নাভাজীদাসের ব্রজ-ভাষা বা প্রাচীন হিন্দীতে রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে ও সপ্তদশ শতকে প্রিয়াজীদাসের রচিত ঐ গ্রন্থের টীকাতে, তখনকার দিনে বিশেষ প্রচারিত, জয়দেব সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনী পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী সম্বন্ধে কাহিনীটি—এটি বিশেষ লোকপ্রিয় হয়। পদ্মাবতীর পিতার ইচ্ছা ছিল যে, নিজের কন্যাকে দেববাসীরূপে তিনি জগন্নাথ-মন্দিরে সমর্পণ করিয়া আসেন, কিন্তু নারায়ণ-কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পরে জয়দেবের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' সংক্রান্ত ভক্তি-মূলক আখ্যায়িকাটি বাঙ্গালা দেশে সুপ্রসিদ্ধ। 'সেকশুভোদয়া'-তে জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্পর্কে এই কথা সংরক্ষিত আছে যে—বুঢ়নমিশ্র নামে বাঙ্গালা দেশের বাহির হইতে আগত জনৈক সংগীতজ্ঞ জয়দেবকে সংগীত-প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন, বিদেশাগত দাম্ভিক কালোয়াতকে জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী পরাজিত করিয়াছিলেন। 'সেকশুভোদয়া'র এই উপাখ্যানের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য থাকা খুব-ই সম্ভবপর। পদ্মাবতী সংগীত-বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন, ইহা এই কথা হইতে প্রমাণিত হয়, এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে যে দেবদাসী-রূপে মন্দিরে গান গাহিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতা সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, এই কাহিনীও যেন কতকটা সমর্থিত হয়; অপর, জয়দেব আপনাকে যে 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' বলিয়া গর্বের সঙ্গে উল্লিখিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যেন ইহাও সূচিত হইতেছে যে, পদ্মাবতী নৃত্যকুশলা ছিলেন। এই-সকল কাহিনী অনুসারে, এবং 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে একাধিক স্থানে নিজ পত্নীর নাম কবি-কর্তৃক উল্লিখিত হওয়ায়, ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, জয়দেব-পদ্মাবতীর দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখের ছিল।

জয়দেব মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে যে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, তাহার বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জয়দেবের সমকালীন পণ্ডিত ও কবি এবং সামন্ত ভূম্যধিকারী বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১১২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে একখানি সংস্কৃত শ্লোক-সংগ্রহ সংকলিত করেন, ঐ পুস্তক বাঙ্গালা দেশে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় এবং মুসলমান-পূর্ব যুগের গৌড়-বঙ্গের কবি-মনের সমীক্ষায় অমূল্য। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ১৯৩৩ সালে লাহোর হইতে স্বর্গত পণ্ডিত রামাবতার শর্মা ও

পণ্ডিত হরদত্ত শর্মার সম্পাদনায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [সম্প্রতি ইহার আর একটি সংস্করণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।] এই সংগ্রহ-গ্রন্থে পাঁচটি প্রবাহে বিভিন্ন ছন্দে রচিত প্রায় ২৪০০ সংস্কৃত শ্লোক আছে। এগুলির মধ্যে ৫০০টি শ্লোকের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত বা লুপ্ত, কিন্তু অবশিষ্ট শ্লোকগুলির রচয়িতা বলিয়া প্রায় ৫০০ জন কবির নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে বোধ হয় ৩০০র অধিক গৌড়-বঙ্গের কবি হইবেন। যে পাঁচটি 'প্রবাহ' অর্থাৎ অধ্যায়ে এই নাতিক্ষুদ্র সংগ্রহ-গ্রন্থ বিভক্ত, সেগুলি যথাক্রমে হইতেছে—[১] অমর- বা দেব-প্রবাহ, [২] শৃঙ্গার-প্রবাহ, [৩] চাটু-প্রবাহ, [৪] অপদেশ-প্রবাহ, ও [৫] উচ্চাবচ-প্রবাহ। প্রত্যেক প্রবাহের অন্তর্গত কতকগুলি করিয়া 'বীচি' বা তরঙ্গ অর্থাৎ শ্রেণী আছে, এবং প্রত্যেক বীচি পাঁচটি করিয়া শ্লোকে সম্পূর্ণ। অমর-প্রবাহে আছে এইরূপ ৯৫ বীচি, শৃঙ্গার-প্রবাহে ১৭৯, চাটু-প্রবাহে ৫৪, অপদেশ-প্রবাহে ৭২ ও উচ্চাবচ-প্রবাহে ৭৬। এই-সমস্ত সংস্কৃত কবিতার অনেকগুলিতেই, খ্রীষ্টীয় ১২০০-র অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশ তুর্কী কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বেকার যুগের বাঙ্গালী কবিচিত্ত প্রতিফলিত হইয়া আছে; ভবিষ্যযুগের বাঙ্গালা কবিতার ভাবধারা ও তাহার ঝংকার বহুল পরিমাণে এই-সকল শ্লোকেই আমরা ধরিতে পারি। সংস্কৃতে নিবদ্ধ এই-সকল শ্লোকের কতকগুলিতে মধ্য-যুগের, এমন কি আধুনিক কালের বাঙ্গালা কবিতার পূর্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা কাব্যেতিহাসের আলোচনায় 'সদুক্তিকর্ণামৃত'কে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম সংস্কৃতময়ী প্রতিষ্ঠাভূমি স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়।

এখন, সদুক্তিকর্ণামৃতে 'জয়দেবস্য' বলিয়া ৩১টি শ্লোক বিভিন্ন প্রবাহে ধৃত হইয়াছে; এগুলির মধ্যে ৫টি শ্লোক গীতগোবিন্দে পাওয়া যায়। ছন্দঃ-সূত্রকার জয়দেবের কবি-প্রসিদ্ধি নাই; এবং 'প্রসন্নরাঘব'-কার জয়দেব হয়-তো আমাদের জয়দেবেরই সমকালীন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম-যশ বাঙ্গালা দেশে তখন পঁহুছায় নাই। 'গীতগোবিন্দ'কার জয়দেব হইতে পৃথক্ আর কোনও জয়দেবের কথা জানিয়া থাকিলে, শ্রীধরদাস অবশ্যই তাঁহার উল্লেখ করিতেন; তাঁহার সমকালীন জীবিত কবি, রাজসভায় যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁহার 'গীতগোবিন্দ' হইতে শ্লোক তিনি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সহিত অপর কোনও জয়দেবকে শ্রীধরদাস নিশ্চয়ই বিজড়িত করিয়া ফেলিতেন না। সুতরাং, 'গীতগোবিন্দ' হইতে গৃহীত পাঁচটি শ্লোকের বলে, এবং জয়দেব

শ্রীধরদাসের পরিচিত কবি ছিলেন এই কথাও ধরিয়া (শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস লক্ষ্মণসেন দেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এ কথা সদুক্তিকর্ণামৃতের ভূমিকায় তিনি আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন), এই ৩১টি শ্লোকের সব কয়টিরই রচয়িতা গীতগোবিন্দ-কার জয়দেব ছিলেন, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। সদুক্তিকর্ণামৃতে জয়দেবের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে, উমাপতিধরের রচিত ৯১টি শ্লোক আছে, লক্ষ্মণসেন-পুত্র যুবরাজ কেশবসেন দেবের ১০টি, আচার্য্য গোবর্ধনের ৬টি, ধোয়ী কবির ২০টি (তন্মধ্যে ২টি 'পবন-দূত' হইতে), শরণের ২০টি, মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের ১১টি, হলায়ুধের ৫টি। এতদ্ভিন্ন আরও বহু কবি, যাঁহারা জয়দেবের আশপাশের সময়ের ছিলেন, তাঁহাদেরও রচনা আছে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে শ্রীরূপগোস্বামী 'পদ্যাবলী' নামে যে একখানি বৈষ্ণব-শ্লোক-সংগ্রহ পুস্তক সংকলন করেন, তাহাতেও এই-সমস্ত কবির লেখা কতকগুলি শ্লোক মিলিতেছে।

জয়দেব-রচিত এই শ্লোকগুলির মধ্যে, শৃঙ্গাররস ভিন্ন বীররসের শ্লোকও পাইতেছি, এবং আমাদের চক্ষে বৈষ্ণব-সাধক-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত জয়দেবের রচিত শিবের স্তুতিময় শ্লোকও পাইতেছি। এই শ্লোক-সমূহ হইতে দেখা যায়, জয়দেবের বাণী কেবল বাঁশীর ঝংকারেই মাতেন নাই, অসির ঝঞ্চনাও তাঁহাকে মাতাইয়াছিল, রণক্ষেত্র তূর্য্যধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই-সব দেখিয়া মনে হয়, জয়দেব পঞ্চদেবতার উপাসক সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ছিলেন।. পরবর্তী কালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-কর্তৃক তিনি যে একজন বিশিষ্ট সাধক বৈষ্ণব বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, আদৌ সম্ভবতঃ তিনি তাহা ছিলেন না। খ্রীষ্টীয় ১১০০-১২০০-এর দিকে, চৈতন্যোত্তর যুগের আদর্শে গঠিত বৈষ্ণব সমাজ বা ধর্ম বিদ্যমান ছিল বলিয়া মানিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'র ভূমিকায় দেখাইয়াছিলেন যে, বিদ্যাপতি, 'বৈষ্ণব মহাজন' বলিলে আমরা যে সাম্প্রদায়িক সাধক বুঝি, তাহা আদৌ ছিলেন না, সহজিয়া সাধকও ছিলেন না, তিনি ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ এবং শিবের, উমার ও গঙ্গার উপাসক। 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিলেও, জয়দেব সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে।

জয়দেবের কবিতার ব্যাখ্যাতেও পরবর্তী সাম্প্রদায়িক মতবাদ আরোপিত হইয়া স্থলে-স্থলে নানা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জয়দেবের

'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম শ্লোকের "নন্দ-নিদেশতঃ" সমস্তপদটির ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং, বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্;
নক্তং ; ভীরুরয়ং—তদেব ত্বমিমং, রাধে ! গৃহং প্রাপয়।"
—ইত্থং নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা-কূলে রহঃ-কেলয়ঃ ॥

এই সুপরিচিত শ্লোকের সরল অর্থ ইহা-ই দাঁড়ায় যে, নন্দ-গোপের নিদেশেই, কিন্তু তাঁহার অজ্ঞানতঃ, মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার রাত্রে পথস্থ কুঞ্জমধ্যে রাধা ও মাধবের মিলন ঘটিয়াছিল। কিন্তু রাণা কুম্ভের সভায় আলংকারিক পণ্ডিতগণ, কুম্ভ-রাণার নামে প্রচলিত 'রসিকপ্রিয়া' নামে 'গীতগোবিন্দ'র টীকা প্রণয়নে যাঁহাদের হাত ছিল, তাঁহারা, "নন্দ-নিদেশতঃ" এই সমস্তপদের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং এই ব্যাখ্যা ("নন্দ" অর্থাৎ মিলন-আনন্দের উদ্দেশ্যে, নন্দ-গোপের আদেশে নহে ; শ্লোকটির প্রথম দুই ছত্রের উক্তি, এই বিচার অনুসারে, নন্দ-গোপের নহে, ইহা সখীর উক্তি রাধার প্রতি) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত 'গীতগোবিন্দ'র ভূমিকা, এবং ১৩৪৯ সালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র দোল-সংখ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ)। কিন্তু 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে দুইটি শ্লোক পাওয়া যাইতেছে, 'গীতগোবিন্দ'-র প্রথম শ্লোকের মতোই শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত—একটি রাজকুমার কেশবসেন দেবের রচিত, অন্যটি মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের ;—সে দুইটি হইতে বুঝা যায় যে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের "নন্দ" শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পালক-পিতা নন্দ-গোপকেই ধরিতে হইবে, এবং এই তিনটি শ্লোক—জয়দেবের, কেশবসেন দেবের ও লক্ষ্মণসেন দেবের—এক সঙ্গেই বিচার করিতে হইবে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'র এই দুইটি শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'-তেও আছে, কিন্তু 'পদ্যাবলী'-তে দুইটি-ই মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের রচিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। শ্লোক দুইটি এই—

(কেশবসেন-রচিত)—

"আহূতাদ্য ময়োৎসবে, নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা,
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ ; কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি ?
বৎস, ত্বং তদিমাং নয়ালয়ম্"—ইতি শ্রুত্বা যশোদা-গিরো,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে, এই শ্লোকটি যে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের প্রতিধ্বনি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে যশোদাও না জানিয়া রাধা ও কৃষ্ণের মিলনে সহায়তা করিতেছেন; ইহাতে যেন "নন্দ-নিদেশতঃ" পদের প্রত্যুত্তর বা পালটা জবাব "যশোদা-গিরঃ" পাওয়া যাইতেছে। "যশোদা-গিরঃ" পদটির, "নন্দ-নিদেশতঃ"-র মতো, অন্য ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস আশা করি কেহ করিবেন না।

(লক্ষ্মণসেন-রচিত)—

"কৃষ্ণ, ত্বদ্‌বনমালয়া সহ কৃতং", কেনাঽপি, "কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম—তদিদং প্রাপ্তং ময়া ; গৃহ্যতাম্।"
—ইত্থং দুগ্ধমুখেন [দগ্ধমুখেন] গোপশিশুনাঽখ্যাতে, ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিত-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ।

এই শ্লোকে যেন মহারাজ লক্ষ্মণসেন, অন্যতম সভাকবি জয়দেব- ও রাজকুমার-রচিত যুগ্মশ্লোকের সমাধান করিয়া দিতেছেন, কি করিয়া রাধাকৃষ্ণের গোপন মিলনের রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনটি শ্লোকেরই চতুর্থ ছন্দের "রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি" এই অংশ লক্ষণীয়। তিনটি শ্লোক-ই যেন সমস্যাপূর্তির জন্য রচিত হইয়াছিল, যেন সভায় রসিক ও বিদ্বান্ রাজা সমস্যা-স্বরূপ শ্লোকাংশ দিলেন—"রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি", ও পরে সভাস্থ কবিদের আহ্বান করিলেন, এই শ্লোকাংশকে চতুর্থ ছত্রের প্রথমে সন্নিবেশিত করিয়া শ্লোক রচনা করিতে হইবে। কিংবা হয়-তো জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া অথবা শুনিয়া প্রীত হইয়া, রাজা ও রাজকুমার উভয়েই এই ভাবের কবিতা রচনা করিয়া কবিকে সম্মানিত করিয়া থাকিবেন। মোটের উপর, আমরা শ্রীধরদাসের নিকট কৃতজ্ঞ; তিনি এই শ্লোক দুইটি তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধার করিয়া না দিলে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন ও যুবরাজ কেশবসেনের সহিত জয়দেবের এই সাহিত্যিক সংযোগের কথা জানিতে পারিতাম না; এবং এই দুই শ্লোকের দ্বারা "নন্দ-নিদেশতঃ" সমস্তপদটির সহজ সরল অর্থ-ই সমর্থিত হইতেছে, পরবর্তী সাম্প্রদায়িক অর্থ-কল্পনা নহে।

জয়দেবের রচিত শ্লোকগুলি 'সদুক্তিকর্ণামৃত' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এগুলিতে জয়দেবের কবি-প্রতিভার কতকগুলি অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত দিক্ প্রকাশিত হইতেছে।

[১] ১।৪।৪। মহাদেব ॥

ভূতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎকৈতবাদম্বু বিভ্রল্-
ললাটাক্ষিচ্ছলেন জ্বলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ সমীরম্।
বিস্তীর্ণাঘোরবক্ত্রোদরকুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈর্
বিশ্বং শশ্বদ্ বিতন্বন্ বিতরতু ভবতঃ সম্পদং চন্দ্রমৌলিঃ ॥

[২] ১।৫০।৩। কল্কী ॥

কল্কী কল্কং হরতু জগতঃ স্ফূর্জদূর্জস্বিতেজা
বেদোচ্ছেদস্ফুরিতদুরিতধ্বংসনে ধূমকেতুঃ।
যেনোৎক্ষিপ্য ক্ষণমসিলতাং ধূমবৎ কল্মষেচ্ছান্
ম্লেচ্ছান্ হত্বা দলিতকলিনাকারি সত্যাবতারঃ ॥

[৩] ১।৫৯।৪। কৃষ্ণভুজ: ॥

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ [=গীতগোবিন্দ ১১।৩৪] ॥

[৪] ১।৬০।৫ গোবর্ধনোদ্ধারঃ ॥

"মুগ্ধে !" "নাথ, কিমাত্থ ?" "তন্বি, শিখরিপ্রাগ্ভারভুগ্নো ভুজঃ",
"সাহায্যং, প্রিয় ! কিং ভজামি ?" "সুভগে, দোর্বল্লিমায়াসয়।"
—ইত্যুল্লাসিতবাহুমূলবিচলচ্চেলাঞ্চলব্যক্তয়ো
রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥

[এই শ্লোকের সহিত উমাপতিধর-রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয় —এটি সদুক্তিকর্ণামৃতের ১।৫৫।৩ সংখ্যক শ্লোক, বিষয়, "হরিক্রীড়া"; 'পদ্যাবলী'-তেও এটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সংখ্যা ২৫৯ :—

ভ্রূবল্লীচলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥

—উভয় শ্লোকের শেষ ছত্র দুইটি তুলনীয়; "পতিতাঃ—চলিতাঃ"—এই দুইটি পদের যে কোনও একটি ধরিতে পারা যায়; সমস্যাপূর্তির শ্লোক হিসাবে শেষ ছত্রের আধারে এই দুই সভাকবি নিজ নিজ শ্লোক রচিয়া থাকিবেন।]

[৫] ১।৮৫।৫। বহুরূপকশ্চন্দ্রঃ ॥

ক্রীড়াকর্পূরদীপস্ত্রিদশমৃগদৃশাং কামসাম্রাজ্যলক্ষ্মী-
প্রোৎক্ষিপ্তৈকাতপত্রং শ্রমশমনচলচ্চামরং কামিনীনাম্।
কস্তূরীপঙ্কমুদ্রাঙ্কিতমদনবধূমুগ্ধগণ্ডোপধানং
দ্বীপং ব্যোমাম্বুরাশেঃ স্ফুরতি স্মরপুরীকেলিহংসঃ সুধাংশুঃ ॥

[৬] ২।৩৭।৪। বাসকসজ্জা ॥

অঙ্গেম্বাভরণং করোতি বহুশঃ [=গীতগোবিন্দ ৫।১১] ॥

[৭] ২।৭২।৪। অধরঃ ॥

বিভাতি বিম্বাধরবল্লিরস্যাঃ স্মরস্য বন্ধূকধনুর্লতেব।
বিনাপি বাণেন গুণেন যেয়ং যূনাং মনাংসি প্রসভং ভিনত্তি ॥

[৮] রোমাবলী ॥

হরতি রতিপতের্নিতম্ববিম্বস্তনতটচংক্রমসংক্রমস্য লক্ষ্মীম্।
ত্রিবলিভবতরঙ্গনিম্ননাভীহ্রদপদবীমধিরোমরাজিরস্যাঃ ॥

[৯] ২।১৩২।৪। রতারম্ভঃ ॥*

উন্মীলৎপুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমিষেণ চ [=গীতগোবিন্দ
১২।১০] ॥

[১০] ২।১৩৪।৪। বিপরীতরতম্ ॥

মারাঙ্কে রতিকেলি ইত্যাদি [=গীতগোবিন্দ ১২।১২] ॥

[১১] ২।১৩৭।৫। উষসি প্রিয়াদর্শনম্ ॥

অস্যাঃ [তস্যাঃ] পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো [=গীতগোবিন্দ ১২।১৪] ॥

[১২] ২।১৭০।৫ শরৎখঞ্জনঃ ॥

মধুরমধুরং কূজন্নগ্রে পতন্ মুহুরুৎপতন্
অবিরতচলৎপুচ্ছঃ স্বেচ্ছং বিচুম্ব্য চিরং প্রিয়াম্।
ইহ হি শরদি ক্ষীবঃ পক্ষৌ বিধূয় মিলন্ মুদা
মদয়তি রহঃ কুঞ্জে মঞ্জুস্থলীমধি খঞ্জনঃ ॥

* এই শ্লোকটি যে 'গীতগোবিন্দ' হইতে গৃহীত, তাহা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

[১৩] ৩।৫।৪। ধর্মঃ ॥

যূপৈরুৎকটকণ্টকৈরিব মখপ্রোদ্ভূতধূমোদ্গমৈর্
অপ্যঙ্কংকরণৌষধৈরিব পদে নেত্রে চ জাতব্যথৈঃ।
যস্মিন্ ধর্মপরে প্রশাসতি তপঃসংভেদিনীং মেদিনীম্
আস্তামাক্রমিতুং বিলোকিতুমপি ব্যক্তং ন শক্তঃ কলিঃ ॥

[১৪] ৩।৯।৪। করঃ ॥

তেষামল্পতরঃ স কল্পবিটপী তেষাং ন চিন্তামণিশ্
চিন্তামপ্যুপয়াতি কামসুরভিস্তেষাং ন কামাস্পদম্।
দীনোদ্ধারধুরীণপুণ্যচরিতো যেষাং প্রসন্নো মনাক্
পাণিস্তে ধরণীন্দ্র সুন্দরযশঃ-সংরক্ষিণো দক্ষিণঃ ॥

[১৫] ৩।৯।৫। করঃ ॥

দেব ত্বৎকরপল্লবো বিজয়তামশ্রান্তবিশ্রাণন-
ক্রীড়াস্কন্দিতকল্পবৃক্ষবিভবঃ কীর্তিপ্রসূনোজ্জ্বলঃ।
যস্যোৎসর্গজলচ্ছলেন গলিতাঃ স্যন্দানদানোদক-
স্রোতোভির্বিদুষাং ললাটলিখিতা দৈন্যাক্ষরশ্রেণয়ঃ ॥

[১৬] ৩।১০।৪। চরণঃ ॥

লক্ষ্মীবিভ্রমপদ্মসুভগং কে নাম নোর্বীভুজো
দেব ত্বচ্চরণং ব্রজন্তি শরণং শ্রীরক্ষণাকাঙ্ক্ষিণঃ।
ছায়ায়ামনুগম্য সম্যগভয়াস্ত্বদ্বীর্য্যসূর্য্যাতপ-
ব্যাপ্তামপ্যবনীমটন্তি রিপবস্ত্যক্তাতপত্রাঃ সুখম্ ॥

[১৭] ৩।১১।৫। প্রিয়াবাখ্যানম্ ॥ (মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি) ॥

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ ! জঙ্গমহরে ! সংকল্পকল্পদ্রুম !
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ ! সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় ! বঙ্গপ্রিয় !
গৌড়েন্দ্র ! প্রতিরাজরাজক ! সভালংকার ! কর্ণার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল ! পালক সতাং ! দৃষ্টোঽসি, তুষ্টা বয়ম্ ॥

[১৮] ৩।১৫।৫। দেশাশ্রয়ঃ ॥ (মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি) ॥

"ত্বং চোলোল্লোললীলাং কলয়সি, কুরুষে কর্ষণং কুন্তলানাং ;
ত্বং কাঞ্চিন্ন্যঞ্চনায় প্রভবসি ! রভসাদঙ্গসঙ্গং করোষি।"

—ইত্থং রাজেন্দ্র ! বন্দিস্তুতিভিরুপহিতোৎকম্পমেবাস্থ দীর্ঘং
নারীণামপ্যরীণাং হৃদয়মুদয়তে ত্বৎপদারাধনায় ॥

[১৯] ৩।১৯।৫। বিক্রমঃ ॥

শিক্ষন্তে চাটুবাদান্ বিদধতি যবসানাননে কাননেষু
ভ্রাম্যন্তি জ্যাকিণাঙ্কং বিদধতি শিবিরং কুর্বতে পর্বতেযু।
অভ্যস্যন্তি প্রণামং ত্বয়ি চলতি চমূচক্রবিক্রান্তিভাজি
প্রাণত্রাণায় দেব ! ত্বদরিনৃপতয়শ্চক্রিরে কার্মণানি ॥

[২০] ৩।২০।৫। পৌরুষম্ ॥

ভীষ্মঃ ক্লীবকতাং দধার, সমিতি দ্রোণেন মুক্তং ধনুর্,
মিথ্যা ধর্মসুতেন জল্পিতমভূদ, দুর্যোধনো দুর্মদঃ।
ছিদ্রেষ্বেব ধনঞ্জয়স্য বিজয়ঃ, কর্ণঃ প্রমাদী ততঃ ;
শ্রীমন্নস্তি ন ভারতেঽপি ভবতো যঃ পৌরুষৈর্বর্ধতে ॥

[২১] ৩।২৩।৫। তেজঃ ॥

একং ধাম শমীষু লীনমপরং সূর্যোৎপলজ্যোতিষাং
ব্যাজাদদ্রিষু গূঢ়মন্যদুদধৌ সংগুপ্তমৌর্বায়তে।
ত্বত্তেজস্তপনাংশুমাংসলসমুত্তাপেন দুর্গং ভয়াদ্
বার্ক্ষং পার্বতমৌদকং যদি যযুস্তেজাংসি কিং পার্থিবাঃ ॥

[২২] ৩।২৯।৫। আশ্চর্যখড়্গঃ ॥

শ্রীখণ্ডমূর্তিঃ সরলাঙ্গযষ্টির্নাকন্দমামূলমহো বহন্তী।
শ্রীমন্ ! ভবৎখড়্গতমালবল্লী চিত্রং রণে শ্রীফলমাতনোতি ॥

[২৩] ৩।৩৪।৩। তূর্য্যধ্বনিঃ ॥

গুঞ্জৎ ক্রৌঞ্চনিকুঞ্জকুঞ্জরঘটাবিস্তীর্ণকর্ণজ্বরাঃ
প্রাক্প্রত্যগ্ধরণীন্দ্রকন্দরজরৎপারীন্দ্রনিদ্রাদ্রুহঃ।
লঙ্কাঙ্কত্রিককুৎপ্রতিধ্বনিঘনাঃ পর্য্যন্তযাত্রাজয়ে
যস্য ভ্রেমুরমন্দমন্দররবৈরাশারুধো ঘোষণাঃ ॥

[২৪] ৩।৩৪।৪। তূর্য্যধ্বনিঃ ॥ (অনুপ্রাস লক্ষণীয়) ॥

যস্যাবির্ভূতভীতিপ্রতিভটপৃতনাগর্ভিণীভ্রূণভার-
ভ্রংশভ্রেশাভিভূত্যৈ প্লবনমিব ভজন্নম্ভসাম্ভোনিধীনাম্।

সংভারং সংভ্রমস্য ত্রিভুবনমভিতো ভূভৃতাং বিভ্রদুচ্চৈঃ
সংরম্ভোজ্জৃম্ভণায় প্রতিরণমভবদ্ ভূরিভেরীনিনাদঃ ॥

[২৫] ৩।৩৪।৫। তূর্য্যধ্বনিঃ ॥

বিঘট্টয়ন্নেষ হঠাদকুণ্ঠবৈকুণ্ঠকণ্ঠীরবকণ্ঠগর্জাম্ ।
ভয়ংকরো দিক্‌করিণাং রণাগ্রে ভেরীরবো ভৈরবতুঃশ্রবস্তে ॥

[২৬] ৩।৩৮।৩ যুদ্ধম্ ॥

শত্রূণাং কালরাত্রৌ সমিতি সমুদিতে বাণবর্ষান্ধকারে
প্রাগ্‌ভারে খড়্গধারাং সরিতমিব সমুত্তীর্য্য মগ্নারিবংশাম্ ।
অন্যোন্যাঘাতমত্তদ্বিরদঘনঘটাদন্তবিদ্যুচ্ছটাভিঃ
পশ্যন্তীয়ং সমস্তাদভিসরতি মুদা সাংযুগীনং জয়শ্রীঃ ॥

[২৭] ৩।৩৯।৪। যুদ্ধস্থলী ॥

নির্যন্নারাচধারাচয়খচিতপতন্মত্তমাতঙ্গজাতং
জাতং যস্যারিসেনারুধিরজলনিধাবন্তরীপভ্রমায় ।
সুপ্তা যস্মিন্ রতান্তে সহ চ সহচরৈর্নালবন্নাগনাসা-
রন্ধ্রদ্বন্দ্বৈকপাত্রে রুধিরমধুরসং প্রেতকান্তাঃ পিবন্তি ॥

[২৮] ৩।৪০।৫। দিগ্বিজয়ঃ ॥

একঃ সংগ্রামরিঙ্গত্তুরগখুররজোরাজিভির্নষ্টদৃষ্টির্
দিগ্‌যাত্রাজৈত্রমত্তদ্বিরদভরণমদ্ভূমিভগ্নস্তথান্যঃ ।
বীরাঃ কে নাম তস্মাৎ ত্রিজগতি ন যযুঃ ক্ষীণতাং কাণকুব্জ-
ন্যায়াদ্ এতেন মুক্তাবভয়মভজতাং বাসবো বাসুকিশ্চ ॥

[২৯] ৩।৫২।৫। প্রশস্তকীর্তিঃ ॥

মলিনয়তি বৈরিবদনং সুজনং রঞ্জয়তি ধবলয়তি ধাত্রীম্ ।
অপি কুসুমবিশদমূর্তিযৎকীর্তিশ্চিত্রমাচরতি ॥

[৩০] ৫।১৬।৪। দিশঃ ॥

অস্তু স্বস্ত্যয়নায় দিগ্‌ধনপতেঃ কৈলাসশৈলাশ্রয়-
শ্রীকণ্ঠাভরণেন্দুবিভ্রমদিবানক্তং ভ্রমৎকৌমুদী ।
যত্রালং নলকূবরাভিসরণারম্ভায় রম্ভাস্ফুটৎ-
পাণ্ডিম্নেব তনোস্তনোতি বিরহব্যগ্রাপি বেশগ্রহম্ ॥

[৩১] ৫।১৮।২। বীরঃ ॥

ধাত্রীমেকাতপত্রাং সমিতি কৃতবতা চণ্ডদোর্দণ্ডদর্পাদ্
আস্থানে পাদনম্রপ্রতিভটমুকুটাদর্শবিম্বোদরেষু।
উৎক্ষিপ্তচ্ছত্রচিহ্নং প্রতিফলিতমপি স্বং বপুর্বীক্ষ্য কিঞ্চিৎ
সাসূয়ং যেন দৃষ্টাঃ ক্ষিতিতলবিলসন্ মৌলয়ো ভূমিপালাঃ ॥

জয়দেব যে কেবল শৃঙ্গার-রসের কবি ছিলেন না, অন্য রসও তাঁহার কাব্য-সরস্বতীর দ্বারা পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা উপরের শ্লোক কয়টি হইতে সুপরিস্ফুট হয়। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-ধৃত ৩১টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি 'গীতগোবিন্দ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিষয়-বস্তুর বিচার করিলে এইরূপ অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হয় যে, জয়দেব অন্যূন দুইখানি অন্য কাব্য লিখিয়া থাকিতেও পারেন—একখানি 'গীতগোবিন্দ'র-ই মতো শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক (উপরের ২, ৭, ৮ ও ১২ সংখ্যার শ্লোকগুলির বিষয়-বস্তু বিচার্য্য), এবং অপরখানি সম্ভবতঃ মহারাজ শ্রীলক্ষ্মণসেন-দেবের প্রশস্তি-বিষয়ক (উপরের ১৩—৩১ সংখ্যক শ্লোকগুলি এই দ্বিতীয় কাব্য হইয়া থাকিতে পারে)। লক্ষ্মণসেনের বীরত্বের খ্যাতি ছিল, যুদ্ধের জন্য তিনি দক্ষিণ-দেশেও গিয়াছিলেন, ধোয়ী-কবির 'পবন-দূত' কাব্যে এই দক্ষিণ-অভিযানের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে; ধোয়ীর ন্যায়, কিন্তু একটু অন্য ভাবে, সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া, সভাকবিদের মধ্যে অন্যতম জয়দেব-ও, পৃষ্ঠপোষক রাজার গুণগান করিয়া থাকিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন, অন্য কবিতাগুলি (১, ৪, ৫, এবং সম্ভবতঃ ১২ ও ১৩) জয়দেবের প্রকীর্ণ শ্লোক-রচনা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীধরদাসের জীবৎকালে জয়দেবের বিশেষ প্রতিষ্ঠা না হইয়া থাকিলে, তাঁহার লেখা এতগুলি শ্লোক শ্রীধরদাস নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া দিতেন না। ধোয়ীর 'পবন-দূত' হইতেও তিনি দুইটি শ্লোক দিয়াছেন।

শ্রীজয়দেবের কবি-খ্যাতি অতি শীঘ্রই সমগ্র ভারত-খণ্ডে বিস্তৃত হয়। অনুমান হয়, তাঁহার 'গীতগোবিন্দ', ঐ যুগের সংস্কৃত-ভাষার কবি, এবং উদীয়মান আধুনিক-ভাষাগুলির কবি, উভয় দলেরই প্রিয় হইয়াছিল, কারণ ইহাতে প্রাচীন সংস্কৃত রচনাশৈলীর সঙ্গে অপভ্রংশ এবং নবোদ্ভূত ভাষা রচনাশৈলী, এই উভয়ের গঙ্গা-যমুনা-সংগম ঘটিয়াছিল। একান্ত মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে দেবকাহিনী ও প্রেমগাথা ভক্তিমার্গের সাধন-রূপে হিন্দু

সাংস্কৃতিক জাগরণের সেবায় মিলিত হয়। 'গীতগোবিন্দ'-রচনার শতবর্ষ-মধ্যে সুদূর গুজরাটে পাটন বা অণহিলবাড়া নগরে প্রাপ্ত সংবৎ ১৩৪৮ (অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১২৯২) তারিখের এক সংস্কৃত লেখের মঙ্গলাচরণ শ্লোক-রূপে ইহা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল (মনোমোহন চক্রবর্তী-লিখিত পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় যেমন, তেমনি গুজরাট ও রাজপুতানায়, এবং উত্তর-পঞ্জাবের গিরিদেশে ও উত্তর-ভারতের বিশাল সমতল ভূভাগে, সর্বত্র 'গীতগোবিন্দ' জনপ্রিয় কাব্য হইয়া উঠে। 'গীতগোবিন্দ' হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাংশ ও বাক্যাংশ এবং উহার ভাব ও আশয় প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা উড়িয়া হিন্দী ও গুজরাটী কাব্যে ও কবিতায় প্রযুক্ত হইতে থাকে। মধ্য-যুগের বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান কবি, এবং তুর্কী-বিজয়ের পরে সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশের প্রথম বড়ো কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস (? আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গীতগোবিন্দের দুইটি সংগীতের অনুবাদ দিয়াছেন, এবং বহু স্থানে তাঁহার রচনাতে গীত-গোবিন্দের ছায়া পড়িয়াছে। সুপরিচিত প্রাচীন গুজরাটী কাব্য 'বসন্ত-বিলাস' (এক মতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, অন্য মতে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে) পাঠে দেখা যায়, ইহাতেও বহু স্থলে গীতগোবিন্দের ভাব পরিস্ফুট, এবং ভাষাও অনুকৃত বা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের প্রায় ৩৭খানি বিভিন্ন টীকা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রচিত হইয়াছিল; মেবাড-পতি মহারাণা কুম্ভের নামে প্রচলিত 'রসিকপ্রিয়া' টীকাখানি এগুলির মধ্যে একখানি প্রাচীন টীকা (মহারাণার রাজ্যকাল, ১৪৩৩-১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দ); গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষার অন্যতম বহুলটীকাময় গ্রন্থ। অন্ততঃ খান বারো বিভিন্ন সংস্কৃত-কাব্য গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত হয়; ইহা ভিন্ন গীতগোবিন্দের ধরনে লিখিত ভাষা-কাব্যও কতকগুলি আছে। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে খ্রীষ্টীয় ১৪৯৯ অব্দে উৎকীর্ণ একটি উড়িয়া লেখ হইতে জানা যায় যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞানুসারে ঐ সময় হইতে 'গীতগোবিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনও রচনা হইতে শ্লোক ও গান পুরীর মন্দিরে দেবদাসী ও অন্য গায়কগণ কর্তৃক গীত হওয়া নিষিদ্ধ হয়। (দ্রষ্টব্য, মনোমোহন চক্রবর্তী-লিখিত প্রবন্ধ, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, 1893, পৃঃ ৯৬-৯৭)। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের চিত্র-শিল্পে, বিষয়-বস্তু হিসাবে গীতগোবিন্দের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের "অপভ্রংশ" (অথবা তথাকথিত "প্রাচীন গুজরাটী")

এবং "প্রাচীন-হিন্দী" (অথবা "প্রাচীন-রাজপুত") শিল্পে, এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড, বসোহলী, কাঙ্গড়া প্রভৃতি স্থানের "অর্বাচীন-হিন্দী" চিত্ররীতিতে, ও উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা দেশ, নেপাল ও অন্ধ্রদেশের চিত্র-রীতিতে, গীতগোবিন্দের অনুসারী রাধাকৃষ্ণ-লীলার ছবি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও পরবর্তী যুগের অপভ্রংশ ও ভাষা কাব্য এই উভয়ের ধারা মিলিত হইয়াছে। এই কাব্যের ১২টি সর্গে ২৪টি 'পদ' বা গান গ্রথিত হইয়াছে। কাব্যের বর্ণনামূলক অংশ, প্রাচীন ধারার সংস্কৃত কবিতায় লেখা; ভাবে, ভাষায়, শব্দাবলীতে এই অংশগুলি অতীতের রীতি বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু পদ বা গানগুলিতে যে বাতাবরণ পাই, তাহা হইতেছে অপভ্রংশ ও ভাষা সাহিত্যের। পদগুলির ছন্দ, সংস্কৃতের অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ নহে—অপভ্রংশ ও ভাষার মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ; এবং অপভ্রংশ ও ভাষা কবিতার মতো, ছত্রের অন্ত্য ও আভ্যন্তর অক্ষরের মিল ইহার প্রাণ। একাধিক পণ্ডিত এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতগোবিন্দের পদগুলি মূলতঃ সংস্কৃতে রচিত হয় নাই, এগুলি রচিত হইয়াছিল হয় অপভ্রংশে না হয় প্রাচীন যুগের নব্য-আর্য্য ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায় (Lassen লাসেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদারের এই মত)। ইহা অসম্ভব নয় যে, জয়দেব এই গানগুলি প্রথম অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় রচনা করেন, পরে এগুলি বিশেষ লোকপ্রিয় হয়, ইহাতে জয়দেব স্বয়ং এগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দেন, এবং এইভাবে এগুলিকে নিখিল ভারতের আস্বাদনের উপযোগী করিয়া ও চিরন্তন করিয়া দেন। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, এইরূপ মতবাদ কেবল অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত মাত্র, ইহা প্রমাণিত সত্য নহে। অনুমানের স্বপক্ষে এই চারিটি বস্তু বিচার্য্য :—

(১) পদগুলির ধরণ—এগুলির রচনাশৈলী অপভ্রংশ ও ভাষাপদের অনুরূপ, সংস্কৃত কবিতার অনুরূপ নহে। অপভ্রংশানুকারিতা সর্বজন-স্বীকৃত।

(২) জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদের অনুরূপ সমসাময়িক বহু অপভ্রংশ ও প্রাচীন নব্য-আর্য্য ভাষার গীত বা পদের অস্তিত্ব (যেমন 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' ও 'মানসোল্লাস' অথবা 'অভিলষিতার্থ-চিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থে)।

(৩) গীতগোবিন্দের কতকগুলি পদের দুই চারিটি করিয়া ছত্র যদি সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশে রূপান্তরিত করিয়া পাঠ করা যায়, তাহা হইলে সেগুলির

ছন্দের গতি আরও সাবলীল হয়। অপভ্রংশ বা পুরাতন বাঙ্গালা রূপে ভাঙ্গিয়া লইয়া এগুলিকে পাঠ করিলে, প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত ছন্দ বিষয়ে চমৎকার মিল দেখা যায়। (যেমন ৫ সংখ্যক পদে—"স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্", এই ছত্রটিকে অপভ্রংশ করিয়া "সুমরই। মণ মর̐। কিঅ-পরিহাসং" রূপে পড়িলেই, নিখুঁত পয়ারের মতো অক্ষরের সমাবেশ যুক্ত ছত্র পাওয়া যায়, যথা : ◡ ◡ ◡ ◡ । ◡ ◡ ◡ ◡ ॥ ◡ ◡ ◡ ◡ । — — ॥ ; "শ্রীজয়দেব-কবেরিদং। কুরুতে মুদং। মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি"—২-এর পদের এই ছত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে একটি করিয়া মাত্রা বেশী আছে, যদি "ইদং" ও "মুদং"-কে অপ্রভ্রংশ-মতে "ইদঁ" ও "মুদঁ" পড়া যায়, তাহা হইলে ছন্দো-দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। এই-সমস্ত ছন্দের বাঙ্গালা-আসামী-উড়িয়া ও ভোজপুরী-মগহী-মৈথিল প্রতিরূপ আছে, কিন্তু এগুলির প্রতিরূপ বা অনুরূপ ছন্দ প্রাচীন সংস্কৃতে নাই।

(৪) শেষ বিচার্য, 'গীতগোবিন্দ' বইখানি কাব্য হইলেও, ইহার মধ্যে নাটকীয় অংশ বিদ্যমান। পদগুলি রাধার সখীদের অথবা স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের গীত, যেন এগুলি নাটকে তাঁদেরই উক্তি-প্রত্যুক্তি। আমাদের যাত্রা-গানের উদ্ভবে 'গীতগোবিন্দ'-জাতীয় রচনার একটা বড়ো স্থান ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই; এই যাত্রা-গানেরই পূর্ব রূপ হইতেছে মধ্য-বাঙ্গালার পালা-গান; ইহাতে একাধারে বর্ণনাত্মক অংশ ও পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন থাকে (পালা-গানে মূল গায়েন ও তাঁহার দোহারেরা নাটকীয় আলাপ অংশ চালাইতেন)। অপর পক্ষে, 'গীতগোবিন্দ' মিথিলাতে প্রচলিত এক ধরনের নাটকের ধারার সঙ্গেও বিজড়িত বলিয়া মনে হয়—এইরূপ নাটকে সংস্কৃত বা প্রাকৃত গদ্যে পাত্র-পাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে, সংস্কৃত নাটকে যেখানে বিভিন্ন ছন্দে সংস্কৃত ব্যবহৃত হয়, সেখানে দেশভাষা মৈথিলে পদ বা গান থাকে। স্যর্ জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়র্সন্ সাহেব এইরূপ কতকগুলি নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 'পারিজাত-হরণ' নামে উমাপতি উপাধ্যায় কর্তৃক ১৪শ শতকে রচিত একখানি নাটক তিনি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত-ও করিয়াছেন। এইরূপ নাটক-রচনার ধারা মিথিলা (এবং বঙ্গদেশ) হইতে নেপালে প্রসারিত হয়, এবং সতেরর শতক হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি এইরূপ নাটক নেপালে পাওয়া গিয়াছে—এই-সব নাটকে গদ্য অংশ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গালা বা মৈথিলে (সংস্কৃতের পরিবর্তে), এবং পদ্যশ্লোকের স্থানে মৈথিল বা কোসলীতে (অথবা পূর্বী-হিন্দীতে)

পদ বা গান আছে, নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কার্য্য-কলাপ (প্রবেশ, নির্গমন, উপবেশন ইত্যাদি) পূর্ব-নেপালের প্রাচীন ভাষা, ভোট-ব্রহ্ম শাখার অনার্য্য মোঙ্গোলীয় ভাষা নেরারী বা নেওয়ারীতে লিপি-বদ্ধ আছে। এই-সব নাটক দেখিয়া অনুমান হয়, হয়-তো 'গীতগোবিন্দ' ভাষায় বা অপভ্রংশে (সংস্কৃতেতর লঘু ভাষাতে) নিবদ্ধ কথোপকথনাত্মক পদ বা গান এবং সংস্কৃতে নিবদ্ধ বর্ণনাত্মক অংশ লইয়া গঠিত গীতি-নাট্যের একটি ধারার অন্তর্গত ছিল, যে ধারা পূর্ব-ভারতে বিশেষ করিয়া প্রচলিত ছিল। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে বর্ণনাত্মক অংশ আছে, কথোপকথন-ও আছে। এই কথোপকথনে দুই বা তিন পাত্রপাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি বা কথা-কাটাকাটি পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে এইরূপ নব্য-আর্য্য ভাষার বা অপভ্রংশের পদকে সংস্কৃত ভাষায় আনিয়া ইহার আকৃতি একটু বদলাইয়া দেওয়া হয় মাত্র; কিন্তু এই পরিবর্তিত আকারে ইহার প্রসার ও প্রভাব আরও ব্যাপক হইয়া পড়ে। রামানন্দ রায় কর্তৃক এই সংস্কৃতময় গীতগোবিন্দের অনুকরণে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামে সংগীত-নাটক রচিত হইয়াছিল। ভাষা (বা অপভ্রংশে) পদময় "সংগীত-নাটক" বা কাব্য-নাট্যের ধারা বিচার করিলে, 'গীতগোবিন্দ'কে ঐ পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

জয়দেব-রচিত বীররসাত্মক অন্য সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে অনুমানের অনুকূলে প্রমাণ যে আছে, 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-ধৃত শ্লোকাবলী হইতে তাহা দেখা যায়। সেরূপ কোনও কাব্য থাকিলে, তাহা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জয়দেব ক্রমে-ক্রমে বৈষ্ণব সাধক ও ভক্তগণের পর্য্যায়ে নীত হইলেন, তাঁহার গীতগোবিন্দের কল্যাণে। 'গীতগোবিন্দ' কার ভক্ত জয়দেব ভাষাতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন, এই ধারণা উত্তর-ভারতের সন্ত বা ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবে জয়দেব উত্তর-ভারতের প্রধান ভক্ত ও সাধুদের মধ্যে পরিগণিত হন। শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু শ্রীগুরু অর্জুনদেব মধ্য-যুগের উত্তর-ভারতের ভক্তগণের পদ-সংগ্রহের ঋগ্বেদ-স্বরূপ 'শ্রীগুরু-গ্রন্থ' বা 'শ্রী-আদি-গ্রন্থ' বা 'শ্রীগ্রন্থ-সাহেব' খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে যখন সংকলিত করেন, তখন তিনি সাধকদের পদ (তাঁহার পূর্বগামী চারিজন শিখ গুরু ও তাঁহার নিজের রচিত ভিন্ন) যাহা হাতের কাছে পান, তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। সন্ত কবীরের বহু পদ এই ভাবে গুরু-গ্রন্থে গৃহীত হয়; রবিদাস,

বাবা ফরীদ, রামানন্দ, মহারাষ্ট্রের ভক্ত নামদেব, এবং বাঙ্গালার জয়দেব,—অন্য কয়জন ভক্তের পদের সঙ্গে-সঙ্গে ইঁহাদেরও পদ গুরু-গ্রন্থে স্থান পায়। জয়দেবের রচিত বলিয়া দুইটি পদ গুরু-গ্রন্থে আছে। এই দুইটির ভণিতায় জয়দেবের নাম আছে। পদ দুইটি যে 'গীতগোবিন্দ'-কার জয়দেবের রচিত, তৎসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ নাই; তবে সেগুলি যে জয়দেবের নহে, সে পক্ষেও প্রমাণ নাই। শিখ গুরু-পরম্পরা অনুসারে গুরু-গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই দুই পদের রচয়িতা রূপে 'ভক্তমাল'-গ্রন্থ-বর্ণিত গীতগোবিন্দ-কার ভক্ত কবি জয়দেবকেই স্বীকার করা হয়। গ্রন্থ-সাহেবের জয়দেব ও গীতগোবিন্দের জয়দেব এক হইলে,—এবং এক বলিয়া মানিয়া লইতে কোনও অন্তরায় নাই—তাঁহাকে ভাষা-সাহিত্যের একজন আদি কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হয় (গীতগোবিন্দের পদ-কয়টির মূল ভাষার প্রশ্ন না ধরিলেও)।

গুরুগ্রন্থ-ধৃত পদ দুইটি "রাগ গুজরী" ও "রাগ মারু"-র অন্তর্গত। M. A. Macauliffe-রচিত শিখ-ধর্ম-বিষয়ক সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ১৫-১৭ পৃষ্ঠায় এই দুইটি পদের ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে এই পদ দুইটির বিচার করা যাইতেছে।

[১] শ্রীজৈদেব-জীউ-কা পদা (রাগ গুজরী) ॥

পরমাদি পুরুখ মনোপিমং সতি আদি ভাব-রতং।
পরমদ্ভুতং পরক্রিতিপরং জদি চিন্তি সরব-গতং ॥১॥
রহাউ—
কেবল রামনাম মনোরমং বদি অম্রিত-তত-মঈঅং।
ন দনোতি জনমরণেন জনম-জরাধি-মরণ-ভইঅং ॥
ইছসি জমাদি-পরাভয়ং জস্থ স্বসতি স্থক্রিতি-ক্রিতং।
ভব-ভূত-ভাব সমব্যিঅং পরমং পরসন্নমিদং ॥২॥
লোভাদি-দ্রিসটি পরগ্রিহং জদি বিধি আচরণং।
তজি সকল দুহক্রিত দুরমতী ভজু চক্রধর-সরণং ॥৩॥
হরি-ভগত নিজ নিহকেবলা রিদ করমণা বচসা।
জোগেন কিং জগেন কিং দানেন কিং তপসা ॥৪॥
গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপি নর সকল-সিধি-পদং।
জৈদেব আইউ তস সফুটং ভব ভূত-সরব-গতং ॥৫॥

এই পদটি E. Trumpp কর্তৃক ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে Munich ম্যুনিক নগরের বাভারীয় রাজকীয় বিজ্ঞান-পরিষদের দর্শন-সাহিত্যেতিহাস শাখার কার্য্যবিবরণীতে জর্‌মান ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহার ভাষা বিকৃত সংস্কৃত, কেবল মাঝে-মাঝে (বিশেষতঃ শেষ শ্লোকে) ভাষা বা অপভ্রংশের শব্দ দুই চারিটি আছে। পদটি মূলে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া থাকিতে পারে, পরে ইহার সংস্কৃতীকরণের চেষ্টা হয় ; এই সংস্কৃত রূপান্তরে যে বাঙ্গালাদেশের (অথবা পূর্ব-ভারতের) উচ্চারণ অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হয়। অসম্পূর্ণ গুরুমুখী বর্ণমালায় নীত হওয়ার কালে আরও বিকৃতি ঘটে। এই পদের সংস্কৃত ছায়া এইরূপ হইবে—

পরমাদিপুরুষম্ অনুপমং সদ্-আদি-ভাবরতম্।
পরমাদ্ভুতম্ প্রকৃতিপরং যদ্ (=যম্) অচিন্ত্যং সর্বগতম্॥ ১॥
রহাউ (=ধুয়া)—
কেবলং রামনাম মনোরমং বদ অমৃত-তত্ত্বময়ম্।
ন দুনোতি যৎস্মরণেন জন্ম-জরাধিমরণভয়ম্॥
ইচ্ছসি যমাদিপরাভবং, যশঃ, স্বস্তি, সুকৃর্ত-কৃতং (=সুকৃতং কুরু?)।
ভবভূত ভাব-সমব্যয়ম্ পরমম্ প্রসন্নম্ ইদম্ (অথবা
মিদ, মিদু=মৃদু=মৃদু? Trumpp-এর ব্যাখ্যা)।
লোভাদি-দৃষ্টি-পরগৃহং যদ্ অবিধি-আচরণম্।
ত্যজ সকল-দুষ্কৃতং দুর্মতিম্, ভজ চক্রধর-শরণম্॥
হরিভক্তিঃ নিজা নিষ্কেবলা—হৃদা কর্মণা বচসা।
যোগেন কিং, যজ্ঞেন কিং, দানেন কিং, [কিং] তপসা॥
গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপ, নর, সকল-সিদ্ধি-পদম্।
জয়দেবঃ আয়াতঃ তস্য স্ফুটম্—ভব-ভূত-সর্ব-গতম্॥

পদটির সাধারণ অর্থ গ্রহণে কোনও কঠিনতা নাই, যদিও ভাব ও ভাষা উভয়ের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য স্থলে-স্থলে বিদ্যমান। এই ভাব-সমূহের অসামঞ্জস্য এবং ভাষার আড়ষ্টতা দেখিয়া এই পদের মূল রূপকে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়। ভাষা এখানে ভাবের সম্পূর্ণ অনুগামী নয়।

[২] বাণী জৈদেবজীউ-কী (রাগ মারূ)॥

চন্দ সত ভেদিয়া নাদ সত পূরিয়া সূর সত খোডসা দত্তু কীয়া।
অচল বল তোড়িয়া অচল চল থপ্পিয়া অঘড ঘড়িয়া, তহা আপিউ পীয়া॥১॥

মন আদি গুণ আদি বখাণিয়া।
তেরী তুবিধা দ্রিস্‌টি সম্মানিয়া ॥ রহাউ ॥
অর্ধ-কৌ অরধিয়া সর্ধি-কৌ সরধিয়া, সলল-কৌ সলিল সম্মানি আয়া।
বদতি ঐজদের জৈদের-কৌ রম্মিয়া, ব্রহ্ম-নির্বাণ লিব লীণ পায়া ॥ ২ ॥

এই পদটির ভাষা ঠিক অপভ্রংশ নহে, ইহাকে মিশ্র-অপভ্রংশ ভাষা বলা যাইতে পারে; হয়-তো ইহা মূলে প্রাচীন বাঙ্গালা ছিল। এখানেও সংস্কৃত (অর্ধ-তৎসম) শব্দগুলির বানান, প্রাচ্য-ভারতের সংস্কৃত উচ্চারণের অনুসারী। E. Trumpp এই পদটির অনুবাদ করেন নাই—তাঁহার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ-সাহেবের অনুবাদেও ইহা নাই। Macauliffe-এর অনুবাদ ও ভাঈ বিসন সিংহ গ্যানী রচিত পাঞ্জাবী ভাষা টীকা "ভগত-বানী" অনুসরণ করিয়া এই পদের বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

চন্দ্রকে (অর্থাৎ ঈড়া বা বাম নাসারন্ধ্রকে) সত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বারা ভেদ করিয়াছি [অর্থাৎ আমি প্রাণায়ামের পূরক করিয়াছি]; সত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বারা নাদ (অর্থাৎ সুষুম্না, অর্থাৎ নাসিকার ভিতর তুই নাসারন্ধ্রের উপরিভাগের মধ্যস্থ স্থান) পূরিয়াছি [অর্থাৎ কুম্ভক-যোগ করিয়াছি]; সত্ত্ব বা প্রাণবায়ুকে সূর (অর্থাৎ সূর্য্য, বা পিঙ্গলা নামে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র) দ্বারা আমি বাহির করিয়া দিয়াছি ("দত্ত্‌ কীয়া"=দত্ত করিয়াছি) [অর্থাৎ আমি রেচক দ্বারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম পূর্ণ করিয়াছি]—ষোল বার ("খোড়সা", অর্থাৎ প্রত্যেক পূরক, কুম্ভক ও রেচক কালে ষোড়শ বার প্রণব বা ওঁ-কার উচ্চারণ করিয়া এইভাবে প্রাণায়াম করিয়াছি)।

অবল বা বলহীন (যে এই ভঙ্গুর দেহপিণ্ড), ইহার বল ভগ্ন করা হইয়াছে ("তোড়িয়া"=তোড়া হইয়াছে); চল অর্থাৎ চঞ্চল (যে মন, তাহাকে) অচলে (অর্থাৎ অব্যয় ব্রহ্মে) স্থাপিত করা হইয়াছে; অঘটিত (মন)-কে ঘটিত বা সুগঠিত করা হইয়াছে; তদনন্তর অমৃত (আপিউ=অপ্পিউ=অব্বিউ=অম্বিউ=অম্ব্রি‌অ=অম্ব্রিত=অম্রিত=অমৃত) পীত হইয়াছে ॥ ১ ॥

(যে ব্রহ্ম) মনেরও আদিতে, এবং (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন্‌) গুণেরও আদিতে, তাহার ব্যাখান করিয়াছি। তোমার দ্বিবিধা দৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ দর্শন) অবলুপ্ত হইয়াছে (সম্মানিয়া=সামাইয়া গিয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে) ॥ ধুয়া ॥

আরাধ্যকে আরাধিত করা হইয়াছে; শ্রদ্ধীকে (বা শ্রদ্ধার পাত্রকে) শ্রদ্ধা করা হইয়াছে; সলিলকে সলিলে প্রবেশ করানো হইয়াছে (সামানো হইয়াছে)। জয়দেব বলে—জয়যুক্ত দেবে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে) রমণ করা হইয়াছে; ব্রহ্মনির্বাণ লইয়া ("লিব"), আমি লীন পাইয়াছি (=লীন হইয়া গিয়াছি) ॥ ২ ॥

জয়দেবের এই "বাণী" বা ভাষা-পদটি হইতেছে যোগমার্গের পদ—খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর ওদিকে এবং এদিকে সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, এই যোগ-সাধনের কথায় ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক কথার সাহিত্য, ভরপুর। ধর্ম-সাধনার পথে, ভক্তি-মার্গ ও যোগ-মার্গ এই দুই পথ অপক্ষপাতের সহিত প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়েরই উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল; খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর পূর্ব হইতেই যোগ-সাধনের কথা—ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মলীন হওয়ার কথা, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী ধর্মমতের কথা। যোগ-মার্গের কথা ওদিকে যেমন মহাযান বৌদ্ধমতের সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত (প্রাচীন বাঙ্গালা 'চর্য্যাপদ' হইতে ইহা দেখা যায়), তেমনি এদিকে নাথ-পন্থ প্রভৃতি শৈব-সম্প্রদায়ে, কবীর-প্রমুখ সন্ত বা নবীন মতের সাধুদের সম্প্রদায়ে, শিখ সম্প্রদায়ে এবং বৈষ্ণবাদি ভক্তিবাদী অন্য সম্প্রদায়েও অল্প-বিস্তর প্রবল-ভাবে বিদ্যমান। জয়দেব, পরবর্তী কালের রামাওতী, গৌড়ীয়, বল্লভাচারী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধরনের বৈষ্ণব ছিলেন না—তিনি সম্ভবতঃ পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ-ই ছিলেন। তাঁহার রচিত পদে পূরক-কুম্ভক-রেচক সাধন ও ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করার কথা থাকা কিছু বিচিত্র নহে।

উত্তর-ভারতের ভাষা-সাহিত্যের উপর জয়দেব সাধারণ ভাবে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিশেষ ভাবে তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টা এবং প্রাণ-দাতা বলিতে পারা যায়। জয়দেব বাঙ্গালার আদি কবি চর্য্যাপদ-রচয়িতা বৌদ্ধ কবিদের সমসাময়িক ছিলেন। গীতগোবিন্দের গানগুলিকে উক্ত গ্রন্থে "গীত" বলা হইয়াছে, অন্যত্র এগুলি "পদ" নামে প্রচলিত। শিখদের আদি-গ্রন্থেও জয়দেবের একটি গানকে "পদা" অর্থাৎ "পদ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; জয়দেব নিজেও এগুলিকে "পদ" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন—"মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্", 'গীতগোবিন্দ', ১।৩। উপস্থিত সংস্কৃত-ভাষা-গ্রথিত রূপে এই গীত বা পদগুলি

মিলিলেও, বৌদ্ধ চর্য্যাপদের মতো গীতগোবিন্দের এই পদগুলিকেও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের আদিতে স্থান দিতে হয়। জয়দেবোত্তর মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটি মুখ্য ধারা দেখিতে পাওয়া যায়; একটি, কথাত্মক কাব্যের ধারা, ইহাতে কোনও দেবতা বা অবতার অথবা ঐতিহাসিক বা অন্যবিধ মহাপুরুষের কাহিনী বা জীবনী বিবৃত থাকে; এই প্রকার কথাত্মক কাব্যকে "মঙ্গল-কাব্য" বা "মঙ্গল" বলা হইত। মঙ্গল-কাব্যে নিখিল-ভারতীয় পৌরাণিক দেবতা বা অবতারকে লইয়া কথা রচিত হইত—যেমন শিব, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র; অথবা কেবল গৌড়-বঙ্গে প্রসিদ্ধ দেবতা বা পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইত—যেমন ধর্মঠাকুর ও লাউসেন, মনসা ও চাঁদ সদাগর এবং লখিন্দর-বেহুলা, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর, কালকেতু ব্যাধ ও ফুল্লরা; অথবা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ও ক্বচিৎ অন্য সম্প্রদায়ের পূত-চরিত্র সাধক বা ভক্তের জীবনী লইয়া রচিত হইত। দ্বিতীয় ধারাটি গীতাত্মক; এই ধারায় পাওয়া যায় কেবল ধর্ম-সম্বন্ধীয় অথবা ধর্মাশ্রয়ী বা লীলাশ্রয়ী শৃঙ্গার রসের, কিংবা পার্থিব প্রেমের গান; এই গানের ধারাকে "পদ" বলা হইত। বৌদ্ধ চর্য্যাপদ, বৈষ্ণব মহাজন-পদ, সহজিয়া পদ, দেহতত্ত্বের গান, রামপ্রসাদ-প্রমুখ শাক্ত সাধকদের পদ, শ্যামাসংগীত, বাউলের গান, মুসলমান মারফতী গান, প্রভৃতি বাঙ্গালা-সাহিত্যের গীতির বিভিন্ন ধারা, এই পদ-সাহিত্যেরই অন্তর্গত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ-স্থ পদাবলী মধ্য-যুগের বাঙ্গালা পদ-সাহিত্যের সূত্রপাত-স্বরূপ—চর্য্যাপদের চেয়েও জয়দেবের পদগুলি বাঙ্গালা পদ-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী বৈষ্ণব পদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিধু-বাবু প্রভৃতি প্রাচীন ধারার কবিদের প্রেমের গান,—জয়দেবের পদেই এই গীত-গঙ্গার গঙ্গোত্তরী মিলিতেছে। অপর, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কথা-কাব্যও বটে; সেই হিসাবে ইহা একটি "মঙ্গল-কাব্য"; একাধারে "পদ" ও "মঙ্গল", উভয় ধারা গীতগোবিন্দে বিদ্যমান। সংস্কৃত-শ্লোক-নিবদ্ধ হইলেও, ইহার স্থান একদিকে বাঙ্গালা মঙ্গল-কাব্যের পর্যায়ে; তেমনি ইহার গানগুলি হইতেছে "পদাবলী" বা পদ-সংগ্রহ। জয়দেব স্বয়ং "মঙ্গল" অর্থাৎ "মঙ্গল-কাব্য" বলিয়া ইহার বর্ণনাও করিয়াছেন—"শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলম্ উজ্জ্বল-গীতি", অর্থাৎ "শ্রীজয়দেব কবির রচিত উজ্জ্বল-রসের অর্থাৎ প্রেমের গীতিময় এই মঙ্গল-কাব্য আনন্দ দান করে।" সুতরাং স্বদেশে, এবং স্বদেশ-ভাষার সাহিত্যের দুইটি মুখ্য ধারার অগ্রণী বলিয়া, জয়দেব কবির প্রতিষ্ঠার কারণ সহজেই প্রণিধান করা যাইতে পারে।

যদিও গীতগোবিন্দের পদাবলীর সম্ভাব্য অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ মিলিতেছে না, এবং যদিও 'আদি-গ্রন্থ'-ধৃত দুইটি মিশ্র-ভাষা সংস্কৃত ও ভাষাময় পদের সহিত আমাদের জয়দেবের সংযোগ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি তাঁহাকে আমরা নবীনের আবাহন-কর্তা, মধ্য-যুগের বাঙ্গালা মঙ্গল ও পদের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে, বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া মর্য্যাদার আসন দিতে পারি ; যেমন তিনি ছিলেন প্রাচীন ধারার, মুসলমান-পূর্ব যুগের সংস্কৃতের অন্তিম মহাকবি। সংস্কৃত ও ভাষা, উভয় প্রকার সাহিত্যে জয়দেবের বিরাট্ প্রভাবের কথা মনে করিয়া, এবং মধ্য-যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি যে একজন 'মহাজন' অর্থাৎ ভক্ত কবি বলিয়া বিরাজমান সে কথাও স্মরণ করিয়া, নাভাজীদাস ষোড়শ শতকে তাঁহার 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে ব্রজভাষা-নিবদ্ধ পদে জয়দেবের যে প্রশস্তি গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা সুন্দর ও সার্থক—

জয়দেব কবি নৃপচক্কবৈ, খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥
প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীত-গোবিন্দ উজাগর।
কোক-কাব্য-নবরস-সরস-শৃঙ্গার-কৌ আগর ॥
অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ।
রাধা-রমন প্রসন্ন সুনত হাঁ নিশ্চৈ আবৈ ॥
সন্ত-সরোরুহ-খণ্ড-কৌ পদুমাবতি-সুখ-জনক রবি।
জয়দেবকবি নৃপ-চক্কৈব, খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥

কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর (=ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের প্রভু) মাত্র। তিন লোকে 'গীতগোবিন্দ' প্রচুর ভাবে উজ্জ্বল (উজ্জাগর) হইয়াছে। (ইহা) কোকশাস্ত্র (কামশাস্ত্র), কাব্য, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার-স্বরূপ। যে (গীতগোবিন্দের) অষ্টপদী (=গীত) অভ্যাস করে, তাহার বুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধারমণ প্রসন্ন হইয়া শুনেন, তিনি নিশ্চয় সেখানে আগমন করেন। সন্ত(ভক্ত)-রূপ কমল-দলের পক্ষে (তিনি) পদ্মাবতী-সুখ-জনক রবি। কবি জয়দেব চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর মাত্র ॥

ভারতবর্ষ
শ্রাবণ ১৩৫০

'সদুক্তিকর্ণামৃত'

ও

বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

এক হাজার বছর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রচনা যাহা এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতেছে নেপালে রক্ষিত প্রাচীন পুথিতে নিবদ্ধ ও ১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৭টি বৌদ্ধ চর্য্যাপদ। এগুলির রচনা-কাল আনুমানিক ৯৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার পূর্বে, "বাঙ্গালা ভাষা" বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার কোনও নিদর্শন মিলিতেছে না। বাঙ্গালা দেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার কিছু পূর্বে বাঙ্গালা ভাষা তাহার বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। বাঙ্গালা ভাষা যখন সৃজ্যমান, মগধ হইতে আগত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যখন ধীরে-ধীরে পরিবর্তিত হইয়া খ্রীষ্টীয় ৮০০-১২০০-র মধ্যে বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিতেছে, তখন ও তাহার পূর্বেও অবশ্য বাঙ্গালা দেশের লোকেরা কবিতা রচনা করিত, পদ্য-বন্ধ করিত, অর্থাৎ গান বাঁধিত। সে সব গান কী ভাষায় রচিত হইত? নিশ্চয়ই তখনকার দিনে প্রচলিত সাহিত্যের ভাষায়, এবং কতকটা লোকমুখে প্রচলিত মৌখিক ভাষায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার রূপ লইয়া দানা বাঁধিবার পূর্বেকার তরল অবস্থার গৌড়-বঙ্গ অপভ্রংশে। গৌড়-বঙ্গে প্রচলিত এই অপভ্রংশ যখন মৌখিক বা কথ্য ভাষা মাত্র ছিল, তখন ইহাতে কেহ কবিতা বা পদ রচনা করিলে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা ছিল না; এবং এই কথ্য ভাষায় রচিত কোনও গান বা পদ বা শ্লোক এখনও পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালা-ভাষার প্রতিষ্ঠার পূর্বে, সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে বাঙ্গালা-দেশে প্রচলিত ছিল এই কয়টি ভাষা—(১) সংস্কৃত, (২) বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত, এবং (৩) পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপভ্রংশ। সংস্কৃত ভাষা তখনকার দিনের শিক্ষিত লোকের ভাষা ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে (এবং ভারতের বাহিরে বৃহত্তর-ভারতের নানা দেশেও) আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইহার প্রচলন ছিল, বর্ণজ্ঞানযুক্ত লোক তখন সকলেই অল্প-বিস্তর সংস্কৃত জানিত; আর্য্যভাষা-ভাষী উত্তর-ভারতে সংস্কৃত ও বিভিন্ন লোক-ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তাহা তখনকার দিনে খুব বেশি বলিয়া লোকে মনে করিত না; লোকের মনে সাধারণতঃ এই ধারণা ছিল

যে, প্রাকৃত ও লোক-ভাষার শুদ্ধ ও 'সংস্কৃত' রূপ-ই হইতেছে সংস্কৃত-ভাষা; এই ধারণায় কিছু ভুল ছিল না। চলিত বা কথ্য ভাষার শুদ্ধ, ব্যাকরণ সংগত 'পাঠ' বা রূপ বলিয়া সংস্কৃতের আদর ও প্রচলন সর্বত্র ছিল; এবং শিক্ষিত লোক-মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা ছিল, শুদ্ধ সংস্কৃতে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করা—কি বিজ্ঞানে কি শিল্পে, কি দর্শনে কি বিচারে, কি জ্ঞান-বিস্তারে কি কাব্য-সাহিত্যে। লেখকের পক্ষে প্রকাশ-পথ সংস্কৃতে ছিল সহজ; দেড় হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বহু কবি ও অন্য লেখক সংস্কৃতে ভাব-প্রকাশের জন্য যে রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, অল্প একটু ব্যাকরণ-জ্ঞান হইলেই লোকে অবলীলা-ক্রমে সেই পথে নিজ রচনা-রথ পরিচালিত করিতে পারিত। এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃতে কিছু রচিত হইলে, নিখিল-ভারত ও বৃহত্তর-ভারতের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সহজ-সাধ্য হইত। এই হেতু, সংস্কৃত-রচনার এতটা জনপ্রিয়তা ছিল, এতটা প্রতিষ্ঠা ছিল। এক জৈনদের বাহিরে প্রাকৃত-সাহিত্য-রচনার ধারা তেমন প্রচলিত ছিল না; পশ্চিম-ভারতের জৈনেরা সংস্কৃতে একটি বিরাট্ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—আবার বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতে এবং প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ অপভ্রংশে-ও বহু পুস্তক, গদ্যগ্রন্থ কাব্যাদিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে জৈনদের প্রভাব তত বেশি ছিল না, এখানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী আর বৌদ্ধদেরই আধিক্য ছিল, সেইজন্য প্রাকৃতে সাহিত্য-রচনার ধারা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; নাটকে অল্প-বিস্তর প্রাকৃতে কথোপকথন যাহা থাকিত, তাহার বাহিরে প্রাকৃত-ভাষার পঠন-পাঠন ও রচনা এদেশে বড়ো একটা হইত না বলিয়াই মনে হয়। হীনযানের থেরবাদী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা পালি-ভাষা (ইহা একপ্রকার প্রাচীন প্রাকৃত) ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেই পালির চর্চা ও পালিতে রচনার রীতি বিদ্যমান ছিল; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এই থেরবাদী সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠা ছিল না। ইঁহাদের কেন্দ্র ছিল (অন্ততঃ খ্রীষ্ট-জন্মের পরের শতক-সমূহ হইতে) সিংহলে, পরে সিংহল হইতে ব্রহ্মে ও ব্রহ্ম হইতে চট্টলে এই হীনযান থেরবাদী বৌদ্ধ-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা দেশের সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ বৌদ্ধগণ ছিলেন মহাযান মতের; ইঁহাদের ব্যবহৃত ভাষা ছিল, হয় শুদ্ধ সংস্কৃত, না হয় প্রাকৃত-ঘেঁষা মিশ্র-সংস্কৃত, যাহা "বৌদ্ধ-সংস্কৃত" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা-দেশে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে দেখা যায়,—সংস্কৃতের এই সর্বজন-স্বীকৃত ও সর্বজনানুমোদিত প্রতিষ্ঠা, আর পালি-প্রাকৃতের চর্চা বা প্রতিষ্ঠার অভাব; তার পরে দেখা যায়, পশ্চিমা- বা

শৌরসেনী-অপভ্রংশের প্রচার। মথুরা-অঞ্চল ছিল শৌরসেনী-প্রাকৃতের কেন্দ্র; এই প্রাকৃত, খ্রীষ্টীয় ৪০০-৫০০-র মধ্যে, বর্তমান উত্তর-প্রদেশের সমগ্র পশ্চিম ভাগে, পূর্ব-পাঞ্জাবে, মালবে ও রাজপুতানায় প্রসৃত হয়; কোসলে এবং গুজরাটেও ইহার প্রভাব পড়ে। এই প্রাকৃত ছিল মধ্যদেশের—আর্য্যাবর্তের—হৃদয়-দেশের ভাষা; এইজন্য ইহার একটা স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা ছিল। সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় যে, উচ্চ শ্রেণীর পাত্র-পাত্রী যাঁহারা সংস্কৃত বলেন না, তাঁহারা এই শৌরসেনী- প্রাকৃতেই কথা কন। শৌরসেনী-প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ শৌরসেনী-অপভ্রংশ; ইহা খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত (ও তাহার পরেও) উত্তর-ভারতের রাজপুত রাজাদের সভায় সাহিত্যের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত; সমগ্র পাঞ্জাবে ও রাজপুতানায়, গুজরাটে ও উত্তর-প্রদেশে, তুর্কী-আক্রমণের পূর্ববর্তী কালে, ইহা তখনকার দিনের হিন্দীর মতো প্রচলিত ছিল; কোসলে, কাশীতে, মগধে, মিথিলায় ও গৌড়-বঙ্গেও ইহার প্রসার ঘটে; ওদিকে মহারাষ্ট্রে ও সিন্ধু-প্রদেশেও ইহা বিস্তৃত হয়; মহারাষ্ট্র হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সারা উত্তর-খণ্ডে, তখনকার দিনের হিন্দীর মতো, এই শৌরসেনী-অপভ্রংশ এক অখণ্ড উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা বা লোক-ভাষার স্থান গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় কথ্য-ভাষার দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবান্বিত হইলেও, শৌরসেনী-অপভ্রংশ মোটামুটি একটি অখণ্ড ভারত-ব্যাপী সাহিত্যের উপজীব্য কথ্য ভাষা রূপে ৬০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বিরাজ করিতে থাকে। বাঙ্গালা-দেশের কবিরাও এই ভাষায় পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। কান্‌হ, সরহ প্রভৃতির পদ এই ভাষায় পাওয়া গিয়াছে; ইহাতে বাঙ্গালা-দেশের কথ্য-ভাষা সৃজ্যমান প্রাচীন বাঙ্গালার ছাপ একটু-আধটু পাওয়া গেলেও, কান্‌হ সরহ প্রভৃতির অপভ্রংশকে শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ-ই বলিতে হয়। এই অপভ্রংশে সাহিত্য-রচনার জের পরবর্তী তুর্কী বা মুসলমান যুগের কয়েক শতক পর্য্যন্ত চলিয়াছিল; আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি তাঁহার 'কীর্তিলতা' কাব্য এই শৌরসেনী-অপভ্রংশেই রচনা করিয়া গিয়াছেন—যদিও তাঁহার ব্যবহৃত শৌরসেনী-অপভ্রংশে বহু স্থলে তাঁহার মাতৃভাষা মৈথিলের সহিত মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ৮০০-৯০০-র দিকে বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা-দেশে সাহিত্যের জন্য দুইটি প্রধান ভাষার প্রচলন ছিল—সংস্কৃত, এবং শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ। গৌড়-বঙ্গের লোক-ভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিকার, ধীরে-ধীরে প্রাচীন বাঙ্গালায় তখন ইহা রূপান্তরিত হইতেছে। সমগ্র-উত্তর-

ভারত-ব্যাপী প্রতিষ্ঠা হেতু, শৌরসেন-অপভ্রংশ এই পরিবর্তনশীল মাগধী-অপভ্রংশের সাহিত্যিক প্রতীক রূপে, আংশিক ভাবে অন্ততঃ, দাঁড়াইয়া যায়—কারণ বাঙ্গালা-দেশের কথ্য-ভাষার সঙ্গে ইহার মিলও খুব ছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণ, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কবিগণ, সকলেই শৌরসেনী-অপভ্রংশ অল্প-স্বল্প ব্যবহার করিতেন; কিন্তু সকলেই বেশি করিয়া ব্যবহার করিতেন সংস্কৃত। বাঙ্গালা-ভাষা তাহার বিশিষ্ট রূপ পাইবার সঙ্গে-সঙ্গে, তাহাতে বৌদ্ধ সিদ্ধগণ পদ-রচনা করিতে লাগিয়া গেলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ, উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল, বর্ণজ্ঞান-হীন জন-সাধারণের নিকট তত্ত্ব-কথা বা দেবতা-কথা পহুঁছাইয়া দেওয়া; এইজন্য তৈয়ারী শৌরসেনী-অপভ্রংশ-ই ইঁহারা লইলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে উদীয়মান, নিজ বিশিষ্ট সত্তায় পৃথগ্‌ভূত প্রাচীন বাঙ্গালাকেও বর্জন করিলেন না।

কিন্তু শৌরসেনী-অপভ্রংশ ও প্রাচীন-বাঙ্গালাকে লইয়া বাঙ্গালা-দেশে তখন অর্থাৎ তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে দুই তিন শতক ধরিয়া অল্প-স্বল্প experiment অর্থাৎ পরীক্ষা চলিতেছে মাত্র; দেশের সমগ্র শিক্ষিত (অর্থাৎ সংস্কৃতে-শিক্ষিত) পণ্ডিত ও কবিদের মধ্যে অল্প কয়েকজন মাত্র গণতান্ত্রিক-প্রকৃতি-বিশিষ্ট অথবা প্রগতিশীল পণ্ডিত ও কবি এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন না; ইঁহাদের অনেকের কাছেই কবিতা অপেক্ষা ধর্মপ্রচার-ই বেশি গরজের জিনিস ছিল। সুতরাং বলিতে পারা যায়, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বের যুগের বাঙ্গালা-দেশের কবি-মনের পূর্ণ পরিচয়—কল্পনোজ্জ্বল শিক্ষিত মনের পরিচয়—এই শৌরসেনী-অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙ্গালার পদের ছিটাফোঁটা যাহা আমরা নিতান্ত সৌভাগ্য-ক্রমে পাইয়া গিয়াছি, তাহার মধ্যে পাইব না; পাইব অন্যত্র—তখনকার দিনের গৌড়-বঙ্গের কবিদের সংস্কৃত-ভাষায় নিবদ্ধ রচনায়।

এইরূপ সংস্কৃত-রচনা, ইহার সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পরবর্তী কালের, মুসলমান-যুগের, বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র বা ঐতিহাসিক পটভূমিকা হিসাবে, তাহার তেমন আলোচনা হয় নাই। কেবল শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার অতি মূল্যবান্, তথ্য-পূর্ণ ও উপাদেয় গ্রন্থ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর প্রথম পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ সার্থক ভাবে এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন; এ বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম সাহিত্য-দৃষ্টি সাধুবাদের যোগ্য। মুসলমান-পূর্ব যুগের বাঙ্গালা দেশে রচিত সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া ইতিপূর্বে মূল্যবান্ আলোচনা ও

বিচার করিয়া গিয়াছেন পরলোকগত মনোমোহন চক্রবর্তী ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর নিবন্ধ-ও এ বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য ; এবং সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজিতে লিখিত বাঙ্গালা-দেশের ইতিহাসের হিন্দু-যুগ-সম্পর্কীয় প্রথম খণ্ডের ৭৩-পৃষ্ঠাব্যাপী ১১-শ অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় তুর্কী-বিজয়ের পুর্বের যুগের গৌড়-বঙ্গে রচিত সংস্কৃত-সাহিত্যের অতি সুন্দর ও ব্যাপক আলোচনা করিয়াছেন। গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন অনুশাসনগুলিতে যে-সমস্ত সুন্দর মঙ্গলাচরণ ও অন্য শ্লোক পাওয়া যায়, সাহিত্যের দিক্ হইতে প্রিয়বর সুকুমার-বাবু তাঁহার পুস্তকে সেগুলির-ও বিচার করিয়াছেন, মুসলমান-পুর্ব যুগে গৌড়-বঙ্গে রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'গীতগোবিন্দ' লইয়া আলোচনা-ও করিয়াছেন, এবং বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে সংস্কৃত-কবিতা-সংগ্রহের কথাও বলিয়াছেন। বাঙ্গালা-ভাষার উৎপত্তির যুগে, মুখ্যতঃ সংস্কৃত-ভাষা এবং অংশতঃ পশ্চিমা-অপভ্রংশ কেন বাঙ্গালা-দেশের কবিদের ও অন্য লেখকদের উপজীব্য হইয়াছিল, সুকুমার-বাবু তাহারও কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। সুকুমার-বাবুর লেখা পড়িয়া-ই 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হয়, এবং এই অতি মূল্যবান্ সংগ্রহ-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিয়া, বাঙ্গালা-সাহিত্যের পত্তনের যুগের ইতিহাসে ইহার যে একটি বড়ো স্থান আছে, তাহা আমার মনে বিশেষ করিয়া প্রতিভাত হয়।

পণ্ডিতেরা ধর্ম, দর্শন, ব্যবহার, বৈদ্যক প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা লইয়া যে-সব বই লিখিতেন, তাঁহারা পণ্ডিতদের জন্যই মুখ্যতঃ লিখিতেন। সেখানে সংস্কৃত ছাড়া কথ্য-ভাষায় (অথবা কথ্য-ভাষার সাহিত্যিক রূপ অপ্রভ্রংশে) লিখিবার কথা তাঁহাদের মনে হইত না। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের রসিক, নিছক পণ্ডিতদের বাহিরেও পাওয়া যাইত ; তখনকার দিনে এইরূপ অপণ্ডিত সাহিত্য-রসিকদের পক্ষে, সংস্কৃত জানা অনেকটা ভালো রকমে মাতৃভাষা জানার-ই শামিল ছিল। একটি সংস্কৃত শ্লোক অথবা একটি-একটি করিয়া বহু শ্লোকে গ্রথিত পূরা একখানি সংস্কৃত কাব্য পড়িয়া বুঝিয়া শ্লোকটির অথবা সমগ্র কাব্যটির রস আস্বাদন করা, তখনকার যুগের সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে কষ্টকর ছিল না। তাঁহাদের জন্যও সংস্কৃত শ্লোক বা কাব্য রচিত হইত, কেবল বড়ো-বড়ো পণ্ডিতের জন্য নহে। বাঙ্গালা-দেশে সংস্কৃত-চর্চা বিশেষ প্রবল ছিল, নতুবা "গৌড়ী-রীতি"

নামে সংস্কৃত-রচনা-শৈলী সংস্কৃত-সাহিত্যে দাঁড়াইয়া যাইত না। গৌড়-বঙ্গের সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি কালিদাসের কাব্য ও নাটক পড়িয়া সেগুলির রস-গ্রহণ করিতে পারিতেন, ভবভূতি ভারবি রাজশেখর বাণভট্ট প্রভৃতিও বুঝিতেন; তাঁহাদের জন্যই বাঙ্গলা-দেশের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' কাব্য রচনা করেন, গৌড় অভিনন্দ ইঁহাদের সুবিধার জন্য পদ্যে 'কাদম্বরী-কথা-সার' লেখেন, শান্তিদেব ইঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 'বোধিচর্য্যাবতার' প্রণয়ন করেন, এবং দ্বাদশ শতকে ইঁহাদের আনন্দ দিবার উদ্দেশ্যে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন, ধোয়ী কবি 'পবন-দূত' লেখেন, গোবর্ধনাচার্য্য তাঁহার 'আর্য্যাসপ্তশতী'-র শ্লোক প্রণয়ন ও সংকলন করেন, এবং সমসাময়িক অন্য কবিগণ নিজ-নিজ কাব্য ও প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। সংস্কৃত কবিতার অনুরাগী পাঠকদের জন্য সংগ্রহ-পুস্তক প্রণয়ন করার রীতি বোধ হয় সর্ব-প্রথম বাঙ্গালা-দেশেই দেখা দেয়। এইরূপ কতকগুলি কবিতা-সংগ্রহ বা কবিতা-চয়নিকা সুপরিচিত—তন্মধ্যে বোধ হয় সর্ব-প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতেছে 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'; এখানি খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকে বাঙ্গালা-দেশে কোনোও সময়ে গ্রথিত হইয়াছিল; দ্বাদশ শতকের অক্ষরে লেখা ইহার একমাত্র পুঁথি হইতে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা এশিয়াটিক সোসাইটির তরফে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এফ্ ডব্লিউ টমাস্ মহাশয়ের সম্পাদনায় ইহার অতি সুন্দর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সংগ্রহ-কারের নাম জানা যায় নাই, তবে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। প্রাপ্ত পুস্তকখানি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, ইহাতে মাত্র ৫২৫টি শ্লোক পাওয়া যাইতেছে, ও ১১১ জন বিভিন্ন কবির নাম ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ১১১ জন কবির মধ্যে কালিদাস, অমরু, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি বাঙ্গালার বাহিরের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি আছেন, আবার এমন অনেক কবি আছেন নাম হইতে যাঁহাদের সেই যুগের গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় বলিয়া মনে হয়—যেমন, অচলসিংহ, অপরাজিতরক্ষিত, গৌড় অভিনন্দ, কুমুদাকর মতি, ডিম্বোক বা হিম্বোক, ধর্মকর, বৈদ্য ধন্য, বিম্বোক, বুদ্ধাকরগুপ্ত, ভ্রমরদেব, মধুশীল, বাগোক, লক্ষ্মীর, ললিতোক, বন্দ্য তথাগত, বিতোক, বিদ্যাকা বা বিজ্জাকা, বিনয়দেব, বীর্য্যমিত্র, বৈদ্দোক, শুভংকর, শ্রীধরনন্দী, সিদ্ধোক, সোনোক বা সোন্নোক, হিঙ্গোক। অবশ্য, সংস্কৃত-সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ এইরূপ কবিতা বা সূক্তি সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া; ঋগ্বেদ-প্রমুখ চার বেদ, সংগ্রহ-গ্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কাব্য-রসিকদের জন্য যতগুলি সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহ

পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে প্রাচীনতম দুইখানি গৌড়-বঙ্গে গ্রথিত হইয়াছিল ('কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'-এর লিপি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ দিকের অথবা দ্বাদশ শতকের প্রাচীন নেপালী হইলেও, বইখানি বাঙ্গালা-দেশে সংকলিত হইয়া নেপালে নীত হইবার পক্ষে অনুমানের কারণ আছে)। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় একজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী জমিদার কর্তৃক সংকলিত হয়। 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'র পরে এই সংগ্রহগুলির নাম করিতে হয়—কাশ্মীরীয় কবি জহ্লণ কর্তৃক সংকলিত 'সুভাষিত-মুক্তাবলী' বা 'সূক্তি-মালিকা' অথবা 'সূক্তি-মুক্তাবলী' (১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি' (খ্রীষ্টীয় ১৩৬৩ সালের মধ্যভাগে রাজপুতানার কবি বৈদ্য শার্ঙ্গধর কর্তৃক গ্রথিত), 'সুভাষিতাবলী' (বল্লভদেব কর্তৃক পঞ্চদশ শতকে সংকলিত), ও শ্রীধর-কৃত 'সুভাষিতাবলী' (পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ); এতদ্ভিন্ন আরও পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে 'পদ্যতরঙ্গিণী' (ব্রজনাথ-কৃত), 'পদ্যবেণী' (বেণীদত্ত-কৃত), 'পদ্যামৃত-তরঙ্গিণী' (হরিভাস্কর-কৃত), 'সভ্যালংকরণ' বা 'সারসংগ্রহসুধার্ণব' (ভট্ট গোবিন্দজিৎ), 'সুভাষিত-প্রবন্ধ', 'সুভাষিত-শ্লোক', 'সুভাষিত-রত্নকোশ' (ভট্ট শ্রীকৃষ্ণ), 'সুভাষিত-হারাবলী' (হরি কবি), প্রভৃতি নানা সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলিত হয়। কিন্তু এইরূপ সংগ্রহের সূত্রপাত সম্ভবতঃ গৌড়-বঙ্গেই হইয়াছিল ; এবং পরবর্তী কালেও বাঙ্গালা-দেশে এই সংগ্রহের ধারা লুপ্ত হয় নাই ; ষোড়শ শতকের মধ্য-ভাগে শ্রীরূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী' নামে একখানি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকের সংগ্রহ সংকলিত করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে এখানি একখানি সুপরিচিত পুস্তক। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এইরূপ ২০০-র অধিক শ্লোক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্লোক-মঞ্জরী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। বাঙ্গালা-দেশে ভাষা-কবিতার এইরূপ সংগ্রহ গোড়া হইতেই আরব্ধ হয় ; বৌদ্ধ সহজিয়া মতের চর্য্যাপদের সংগ্রহ বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদি পুস্তক, এবং চৈতন্যদেবের পরে বহু বৈষ্ণব পদ বাঙ্গালা-ভাষায় ও ব্রজবুলীতে রচিত হইয়া যখন আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিল, তখন, সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া, অনেকগুলি পদ-সংগ্রহ বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেখা দিল—'ক্ষণাদাগীত-চিন্তামণি', 'পদামৃত-সমুদ্র' (রাধামোহন ঠাকুর-কৃত), 'পদকল্পতরু' (গোকুলানন্দ সেন বৈষ্ণবদাস-কৃত), 'কীর্তনানন্দ' (গৌরসুন্দর দাস-কৃত), প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন উপরে উল্লিখিত তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালার সংস্কৃত শিলালেখ ও তাম্রলেখ-সমূহের যে মঙ্গলাচরণ

শ্লোকগুলির সাহিত্যিক মূল্যের বিচার করিয়াছেন, সেই শ্লোকগুলিও একত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার মতো।

নানা দিক্ হইতে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' একখানি লক্ষণীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ, এবং বাঙ্গালা-দেশের কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বইখানি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়; তখন পশ্চিম বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন, তুর্কী সেনানী বখ্‌ত্যার খল্‌জীর আক্রমণে নবদ্বীপ হইতে পলাইয়া পূর্ববঙ্গে গিয়া আত্মরক্ষা করিয়া আছেন। গ্রন্থ-সংকলয়িতা শ্রীধরদাস, গ্রন্থারম্ভ-শ্লোকে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ পূর্বক, পঞ্চ-শ্লোকময় 'প্রস্তাব' অর্থাৎ ভূমিকায় নিজের পরিচয় দিয়াছেন। শৌর্য্য, তপ, জ্ঞান, দান, ইন্দ্রিয়জয়, শত্রুজয়, যোগ, ক্ষমা প্রভৃতি নানা গুণের আকর জীবন্মুক্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের 'প্রতিরাজ' অর্থাৎ লেখক, অথবা বিশ্বস্ত খাস-মুন্‌শী (সম্ভবতঃ ইঁহাকে রাজার প্রতিনিধি হইতে হইত বলিয়া এই উপাধি) এবং তৎকর্তৃক মহাসামন্তপদে বৃত ও তাঁহার অনুপম প্রেমের একমাত্র পাত্র-স্বরূপ, সখার পদবীতে উন্নীত, শ্রীবটুদাস ছিলেন অক্ষয় ও সুনৃতপূর্ণ চন্দ্র-স্বরূপ; তাঁহার পুত্র ছিলেন শ্রীধরদাস; ইনি লক্ষ্মীমন্ত ও বিদ্বান্ ছিলেন, এবং শ্রীপতিপদে ইঁহার ভক্তি ছিল। কবিদের অকারণ-মিত্র-স্বরূপ শ্রীধরদাস পঞ্চ প্রবাহে 'সূক্তিকর্ণামৃত' বা 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে এই সংগ্রহ-গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গ্রন্থ-সমাপ্তিতে তিনি গ্রন্থে সংগৃহীত শ্লোকের সংখ্যা দিয়াছেন, এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সমাপ্তির তারিখ দিয়াছেন,—শকাব্দ 'সপ্তবিংশত্যধিক-শতোপেতদশশত' অর্থাৎ ১১২৭ শকাব্দ, ২০এ ফাল্গুন, —খ্রীষ্টাব্দ ১২০৬, ১১ই ফেব্রুয়ারি। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ১৯১২ সালে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্ বেঙ্গল হইতে পণ্ডিত রামাবতার শর্মার সম্পাদনায় আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের চারখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—সুতরাং বইখানি কতকটা লোক-প্রিয় হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৩৩ সালে ইংরেজি ভূমিকাদি সমেত এই বই লাহোরের মোতীলাল বনারসীদাসের সংস্কৃত পুস্তকালয় হইতে পণ্ডিত রামাবতার শর্মা ও পণ্ডিত হরদত্ত শর্মার সম্পাদনায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [সম্প্রতি, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায়, নাগরী লিপিতে, সম্পূর্ণ গ্রন্থখানির একখানি নূতন সংস্করণ, কলিকাতার ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।] এই গ্রন্থখানি লইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র আলোচনা করেন, এবং ১৮৮০ সালের পরে জর্‌মান পণ্ডিত Aufrecht আউফ্‌রেখ্‌ট্‌ 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র দুইখানি পুঁথি লইয়া এই বইয়ের বিচার করেন, ও জর্‌মান ভাষায় রচিত দুইটি প্রবন্ধে পণ্ডিত-মহলে ইহাকে পরিচিত করিয়া দেন। আউফ্‌রেখ্‌ট্‌-এর কাগজ-পত্রের মধ্যে 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র শ্লোকগুলির বিশ্লেষণ ছিল, অধ্যাপক টমাস স্বীয় 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'-এর সংস্করণ প্রস্তুত করিবার সময়ে এই কাগজ-পত্র হইতে অনেক তথ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়া যাইবার পরে, আমাদের দেশে এখন উহার আলোচনা সুগম হইয়াছে।

'সদুক্তিকর্ণামৃত' পাঁচটি 'প্রবাহ' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি করিয়া 'বীচি' অর্থাৎ তরঙ্গ বা শ্রেণী আছে, এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া শ্লোক। শ্লোকের শেষে রচয়িতার নাম দেওয়া আছে, নাম যেখানে সংকলয়িতার জানা ছিল না সেখানে "কস্যচিৎ" অর্থাৎ 'কাহারো' বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রথম প্রবাহের নাম 'অমর(বা দেব)-প্রবাহ'—ইহার বিভিন্ন 'বীচি'তে নানা দেবতার ও তাঁহাদের লীলা বিষয়ক পাঁচটি করিয়া শ্লোক আছে ; সর্ব-সমেত ৯৫ বীচি এই প্রবাহে মিলিতেছে। দ্বিতীয় প্রবাহ হইতেছে 'শৃঙ্গার-প্রবাহ', ইহাতে ১৭৯টি 'বীচি' ; এই প্রবাহে প্রেম ও নায়ক-নায়িকা বিষয়ক এবং প্রেমিক-প্রেমিকার নানা ভাব ও অবস্থা, ও তদ্ভিন্ন ষড়্‌ঋতুর ও প্রকৃতির নানা অবস্থার বর্ণনাত্মক পৃথক্ পৃথক্ শ্লোক বিদ্যমান। তৃতীয় প্রবাহের নাম 'চাটু-প্রবাহ', ইহাতে ৫৪ 'বীচি' ; বিষয়-বস্তু রাজা বা বীরের দেহ ও শক্তি, চতুরঙ্গ সেনা, অস্ত্র, বীরত্ব, তূর্যধ্বনি, যুদ্ধ, শত্রু, কীর্তি ইত্যাদির বর্ণনা বা প্রশংসা। চতুর্থ 'অপদেশ-প্রবাহ' হইতেছে ৭২ 'বীচি'ময়, ইহাতে নানা দেবতার দোষগুণ ও বহুবিধ পার্থিব প্রাকৃতিক বস্তু, বৃক্ষলতা-পুষ্পাদি, পশু-পক্ষী প্রভৃতির বর্ণনাময় শ্লোক আছে। শেষ 'উচ্চাবচ-প্রবাহ', ইহার ৭৬ 'বীচি'তে নানাবিধ বিষয়ের শ্লোক আছে—মনুষ্য, অশ্ব, গো, নানা পক্ষী, দেশ, কবি প্রভৃতি বহু প্রকীর্ণ বস্তু, স্থান, গুণ ও অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা। সংকলয়িতা গ্রন্থে-শেষে 'বীচি'-সমূহের সংখ্যা দিয়াছেন ৪৭৬, ও শ্লোকের সংখ্যা ২৩৮০ ; কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোকের অভাব-হেতু ৪৭৪ বীচি ও ২৩৭২ শ্লোক মিলিতেছে।

এই-সমস্ত শ্লোক বা কবিতার রচয়িতা হিসাবে প্রায় ৫০০ জন বিভিন্ন কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকগুলি শ্লোকের রচয়িতার নাম শ্রীধরদাস

জানিতেন না বা পান নাই। এই কবিদের মধ্যে অমরু, কালিদাস, দণ্ডী, পাণিনি, প্রবরসেন, বাণ, বিহ্লণ, ভর্তৃহরি, ভবভূতি, ভামহ, ভারবি, ভাস, ভোজদেব, মুঞ্জ, রাজশেখর, বরাহমিহির, বাক্‌পতিরাজ, বিশাখদত্ত, শিহ্লণ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি বাঙ্গালার বাহিরের কতকগুলি প্রথিতনামা কবি আছেন; কিন্তু এই প্রায় ৫০০ জন কবির মধ্যে—বহু স্থলে তাঁহাদের নাম দেখিয়া মনে হয়—অর্ধেকের উপর গৌড়-বঙ্গেরই কবি, এবং শ্রীধরদাসের সমসাময়িক অথবা তাঁহার কিছু পূর্বেকার কালের কবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভার প্রথিতনামা কবি জয়দেব (৩১টি শ্লোক), উমাপতিধর (৯২), শরণ (২০), আচার্য্য গোবর্ধন (৬) ও ধোয়ী কবিরাজ (২০)—ইঁহাদের 'সদুক্তি'র বিভিন্ন প্রবাহে পাইতেছি। তখনকার দিনে, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বেই, বাঙ্গালীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ভদ্রজাতির মধ্যে দত্ত, রক্ষিত, ভদ্র, পালিত, চন্দ্র, গুপ্ত, নাগ, দেব, দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর প্রভৃতি নামাংশ অনেকটা আজকালকার পদবীর মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার ব্রাহ্মণের নামের পূর্বে গ্রামের নাম (গাঞি) ব্যবহারেরও রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে (যেমন 'বন্দিঘাটীয় সর্বানন্দ, ভট্টশালীয় পীতাম্বর, কেশরকোণীয় নাথোক, তৈলপাটীয় গাঙ্গোক' প্রভৃতি)। 'ওক'-প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া প্রচলিত ভাষা-শব্দের নামকে বাহ্যতঃ সংস্কৃত ক-কারান্ত পদ করিয়া দেখাইবার রেওয়াজ-ও আসিয়া গিয়াছে (যেমন, 'গাঙ্গোক, গোসোক, জয়োক, জিয়োক, বিম্বোক, দনোক, পুণ্ড্রোক, শুঙ্গোক, হীরোক', ইত্যাদি)। এই প্রকার নামের ধরন দেখিয়া, এবং কতকগুলি কবির সম্বন্ধে অন্য প্রমাণের বলে, 'সদুক্তি'-র কবিদের অনেকেই যে গৌড়-বঙ্গের ছিলেন, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীধরদাসের সংগ্রহ হইতে তাঁহার সময়ের বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিক আব-হাওয়ার কতকটা ইঙ্গিত পাইতেছি। জয়দেব কবির ৩১টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে মিলিতেছে; বাকী ২৬টি শ্লোক এতাবৎ আমরা জানিতাম না। এগুলি হইতে দেখা যায় যে, জয়দেব যুদ্ধেরও কবি ছিলেন, বীর-রস ও রাজপ্রশস্তি লইয়া তাঁহার ১৮টি শ্লোক এই গ্রন্থে পাইতেছি; তাঁহার রচিত মহাদেবের বন্দনাময় একটি শ্লোক-ও শ্রীধরদাস উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি সম্ভবতঃ পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন; পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কল্পনায় তিনি যে বৈষ্ণব সাধক বা মহাজন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রশস্তি-কারক জয়দেব সম্ভবতঃ তাহা ছিলেন না।

শ্রীধরদাস-ধৃত লক্ষ্মণসেন-রচিত একটি শ্লোক হইতে ও তৎপুত্র রাজকুমার কেশব-সেন-রচিত আর একটা শ্লোক হইতে দেখা যায় যে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের জবাবী বা পালটা শ্লোক রাজা ও রাজকুমার রচনা করিতেছেন, এবং এই দুই শ্লোক (দুইটি-ই শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'পদ্যাবলী'তে ধরিয়া গিয়াছেন, তবে তিনি দুইটি-ই লক্ষ্মণসেনের বলিয়া লিখিয়াছেন) হইতে দেখা যায় যে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে যে "নন্দনিদেশতঃ" পদ আছে, তাহার সরল অর্থ 'নন্দ-রাজার নিদেশ অনুসারে', ইহা-ই গ্রহণ করিতে হইবে, পরবর্তী পণ্ডিতদের কাহারো-কাহারো এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুমোদিত 'নন্দ অর্থাৎ মিলন-আনন্দের উদ্দেশ্যে' এই কষ্ট-কল্পিত অর্থ নহে। *

'সদুক্তি'র এই লক্ষণীয় শ্লোক দুইটি নীচে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

"আহূতাদ্য ময়োৎসবে, নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা,
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ ; কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি ?
বৎস, ত্বং তদিমাং নয়ালয়ম্", ইতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ। (কেশবসেনদেবস্য)

"কৃষ্ণ ! ত্বদ্‌বনমালয়া সহ কৃতং", কেনাঽপি, "কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম—তদিদং প্রাপ্তং ময়া ; গৃহ্যতাম্।"
—ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাঽখ্যাতে, ত্রপা-নম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিত-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥ (লক্ষ্মণসেনদেবস্য)।

এই দুইটির সহিত 'গীতগোবিন্দ'র প্রথম শ্লোক তুলনীয়—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং, বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্ ;
নক্তং ; ভীরুরয়ং,—তদেব ত্বমিমং, রাধে ! গৃহং প্রাপয়।"
—ইত্থং নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা-কূলে রহঃ-কেলয়ঃ॥

বাঙ্গালা-দেশের ভাষা-সাহিত্যের ধারা খ্রীষ্টীয় ৯-১২ শতাব্দীর উৎস-মুখ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, 'সদুক্তি'-ধৃত শ্লোক ও সমসাময়িক অন্য সংস্কৃত-রচনা হইতে তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য-যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুইটি মুখ্য বিভাগ—(১) কথাত্মক 'মঙ্গল' কাব্য ও (২) গানময় 'পদ', তুর্কী-পূর্ব যুগেই পাইতেছি ; এবং এই দুই বিভাগের অদ্ভুত মিলন-ক্ষেত্র জয়দেবের

* এ-বিষয়ে বর্তমান সংকলনে ধৃত পূর্ববর্তী প্রবন্ধ "শ্রীজয়দেব কবি" দ্রষ্টব্য।

গীতগোবিন্দে দেখিতেছি,—ইহা শ্রীকৃষ্ণ-রাধা বিষয়ক উজ্জ্বল বা প্রেম রসের গীতিময় 'মঙ্গল'-ও বটে, আবার ইহাতে মধুর-কোমল-কান্ত 'পদাবলী'-ও নিহিত আছে। গীতগোবিন্দের প্রভাব বরাবর-ই বাঙ্গালা-সাহিত্যে ছিল এবং এখনও পর্য্যন্ত এই প্রভাব চলিয়া আসিয়াছে; বাঙ্গালার বাহিরে অন্য ভাষায়, যথা উড়িয়া হিন্দী গুজরাটীতেও, এই প্রভাব বিশেষ ভাবে দেখা যায়। মধ্য-যুগের বা মুসলমান-যুগের বাঙ্গালার প্রথম প্রধান কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গীতগোবিন্দের একাধিক পদের অনুবাদ আছে, গীত-গোবিন্দের অনেক বাক্যাংশের প্রতিধ্বনিও এই কাব্যে মিলে। শ্রীচৈতন্যোত্তর-যুগে যে বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচুর্য্য হঠাৎ আমাদের বিস্মিত করিয়া দেয়, তাহার পিছনে গীতগোবিন্দ-যুগের সংস্কৃত কবিতার একটি অনুপ্রেরণা আছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল-নীলমণি' ও অন্যান্য পুস্তকের সংস্কৃত শ্লোকের আধারে যে বহু বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ রচিত হইয়াছে, তাহা দেখা যায়; এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর মতো কবি ও পণ্ডিতের মার্জিত সাহিত্য-রুচি যে মুসলমান-পূর্ব যুগের কবিদের রচনার দ্বারা অন্ততঃ আংশিক ভাবেও গঠিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার সংকলিত 'পদ্যাবলী' হইতে অনুমান করা যায়। ভাষার দিক্ দিয়া, এবং সহজিয়া ও দেহতত্ত্বের পদের অনুরূপ ভাবের দিক্ দিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত চর্য্যাপদগুলি যেমন মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিতে, তেমনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও তাঁহার সমসাময়িক গৌড়-বঙ্গের সংস্কৃত কবিদের শ্লোকাবলীকে (বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শ্লোকাবলীকে) বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলীর আদি সংস্কৃতময় রূপ বলা যায়। 'সদুক্তি'-র কতকগুলি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক শ্লোকের অনুরূপ বা সমশ্রেণিক শ্লোক পরবর্তী সংগ্রহ-গ্রন্থে পাওয়া যায়; যেমন ষোড়শ শতকের 'পদ্যাবলী'তে, যেমন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব কর্তৃক উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে সংকলিত 'সুভাষিত-রত্নভাণ্ডাগার'-এর মধ্যে; আভ্যন্তরে প্রমাণ, এগুলিকেও 'সদুক্তি'-র যুগেই লইয়া যাইতে হয়। যেমন, নিম্নের শ্লোকটি; এটি 'সদুক্তি'-তে 'দেব-প্রবাহ' মধ্যে 'গোবর্ধনোদ্ধার' নামে ৬০-সংখ্যক 'বীচি'-র দ্বিতীয় শ্লোক ('সদুক্তি' ১।৬০।২), ইহার রচয়িতার নাম 'সদুক্তি'-তে কেবল 'কস্যচিৎ' বলিয়া উক্ত, কিন্তু শ্রীরূপের 'পদ্যাবলী'-তে এটিকে জয়দেবের সমসাময়িক 'শরণস্য' অর্থাৎ শরণ-কবির বলিয়া পাইতেছি (পদ্যাবলী ২৬৫) :—

"একেনৈব চিরায়, কৃষ্ণ! ভবতা গোবর্ধনোহয়ং ধৃতঃ—
শ্রান্তোহসি, ক্ষণম্ আস্স্ব; সাম্প্রতম্ অমী সর্বে বয়ং দধ্মহে।"
—ইত্যুল্লাসিতদোর্ষ্ণি গোপনিবহে, কিঞ্চিদ্‌ভুজাকুঞ্চন-
ন্যঞ্চচ্ছৈলভরার্দিতে বিরমতি, স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥

এটির সহিত তুলনীয়, 'পদ্যাবলী'-র ২৪৮-সংখ্যক শ্লোক, 'বাসব'-নামক কবির বলিয়া উল্লিখিত; এটি 'সদুক্তি'-তে নাই,—'সদুক্তি'-তে 'বাসব' বলিয়া কোনও কবির শ্লোক নাই:—

"কা ত্বং?" "মাধব-দূতিকা।" "বদসি কিং?" "মানং জহীহি, প্রিয়ে!"
"ধূর্তঃ সোহন্যমনা—", "মনাগপি, সখি! ত্বয়্যাদরং নোজ্ঝতি।"
—ইত্যন্যোন্য-কথারসৈঃ প্রমুদিতাং রাধাং সখীবেশবান্
নীত্বা কুঞ্জগৃহং প্রকাশিততনুঃ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥

এই দুইটি শ্লোকের চতুর্থ পাদের শেষ অংশ "স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ" লক্ষণীয়,—মনে হয় যেন এক-ই সময়ে মহারাজ লক্ষণসেনের সভায় সমস্যাপূর্তি-শ্লোক হিসাবে এই দুইটি দুই জন বিভিন্ন কবির দ্বারা রচিত হইয়াছিল। 'সদুক্তি', 'পদ্যাবলী' ও অন্য সংগ্রহে "হরিঃ পাতু বঃ" এইরূপ আশীর্বচনাত্মক শেষাংশযুক্ত অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের শ্লোক পাওয়া যাইতেছে; এগুলিকে একসঙ্গেই ধরিতে হয়। উপরে উদ্ধৃত বাসব-রচিত শ্লোকটির ভাব, সখীবেশে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য-বিষয়ক বাঙ্গালা বৈষ্ণব-পদের আধার স্বরূপ। আবার ভাব-সাম্যের দিক্ হইতে উপরে প্রদত্ত শরণের গোবর্ধন-ধারণ-বিষয়ক শ্লোকটির সহিত তুলনীয় জয়দেব-রচিত একটি শ্লোক ('সদুক্তি', ১।৬০।৫)—

"মুগ্ধে!" "নাথ, কিমাথ?" "তন্বি! শিখরিপ্রাগ্‌ভারভুগ্নো ভুজঃ;"
"সাহায্যং, প্রিয়! কিং ভজামি?" "সুভগে! দোর্বল্লিমায়াসয়।"
—ইত্যুল্লাসিত-বাহুমূল-বিচলচ্চেলাঞ্চলব্যক্তয়ো
রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ (? পতিতাঃ) কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥

আবার ইহার শেষ ছত্রের শেষাংশের সহিত উমাপতিধরের এই শ্লোকের অনুরূপ অংশ তুলনীয় ('সদুক্তি', ১।৫৫।৩; বিষয়, 'হরিক্রীড়া')—

ভ্রূবল্লীচলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়-শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥

"রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি" এই অংশটুকুর মিল দেখিয়া উপরে উদ্ধৃত গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ও লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের দুইটি অনুরূপ শ্লোককেও তেমনি একত্র গ্রথিত বা সম্পর্কিত বলিতে হয়। [দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী "শ্রীজয়দেব কবি" প্রবন্ধ।]

একটু খুঁটিনাটি আলোচনা করিলে, এই-সব শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক ও পরবর্তী বাঙ্গালা পদের মধ্যে একটা সংযোগ বাহির করা যায়।

'সদুক্তি'-ধৃত অন্যবিধ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিয়া ও বিভিন্ন প্রবাহের অন্তর্গত লক্ষণীয় কতকগুলি বিষয়-বস্তুর উল্লেখ করিয়া, এই বইয়ের পরিচয়ের সমাপ্তি করিব। এই-সকল শ্লোক এবং কবিদের উপজীব্য বিষয়-বস্তু হইতে, সাত আট শ' বা হাজার বছর পূর্বের গৌড়-বঙ্গের শিক্ষিত কবি-মনের ও কবিত্ব-শক্তির দিগ্‌দর্শন করিতে পারা যাইবে।

দেব-প্রবাহে পর-পর ব্রহ্মা, সূর্য্য, শিব ও শিবের পরিকর এবং শিবের গুণাবলী ও কার্য্যাবলী, নারায়ণের দশ অবতার (বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীকৃষ্ণলীলা) ও নারায়ণের পরিকর এবং গুণ ও ক্রিয়াবলী, সরস্বতী, চন্দ্র (বিবিধ অবস্থায়), বায়ু (বিভিন্ন প্রকারের বায়ু, যথা দক্ষিণবায়ু, নদীবাত, সমুদ্রবাত, প্রাভাতিক বাত), মদন—এই-সমস্ত বিষয় অবলম্বনে ও বিভিন্ন ছন্দে রচিত ৪৭৫টি শ্লোক আছে। জয়দেব-রচিত মহাদেব-বিষয়ক একটি শ্লোক আছে, সেটি এইরূপ—

ভূতি-ব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎকৈতবাদম্বু বিভ্রল্-
ললাটাক্ষিচ্ছলেন জ্বলনমহিপতিশ্বাসলক্ষ্যাৎ সমীরম্।
বিস্তীর্ণাঘোরবক্ত্রোদরকুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈর্
বিশ্বং শশ্বদ্ বিতন্বন্ বিতরতু ভবতঃ সম্পদং চন্দ্রমৌলিঃ ॥ ১।৪।৪ ॥

উমাপতিধর, জলচন্দ্র, যোগেশ্বর ও বৈদ্য গঙ্গাধর, শিব-বিষয়ক ইঁহাদের অনেকগুলি শ্লোক শ্রীধরদাস দিয়াছেন। বৈদ্য গঙ্গাধরের একটি মহাদেব-স্তুতি—

পীযূষেণ বিষেণ তুল্যমশনং, স্বর্গে শ্মশানে স্থিতির্
নির্ভেদাঃ, পয়সোঽনলস্য বহনে যস্যাবিশেষগ্রহঃ।
ঐশ্বর্য্যেণ চ ভিক্ষয়া চ গময়ন্ কালং সমঃ সর্বতো
দেবঃ স্বাত্মনি কৌতুকী হরতু বঃ সংসার-পাশং হরঃ ॥ ১।৪।৫ ॥

'বিবাহ-সময়-গৌরী'র নিম্নোদ্ধৃত সুন্দর বর্ণনাটি এক অজ্ঞাতনামা কবির ; সম্ভবতঃ তিনি গৌড়-বঙ্গেরই ছিলেন—

ব্রহ্মায়ং—বিষ্ণুরেষ—ত্রিদশপতিরসৌ—লোকপালাস্তথৈতে ;
জামাতা কোঽত্র ? যোঽসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরূক্ষঃ কপালী !
হা বৎসে ! বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবরপ্রার্থনাব্রীড়িতাভির্
দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিতপুলকা শ্রেয়সে বোঽস্তু গৌরী ॥ ১।২৩।৩ ॥

এই শ্লোকটি পাঠে যুগপৎ ভারতচন্দ্রের পার্বতীর বিবাহের বর্ণনা এবং রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' কবিতাটি মনে আসে।

কালী-সম্বন্ধে ৫টি শ্লোক আছে—এগুলিতে কালীর ধ্যান বা চিত্র আমাদের আজকালকার কালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এবিষয়ে, ১২০০ শতকের পরে বাঙ্গালী শাক্তের দেব-কল্পনায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখা যায়। কার্ত্তিকেয়ের শিশুলীলার সুন্দর চিত্র আছে ; জলচন্দ্র(সম্ভবতঃ বাঙ্গালী)-রচিত শ্লোকে ক্রীড়োন্মুখ শিশু স্কন্দ পিতার জটাজূট লইয়া খেলা করিতেছেন (১।৩০।৪), এবং উমাপতিধরের শ্লোকে শিশু কার্ত্তিকেয় বেশভূষায় পিতা শিবের অনুকরণ করিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছেন (১।৩০।৫)। ইহা যেন শ্রীকৃষ্ণের অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শিশুলীলা শিবের ঘরে দেখা দিয়াছে। ১।৪১ 'বীচি'তে ভৃঙ্গীর বর্ণনায় কয়েকটি শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালীর কথা কবিগণ বর্ণনা করিতেছেন ; এই গৃহী ও ভিখারি শিবের চিত্র একেবারে বাঙ্গালা দেশের, মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই চিত্র বহু কবি আঁকিয়া গিয়াছেন ; এই চিত্রের সূত্রপাত যে মুসলমান-পূর্ব যুগে, তাহা 'সদুক্তি'-র শ্লোকগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়।

বাঙ্গালীর গঙ্গা-প্রীতি ও গঙ্গা-ভক্তি থাকিবেই। গঙ্গা-বিষয়ক দশটি শ্লোক দেব-প্রবাহে আছে ; তন্মধ্যে কেবট্ট পপীপ অর্থাৎ কেওট-জাতীয় কবি পপীপের রচিত শ্লোকটি এই—

বদ্ধাঞ্জলি নৌমি—কুরু প্রসাদম্, অপূর্বমাতা ভব, দেবি গঙ্গে !
অন্তে বয়স্যঙ্কগতায় মহ্যম্ অদেহবন্ধায় পয়ঃ প্রযচ্ছ ॥

অন্যত্র পঞ্চম বা উচ্চাবচ-প্রবাহে (৫।৩১।২), 'বাণী' অর্থাৎ বাক্ বা ভাষা অথবা কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর বর্ণনায়, কেবল 'বঙ্গাল' অর্থাৎ বাঙ্গাল বা পূর্ববঙ্গীয় এই আখ্যায় উল্লিখিত অজ্ঞাতনামা কোনও কবি, নিজ বাণীকে গঙ্গার সহিত উপমিত করিয়াছেন (শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এই শ্লোকটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন)—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ ॥ (বঙ্গালস্য)

অর্থাৎ, প্রচুর-জল-বিশিষ্ট (বাণী-পক্ষে—বিভিন্ন-রস-যুক্ত), গভীর (বাণী-পক্ষে—গভীর-অর্থ-সমন্বিত), বঙ্কিম বা আঁকাবাঁকা (বাণী-পক্ষে—সুন্দর বা মনোহর), ও সুভগা (সুন্দর, ঐশ্বর্য্যশালিনী), এবং কবিদের দ্বারা উপজীবিত গঙ্গাতে তথা "বাঙ্গালের বাণী"তে, অর্থাৎ বঙ্গভাষায়, এই উভয়ে অবগাহন করিলে মানুষ পবিত্র হয়। এখানে আমরা অসংকোচে "বঙ্গাল-বাণী" এই সমস্ত-পদটিকে, আমাদের সুবিধার জন্য, 'বাঙ্গালের বাণী' অর্থাৎ 'বাঙ্গাল-ভাষা' অথবা 'বাঙ্গালা-ভাষা' অর্থে লইতে পারি।

"বাণী" এখানে ভাষা-অর্থে লওয়া চলে ; বিদ্যাপতি-ও 'কীর্তিলতা'তে নিজ ভাষার প্রশস্তি করিয়া গিয়াছেন—

বালচন্দ, বিজ্জাবই-ভাসা—
দুহু নহি লগ্‌গই দুজ্জন-হাসা ॥
ও পরমেসর-হর-সির সোহই,
ঈ নিচ্চই নাঅর-মন মোহই ॥
... ...
দেসিল বঅনা সব-জন-মিট্‌ঠা।
তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহট্‌ঠা ॥

হিন্দীর সাধক-কবি কবীর (পঞ্চদশ শতক) তাঁহার ব্যবহৃত লোক-ভাষার সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গাল-কবির এই শ্লোক পাঠ-কালে স্মরণীয়—

সংস্কৃত কূপজল, কবীরা! ভাষা বহতা নীর।
জব চাহোঁ তবহিঁ ডূবোঁ, শান্ত হোয় শরীর ॥

বিষ্ণুর দশাবতার বিষয়ক শ্লোকাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার-লীলাই ৬০টি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলির বৈশিষ্ট্যের এবং পরবর্তী বাঙ্গালা বৈষ্ণব-পদের সঙ্গে এগুলির যোগের কথা পূর্বে বলিয়াছি। মনে হয়, পরম ভাগবত ভক্ত বৈষ্ণব ও কবি মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের সভার সহিত এই শ্লোকাবলীর অনেকগুলি-ই বিজড়িত। 'গীতম্'-শীর্ষক শ্লোক-পঞ্চকের মধ্যে অজ্ঞাতনামা কোনও (সম্ভবতঃ বাঙ্গালী) কবির এই শ্লোকটি শুদ্ধভক্তির আকর-স্বরূপ, ইহাতে যেন শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদয়াবেগ ধ্বনিত হইতেছে—

যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি রশনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধানুবন্ধোন্মুখাঃ।
যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলামুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিতয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥

কুলশেখর কবির রচিত (ইনি বাঙ্গালী ছিলেন কি না বলা যায় না—তবে মনে হয়, ইহাঁর শ্লোকে যেন চৈতন্য-চরিত্রের পূর্বাভাস পাইতেছি) 'হরিভক্তি' সম্বন্ধে চারিটি, এবং অজ্ঞাতনামা আর একজন কবির একটি, এই পাঁচটি শ্লোক-ই যে-কোনও স্তোত্র-সংগ্রহে গৃহীত হইবার যোগ্য। এই-সমস্ত শ্লোকে খ্রীষ্টাব্দ ১২০০-র পূর্বেই আমরা চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হরিভক্তি যেন চাক্ষুষ করিতে পারিতেছি।

দেব-প্রবাহে অন্যতম দেবতা বাত বা বায়ুর প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক বর্ণনাময় কতকগুলি রোচক শ্লোকের মধ্যে, দক্ষিণ-বায়ুর বর্ণনায় দুইটি শ্লোকে সুদূর দক্ষিণাপথের বিভিন্ন জাতি-সমূহের তরুণীদের কথা আনিয়া দুই জন অজ্ঞাত কবি একটু রোমান্টিক বা রমন্যাস ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

'শৃঙ্গার-প্রবাহ'টি বিশেষ দীর্ঘ। পুরুষ ও নারী, নায়ক ও নায়িকা, বিভিন্ন অবস্থার ও দেশের স্ত্রী, প্রেম, অভিসার, মিলন, বিরহ, গীত বাদ্য নৃত্য প্রভৃতি কলা, প্রাকৃতিক দৃশ্য (যথা—প্রত্যূষ, সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা), ঋতু-বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের, বিশেষ করিয়া গৌড়-বঙ্গের কবিদের মনের ভাব-সম্পুট এই প্রবাহের ৮৭৫টি শ্লোকের মধ্যে পাইতেছি। মাঝে-মাঝে বাঙ্গালার জনগণের যে-সব চিত্র শ্লোকসমূহে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুন্দর, অন্যত্র দুর্লভ; সেইজন্য এগুলির মূল্য অসাধারণ। বাঙ্গালী কবি উমাপতিধর উদীচ্য অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চলের স্ত্রীদের প্রশংসা করিয়া শ্লোক লিখিলেন; বাঙ্গালী কবি অমৃতদত্ত নাগরিকতার সহিত তাহাদের প্রশস্তি গাহিলেন,—

উত্তরাপথ-কান্তানাং কিং ব্রুমো রামণীয়কম্?
যাসাং তুষার-সংভেদে ন ম্লায়তি মুখাম্বুজম্॥ (২।২০।৩)

আবার উত্তর-ভারতের কবি রাজশেখর দাক্ষিণাত্য স্ত্রীদের, পাশ্চাত্য স্ত্রীদের ও গৌড়াঙ্গনাদের-ও বেশ-ভূষার বর্ণনা করিয়া যে-সব শ্লোক বাঁধিয়াছিলেন, শ্রীধরদাস তাঁহার 'সদুক্তি'তে সেগুলি দিয়াছেন। কোনও অজ্ঞাত কবি—সম্ভবতঃ ইনি বাঙ্গালী ছিলেন—বঙ্গ-দেশের অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের মেয়েদের সজ্জা বর্ণনা করিয়াছেন—

বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভি-মসৃণৈর্ গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলা নির্মলং তালপত্রং—
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গণানাম্॥ (২।২০।৫)

ঢাকাই-কাপড়ের দেশের মেয়েরা তো সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিবেই; তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশের মেয়েরা পশ্চিম-বঙ্গেও কচি সাদা তাল-পাতার পাকানো গোঁজ কানে মাকড়ির বদলে পরিত, ধোয়ীর 'পবন-দূত' হইতে সুহ্ম-দেশ বা মেদিনীপুর জেলার মেয়েদের সম্বন্ধে একথা জানা যায়। এই তাল-পাতার কর্ণভূষণ এখনও সুদূর বলিদ্বীপে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। কবি চন্দ্রচন্দ্র (নিশ্চয়ই ইনি বাঙ্গালী ছিলেন—প্রথম 'চন্দ্র' ইঁহার ব্যক্তি-গত নাম, দ্বিতীয় 'চন্দ্র' পদবী), গ্রাম্য তরুণীর বর্ণনায় (২।২১।২), কপালে কাজলের টিপ, তুই হাতে পদ্ম-ডাঁটার বালা, কানে শলাটু-ফলের (? কচি ছোটো-ছোটো বেলের) তুল, স্নানের পরে বাঁধা খোঁপায় তিল-পল্লব গোঁজা, এই চিত্র আঁকিয়াছেন। অভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা, তুর্দিনাভিসারিকা—অভিসার-পর্য্যায়ে এতগুলি বিভাগ আমাদের বাঙ্গালা-পদাবলী-সাহিত্যের কথা-ই স্মরণ করাইয়া দেয়। বনবিহার-কালে একটি সুন্দরী পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া গাছ হইতে ফুল পাড়িতেছে, উমাপতিধর তাহার চিত্র দিয়াছেন (২।১০৭।২)—

> দূরোদঞ্চিতবাহুমূলবিলসচ্চীনপ্রকাশস্তনা-
> ভোগব্যায়তমধ্যলম্বিবসনা নির্মুক্তনাভীহ্রদা।
> আকৃষ্টোজ্ঝিত-পুষ্পমঞ্জরিরজঃপাতাবরুদ্ধেক্ষণা
> চিন্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্র-তুস্থা তনুঃ॥

বিবিধ প্রকারের নায়কের মধ্যে 'গ্রাম্য-নায়ক'-এর বর্ণনা-প্রসঙ্গে, সেকালের কৃষক-যুবকের জীবনের সুখের চিত্র (কবি, যোগেশ্বর)—

> ব্রীহিঃ স্তম্বকরিঃ প্রভূতপয়সঃ, প্রত্যাগতা ধেনবঃ;
> প্রত্যুজ্জীবিতমিক্ষুণা ভৃশমিতি ধ্যায়ন্নপেতান্যধীঃ।
> সান্দ্রোশীরকুটুম্বিনীস্তনভর-ব্যালুপ্তঘর্মক্লমো
> দেবে নীরমুদারমুজ্মতি, সুখং শেতে নিশাং গ্রামণীঃ॥ (২।৮৪।৩)

'প্রচুর জলের জন্য ধান বেশ গজাইয়া উঠিয়াছে, গোরুগুলি ঘরে ঘিরিয়া আসিয়াছে, আখও হইবে প্রচুর, অন্য চিন্তা আর নাই; ঘরের স্ত্রীও এই অবসরে স্নিগ্ধ উশীর বা বেনামূলের রসে প্রসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, আকাশ হইতে খুব জল পড়িতেছে, এই অবস্থায় গ্রামীণ যুবক আরামে নিদ্রা যাইতেছে।' এই শ্লোকে আমরা পালি 'সুত্ত-নিপাত' গ্রন্থের প্রাচীন-ভারতীয় কৃষকের আনন্দ-গীতের প্রতিধ্বনি পাইতেছি—

পক্কোদনো দুগ্ধ-খীরোঽহমস্মি, অনুতীরে মহিয়া সমান-বাসো ;
ছন্না কুটী, আহিতো গিনি ;— অথ চে পৎথয়সি, পবস্‌স, দেব ॥ ইত্যাদি

'আমার ঘরে ভাত রাঁধা হইয়া গিয়াছে (অথবা আমার সব ধান পাকিয়া উঠিয়াছে), আমার গোরুর দুধ দোহা হইয়া গিয়াছে ; চিরকাল আমি মহী-নদীর তীরে বাস করি ; আমার কুঁড়ে' ঘরটি বেশ ছাওয়া, ঘরে আগুনও জ্বালা আছে ; যদি চাও, দেবতা, তো এখন যত ইচ্ছা জল বর্ষণ করো।'

'শিশির-গ্রাম' অর্থাৎ শীতকালে গ্রামের শোভা অজ্ঞাতনামা গৌড়ীয় কবি এইভাবে দেখাইয়াছেন—

শালিচ্ছেদ-সমৃদ্ধ-হালিকগৃহাঃ সংস্পৃষ্ট-নীলোৎপল-
স্নিগ্ধ-শ্যাম-যবপ্ররোহ-নিবিড়ব্যাদীর্ঘ-সীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্ত-ধেন্বনডুহচ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ
সংসক্ত-ধ্বনদিক্ষুযন্ত্র-মুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ ॥ (২।১৩৬।৫)

'শীতকালে হালিক অর্থাৎ হালিয়া বা কৃষকের ঘর কাটা ধানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে ; গ্রামের সীমান্তের ক্ষেত্রসমূহে যে প্রচুর যব হইয়াছে, তাহার অঙ্কুর, পার্শ্ববর্তী জলাশয়ের নীলপদ্মের মতো স্নিগ্ধ-শ্যাম ; গাভী, বলদ ও ছাগ-সমূহ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নূতন খড় পাইয়া আনন্দিত ; ক্রমাগত আখ-মাড়া কলের শব্দে মুখরিত গ্রামসকল এখন নূতন ইক্ষু-গুড়ের সৌরভে আমোদিত।'

দ্বিতীয় প্রবাহ বা 'শৃঙ্গার-প্রবাহ' সাধারণ মানুষের প্রেম, সুখ-দুঃখ, দৈনিক জীবন, ঋতু-চর্য্যা প্রভৃতি বিষয়ের শ্লোকের সংগ্রহ ; তৃতীয় প্রবাহ অর্থাৎ 'চাটু-প্রবাহ' রাজা ও মহাপুরুষ, যুদ্ধ, কীর্তি প্রভৃতি লইয়া। এই প্রবাহে বেশি নয়, ২৭০টি শ্লোক মাত্র। ইহার মধ্যে জয়দেব কবির যুদ্ধ- ও শৌর্য্য-বিষয়ক কতকগুলি শ্লোক আছে ; এগুলি হইতে বুঝা যায় যে, জয়দেব কেবল 'বিলাস-কলায় কুতূহল' ও সঙ্গে-সঙ্গে 'হরিচরণ-স্মরণে সরস-মন' কবি ছিলেন না, রাজার শৌর্য্য ও বীর্য্য, যুদ্ধক্ষেত্র, তূর্য্য নিনাদ, ধর্ম-সংস্থাপন, খড়্গ-ঝঞ্ঝনা, সংগ্রাম-কীর্তি প্রভৃতি বিষয়ও তাঁহাকে দিয়া শ্লোক লিখাইয়াছিল। জয়দেবের এই-সকল শ্লোক হইতে (এগুলি আমার পূর্বপ্রকাশিত "শ্রীজয়দেব কবি"-শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি) ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, এগুলি তাঁহার রচিত মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের শৌর্য্য-প্রশস্তি-মূলক কোনও বীররস-প্রধান সংস্কৃত কাব্য, যাহা অধুনা-লুপ্ত, তাহা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। এই অনুমানের স্বপক্ষে এইটুকু বলা চলে যে, শ্রীধরদাসের উদ্ধৃত জয়দেব-নামাঙ্কিত ৩১টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি

'গীতগোবিন্দ' হইতে গৃহীত; অবশিষ্ট ২৬টির মধ্যে কয়েকটি অন্ততঃ তাঁহার রচিত অন্য কোনও কাব্য হইতে গৃহীত হওয়া অসম্ভব নহে। ধোয়ী কবির 'পবন-দূত' এইরূপ অনুমানের সমর্থন করে। লক্ষ্মণসেনের প্রশংসায় রচিত জয়দেবের এই শ্লোকটি লক্ষণীয়—

লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ! জংগম-হরে! সংকল্প-কল্পদ্রুম!
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ! সঙ্গরকলা-গাঙ্গেয়! বঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র! প্রতিরাজ-রাজক! সভালংকার। কর্ণার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল! পালক সতাং! দৃষ্টোঽসি, তুষ্টা বয়ম্ ॥ (৩।১১।৫)

['লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ' = লক্ষ্মীনায়ক, লক্ষ্মীকান্ত। 'জংগম-হরে' = চলন্ত নারায়ণ-স্বরূপ। 'সঙ্গরকলা-গাঙ্গেয়' = যুদ্ধবিদ্যায় ভীষ্ম। 'প্রতিরাজ-রাজক' = লেখক-শ্রেষ্ঠ।]

'চাটু-প্রবাহে' নানাবিধ বিষয়ের কথা আছে; যেমন, চাটু, বিদ্যা, গুণ, ধর্ম, রূপ, দৃষ্টি, দেহাংশ, অত্যুক্তি, চিত্রোক্তি, কার্য্য-গর্ব, দান, দরিদ্র-পালন, বিক্রম, পৌরুষ, শৌর্য্য, প্রতাপ, হস্তী অশ্ব নৌকা সেনা, বিবিধ খড়্গ, যুদ্ধ-যাত্রা, যুদ্ধক্ষেত্র, দিগ্বিজয়, শত্রু, শত্রুনারী, শত্রুদেশ, যশ প্রভৃতি সাধারণ জীবনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এইরূপ নানা বিষয়ের অবতারণা, যাহার জন্য মানুষকে সকলে চাটুবাদ বা প্রশংসা করিয়া থাকে; সেই-সব বিষয় এই প্রবাহের শ্লোকাবলীর মধ্যে আছে।

চতুর্থ, 'অপদেশ-প্রবাহ'। 'অপদেশ' অর্থে 'স্থান', তদনন্তর 'ব্যাজ' অর্থাৎ 'ছল' অথবা 'লক্ষ্য'; 'ব্যাজ-স্তুতি' অর্থাৎ 'স্তুতিচ্ছলে নিন্দা', অথবা 'নিন্দাচ্ছলে স্তুতি', কিংবা 'দ্ব্যর্থ-বাক্য', এই অর্থেও এই শব্দ গ্রহণ করা যায়। কতকগুলি দেবতা ও প্রাকৃতিক বস্তুর এই প্রকার নিন্দা- ও স্তুতি-ব্যঞ্জক বর্ণনার শ্লোক লইয়া এই প্রবাহের আরম্ভ; বাসুদেব, মহাদেব, শিবগণ, সূর্য্য, চন্দ্র, সমুদ্র (সমুদ্রের গুণ ও নিন্দা লইয়া ৬টি বীচিতে ৩০টি শ্লোক), অগস্ত্য ঋষি, জল, শঙ্খ, মণি, নানা রত্ন, ও স্বর্ণ; নদ-নদী, সরোবর (বিভিন্ন প্রকারের), মীন, সর্প, ভেক, পদ্ম, ভ্রমর, পর্বত, মলয়; বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন অবস্থার সিংহ গজ মৃগ ও অন্য পশু; নানা প্রকারের বৃক্ষ; মরুভূমি; মেঘ, চাতক; হংস, কোকিল, শুক, ইত্যাদি; কবি-প্রসিদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট বস্তুগণের বর্ণনার সমাবেশে এই 'অপদেশ-প্রবাহ'। ইহাতে ৩৬০টি শ্লোক আছে।

শেষ, 'উচ্চাবচ' অর্থাৎ বিবিধ-বিষয়ক বা প্রকীর্ণ প্রবাহ। ইহাতে মনুষ্য, তুরঙ্গ, গো প্রভৃতি পশু, পারাবত বক আদি পক্ষী; গিরি, বন, নদ-নদী, তড়াগ,

চক্রবাক প্রভৃতি কবি-স্তুত বস্তু ; ধনুর্ভঙ্গ, হনুমান্ প্রভৃতির বীরত্ব, দশমুখ রাবণের শিরশ্ছেদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার ; কবি, বিভিন্ন কবির যশ ও গুণ, কাব্যচোর ; সজ্জন, দুর্জন, মনস্বী, সেবক, কৃপণ, ক্ষুদ্রোদয়-দুঃখিত, দারিদ্র্য, দরিদ্র-গৃহ, দরিদ্র-গৃহিণী, প্রভৃতি অবস্থার মানুষ ; জরা, বৃদ্ধ ; অনুশয়, বিচার, নির্বেদ, প্রভৃতি মনোভাব ; কারুণিক, বনগমনোৎসুক, তপস্বী প্রভৃতি ভাবের মানুষ ; ভবিতব্যতা, দেব, কাল, শ্মশান ; সমস্যা ; ইত্যাদি নানা অনপেক্ষিত বিষয়ের শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রবাহের শেষে শ্রীধরদাস, পিতা "প্রতিরাজ" বা রাজার লেখক বা খাস-মুন্‌শী বটুদাসের প্রশস্তি-খ্যাপক পাঁচটি শ্লোক দিয়াছেন, এগুলির মধ্যে চারিটির কবি বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন সাঞ্চাধর (? সাঁচা = সত্য + ধর), বেতাল, উমাপতিধর ও কবিরাজ ব্যাস। এই প্রবাহে ৩৮০টি শ্লোক আছে।

বিষয়-বস্তুর ব্যাপকতা দেখিয়া এই কবিতা-চয়নিকা পুস্তকখানির বিশ্বম্ভরত্ব বা সর্বগ্রাহিতা অনুধাবন করা যায়—ইহাকে Poetic Encyclopædia of Life অর্থাৎ সমগ্র জীবনের কাব্যময় বিশ্বকোষ বলা যায়। শ্রীধরদাস যে একজন সংস্কৃতি-পূত চিত্তের মানুষ ছিলেন, জীবনের সব দিক্ তিনি স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই অপূর্ব গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্ট। এই বই ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকের বাঙ্গালার সংস্কৃতির এক গৌরবময় নিদর্শন।

এতাবৎ-উপলব্ধ প্রাচীনতম মৈথিল বই, কবিশেখর জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের রচিত কথকতার পুঁথি 'বর্ণরত্নাকর' (খ্রীষ্টীয় ১৩২৫ সালের দিকে প্রস্তুত) এক হিসাবে এই ভাবের সর্বগ্রাহী গ্রন্থ—জীবনের সব কিছু লইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা ইহাতেও আছে।*

আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই বইয়ের সহিত পরিচয় হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে চাই—বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদের সহিত এই বইয়ের একটি সংস্করণ। সঙ্গে-সঙ্গে, অন্য সংগ্রহ-পুস্তক-সমূহ হইতে গৌড়-বঙ্গের কবিদের রচিত, 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র বাহিরে যে-সব শ্লোক পাওয়া যায়, সেগুলি, এবং বাঙ্গালার প্রাচীন লেখমালায় প্রাপ্ত কবিত্বপূর্ণ নমস্কার- বা মঙ্গলাচরণ-শ্লোক-সমূহ,—এগুলিও দেওয়া চাই। 'গীতগোবিন্দ'-র বহু বাঙ্গালা সংস্করণ আছে ;

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ববুআ মিশ্র ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়, 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থখানি, বৃহৎ ইংরেজি ভূমিকা ও শব্দ-সূচী সমেত, কলিকাতার Asiatic Society হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

তদনুরূপ ধোয়ীর 'পবন-দূত' এবং গোবর্ধনাচার্য্যের 'আর্য্যাসপ্তশতী'র-ও বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ সংস্করণ সাহিত্য-রসিক বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হওয়া উচিত। 'আর্য্যাসপ্তশতী'-তে আর্য্যাচ্ছন্দে ৭০০ প্রেম-বিষয়ক শ্লোক বা কবিতা আছে। বহু পূর্বে সংবৎ ১৯২১-এ অর্থাৎ ৮০ বৎসর পূর্বে ঢাকা হইতে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা অক্ষরে মূল 'আর্য্যাসপ্তশতী' প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে বাঙ্গালীর সংস্কৃত-জ্ঞানের কীর্তি-স্বরূপ এই বই বাঙ্গালা-দেশে প্রায় অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই সমস্ত বই প্রকাশিত হইবার পরে, প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদের রচিত সংস্কৃত কাব্য-কবিতার আস্বাদন এবং আলোচনা, বাঙ্গালী সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাহিত্যামোদী এবং সাহিত্য-বিষয়ক গবেষকদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। ইংরেজি-যুগের পূর্বেকার বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাব-ধারা যে এই-সব সংস্কৃত কবিতায় বহুল পরিমাণে গিয়া পঁহুছায়, 'সদুক্তিকর্ণামৃত' যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের, সংস্কৃত-ভাষার বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল একটি পট-ভূমিকা স্বরূপ বিদ্যমান, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের উপমা আশ্রয় করিয়া বলা যায়, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বের যুগে দেশ-ভাষায় অজ্ঞাত ও অশিক্ষিত কবিরা যে গান বা পদ বা কবিতা লিখিতেন, সেগুলি ছিল যেন মাটির প্রদীপ ; সেই-সব মাটির প্রদীপ ক্ষণিকের কাজ সারিয়া মাটির মধ্যে কালের গর্ভে আবার বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই-সব সংস্কৃত শ্লোক যেন ভাষার গৌরবে স্বর্ণ-প্রদীপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; নিখিল-ভারতের কাছে সেগুলির মূল্য হইবে বলিয়া, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির কবিগণ সেই প্রদীপগুলি গড়িয়া গিয়াছেন, যেন সেগুলির বর্তিকা চিরকাল ধরিয়া জ্বলে। এই-সমস্ত উজ্জ্বল স্বর্ণ-প্রদীপ হইতে যদি সে যুগের ভাষা-কবিতার মৃৎপ্রদীপের স্নিগ্ধ জ্যোতির কিছু আভাস পাওয়া যায়, সেকালের জনসাধারণের জীবনের চিত্র, আমাদের পূর্বপুরুষ সেকালের বাঙ্গালা-দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের, আশা-আশঙ্কার, 'দৃষ্টি-ভঙ্গী'র ও কার্য্য-রীতির কিছু-মাত্রও প্রতিফলন হয়, এবং আধুনিক মানুষ আমরাও যদি ইহা হইতে কিছু পরিমাণে রসোপভোগ করিতে পারি, তাহা হইলে শ্রীধরদাসের এই সংগ্রহ চিরকালের জন্য সার্থক সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, ' "বিশ্বজন" যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি' ॥

বিশ্বভারতী পত্রিকা
দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫০

এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন রূপ বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভারতবর্ষে আনীত হয় আর্য্যগণের দ্বারা। সুদূর রুষ-দেশে উরাল-পর্বতের দক্ষিণে কাস্পিয়ান ও আরাল হ্রদ-দ্বয়ের উত্তরে, এখনকার কালের তুর্কীভাষী খিরঘিজ্ ও কাজাক জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ভূখণ্ডে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেরা বাস করিত; ইহাদের মধ্যে যে-ভাষা ঐ সময়ে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা-ই পরবর্তী কয়েক বর্ষ-সহস্রকের মধ্যে বিবিধ প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়—হিত্তী, বৈদিক, অবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক, প্রাচীন গ্রীক, লাতীন, গথিক, প্রাচীন তুষারীয়, প্রাচীন কেল্ট, প্রাচীন বাল্ট্, প্রাচীন স্লাব প্রভৃতি ভাষাতে মূল ইন্দো-ইউরোপীয়ের পরিণতি ঘটে। কোন্ পথ ধরিয়া ইন্দো-ইউরোপীয়গণ তাহাদের আদি পিতৃভূমি হইতে ভারতবর্ষে আসে, তাহা ঠিক-মতো জানা যায় না; তবে কতকগুলি প্রাচীন লেখের প্রমাণে এইরূপ অনুমান হয় যে, ইহাদের একটি দল আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২২০০-র দিকে কৌকাস্ বা ককেশস্ পর্বতমালার দক্ষিণে, মেসোপোতামিয়া বা ইরাকের উত্তরে, আধুনিক কালের পূর্ব-তুর্কীদেশে ও উত্তর-পশ্চিম ঈরানে প্রথম দেখা দেয়। এখানে কিছুকাল ধরিয়া ইহারা অবস্থান করে, পরে ধীরে-ধীরে পূর্ব-তুর্কীদেশে, ইরাকে ও পশ্চিম ঈরানে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাহার পর ঈরান ও আফগানিস্থান হইয়া ভারতে আসে।

আদি যুগের ইন্দো-ইউরোপীয়েরা সভ্যতায় তেমন উন্নত ছিল না; ইহাদের তুলনায় মিসরী, প্রাচীন গ্রীসের আদিম অধিবাসী, এবং বাবিল ও অসুর জাতির লোকেরা নাগরিক সভ্যতায় অনেক বেশি অগ্রসর হইয়াছিল। আদি ইন্দো-ইউরোপীয়েরা কিন্তু প্রাচীন সভ্য জগৎকে একটি জিনিস দান করে, সেটি হইতেছে ঘোড়া। ইহাদের পিতৃভূমিতে ঘোড়া বন্য অবস্থায় চরিত, সেখানেই ইহারা ঘোড়াকে ধরিয়া পোষ মানাইয়াছিল। ঘোড়াকে বশে আনিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া ও তাহাকে দিয়া রথ বা গাড়ি টানাইয়া, সেই সুপ্রাচীন যুগে ইহারা মানব-সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ঘোড়ার সাহায্যে দ্রুত গমনাগমন সহজ হয়, বিভিন্ন জাতির দূর-দূর দেশে প্রসার ও পরস্পরের উপর প্রভাব-বিস্তার পূর্বের তুলনায় আরও দ্রুত ও ব্যাপক-ভাবে ঘটিতে থাকে।

ইন্দো-ইউরোপীয়দের কতকগুলি উপজাতি বা দল, উরাল-পর্বতের দক্ষিণ হইতে পশ্চিম মুখে গিয়া ইউরোপে উপনিবিষ্ট হয়, ইউরোপের নানা দেশে ইহাদের বংশধরেরা প্রাচীন কেল্‌টীয়, ইতালীয়, জর্‌মানীয়, হেল্লেনীয় বা গ্রীক, বাল্‌টীয় এবং স্লাব প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হয়। আর একটি দল পূর্ব মুখে গিয়া মধ্য-এশিয়ায় বাস করিতে থাকে; ইহাদের উত্তর-পুরুষদের পরে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্য-ভাগে উত্তর-সিন্-কিয়াঙ্ (বা চীনা তুর্কীস্থান) দেশে 'তোখারীয়' জাতি-রূপে দেখা যায়; প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা মধ্য-এশিয়ার এই তোখারীয় জাতির সহিত পরিচিত ছিল ও ইহাদিগকে 'ঋষিক' ও 'তুষার' নামে অভিহিত করিত। এই-সব বিভিন্ন ইউরোপীয় দল ব্যতিরেকে, আরও দুইটি দল এশিয়া-মাইনরের দিকে আসে; ইহাদের একটি কোনও অজ্ঞাত সময়ে এশিয়া-মাইনরের মধ্য-ভাগে উপনিবিষ্ট হয়; খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-র দিকে ইহাদের ভাষা, হিত্তী বা কানীসীয় ভাষা, এশিয়া-মাইনরের একটি দুর্ধর্ষ শাসক জাতির ভাষা-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে দেখা যায়। দ্বিতীয় দলটি ঈরানীয় ও ভারতীয় আর্য্যদের পূর্ব-পুরুষদের লইয়া; সম্ভবতঃ ককেশস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া ইহারা উত্তর-ইরাকে ২২০০।২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আসিয়া উপনীত হয়। এই দলটি হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আর্য্য-শাখা।

খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় সহস্রকের শেষের কয় শতকে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আর্য্যেরা তাহাদের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থার অন্ধ তমিস্রা হইতে সুসভ্য এবং ইতিহাস-প্রবিষ্ট জাতিগণের সংস্পর্শে প্রথম আসিতেছে। অসুর-বাবিল-জাতীয় জনগণ তাহাদের প্রাচীন লেখে এই নবাগত আর্য্যদের আগমন উল্লেখ করিতেছে। আর্য্যদের আগমন উত্তর হইতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহারা ঐ অঞ্চলে প্রথম ঘোড়া আনয়ন করিয়াছিল। অসুর-বাবিল দেশের অর্থাৎ প্রাচীন ইরাকের লোকেরা ঘোড়ার সহিত পরিচিত ছিল না—তাহাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গোরু, ভেড়া, ছাগল, উট ও গাধা ছিল; ঘোড়া ওদেশের পশু ছিল না, আর্য্যদের নিকট হইতে তাহাদের পিতৃভূমি হইতে আনীত ঘোড়া ইহারা পরে পাইয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে যখন উরাল-পর্বতের দক্ষিণ-অঞ্চলে ও দক্ষিণ-রুষ দেশের সমতল ভূভাগে আর্য্যগণ অথবা তাহাদের পিতৃপুরুষ ইন্দো-ইউরোপীয়গণ বাস করিত, তখন দক্ষিণের অসুর-বাবিল বা ইরাক দেশের লোকদের নিকট হইতে গোরুর প্রসার উত্তরে ইন্দো-ইউরোপীয়গণের মধ্যে ঘটিয়াছিল—আগে ইন্দো-ইউরোপীয়গণ ঘোড়া ও ভেড়া

মাত্র পুষিত ; গাধা, গোরু ও ছাগল তাহাদের মধ্যে ছিল না ; সুতরাং দেখা যাইতেছে, দক্ষিণের গোরু উত্তরে আর্য্যদের পূর্ব-পুরুষদের দ্বারা গৃহীত হয়, এবং যেন তাহার পরিবর্তে উত্তরের ঘোড়া আর্য্যদের দ্বারায় দক্ষিণে আনীত হয়।

আর্য্যেরা ইরাকে আসিয়াছিল, কতকটা দলবদ্ধ-ভাবে লুঠ-তরাজ করিবার জন্য, ও জো পাইলে দেশে উপনিবিষ্ট হইবার জন্য ; এবং কতকটা দুই-এক জন করিয়া, ঘোড়া বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে। যাহা হউক, খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে আর্য্যগণ উত্তর-ইরাকে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। ইহাদের হিত্তী বা কানীসীয় শাখার জ্ঞাতিগণ এশিয়া-মাইনরের একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতি রূপে উপনিবিষ্ট হইয়াছে—হিত্তী ভাষায় উৎকীর্ণ লেখমালা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মাত্র বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইঁহাদের শ্রমের ফলে প্রাচীন কালের একটি বিশিষ্ট ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ভাষা আমাদের সংস্কৃতের একটু দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতি—এইরূপ জ্ঞাতিত্ব-সূত্রে ইহা গ্রীক, লাতীন, স্লাব, বাল্টিক, জর্মানিক, কেল্টিক প্রভৃতি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির সহিতও সম্পৃক্ত।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিক্ হইতে আর্য্য ভাষার শব্দ ও নাম অসুর-বাবিলদের ভাষায় উৎকীর্ণ লেখসমূহে পাওয়া যাইতেছে। আর্য্যদের কয়েকটি শাখা ঐ সময়ের কিছু পরে, ইরাক-অঞ্চলে, স্বকীয় শৌর্য্য-বলে, কতকগুলি দেশ অধিকার করিয়া লয়, ও স্থানীয় অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে থাকে। 'মিতান্নি' নামে একটি আর্য্য-শাখা ইহাদের অন্যতম। 'কাস্সী' (=কাশি ?) নামে আর একটি শাখা ১৭৪৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বাবিলন-নগরী অধিকার করিয়া লয়, এবং বাবিলনে কাশি-বংশীয় আর্য্য রাজারা কয়েক শতক ধরিয়া রাজত্বও করে। 'মিতান্নি', 'কাশি', 'হারুরি' বা 'আরুরি' (আর্য্য ?) নামক এই সব আর্য্য বংশ, ঐ দেশের জনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের মধ্যে বাস করার ফলে, ক্রমে নিজেদের আর্য্য ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া যায়, ও স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া নিজ পৃথক্ জাতিসত্তা হারাইয়া ফেলে। ধীরে ধীরে এই ব্যাপার ঘটে। কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৪০০।১৩০০-র পরে। ঐ সময় পর্য্যন্ত ইহাদের ভাষার অস্তিত্বের বহু প্রমাণ স্থানীয় লেখাবলীর মধ্য হইতে পাওয়া যায়।

ইরাকের অসুর-বাবিল জাতির লেখ ও অনুশাসনে রক্ষিত খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ আনুমানিক ২০০০ হইতে ১৪০০ বা ১৩০০ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত আর্য্য ভাষার শব্দ ও

নাম পাওয়া যায়, সেগুলিকে বৈদিক সংস্কৃতের পূর্ব অবস্থার ভাষার শব্দ ও নাম বলা যায়। এই যুগের আর্য্যভাষা, একদিকে ভারতে আগত আর্য্যগণের বৈদিক ভাষা, ও অন্যদিকে ঈরানে উপনিবিষ্ট আর্য্যগণের প্রাচীন ঈরানী (পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ অবেস্তায় ও পারস্যদেশে বাণমুখ লিপিতে পর্বতগাত্রে ও অন্যত্র উৎকীর্ণ প্রাচীন-পারসীক অনুশাসনে রক্ষিত)—এই উভয় প্রকার ভাষার জননী। ইহাকে একসঙ্গে 'প্রাক্-সংস্কৃত' ও 'প্রাক্-ঈরানী' বলা যায়। ভারতে আর্য্যদের আগমন ঘটে ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পরে—এই মতবাদ-ই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষা ভারতে আসিয়া ভারতীয় চিন্তা ও সভ্যতার বাহন হইবার পুর্বেই, ইহার 'প্রাক্-সংস্কৃত' অবস্থাতেই একটি প্রতাপশালী জাতির ভাষা হিসাবে, পশ্চিম-এশিয়া-খণ্ডে ইহার কতকটা প্রতিপত্তি ও প্রসার ঘটে। অর্বাচীন কালে সংস্কৃতের ভগিনী-স্থানীয়া প্রাচীন ঈরানী ভাষার পরবর্তী রূপ প্রাচীন-পারসীক, মধ্য-পারসীক বা পহ্লবী এবং আধুনিক-পারসীক বা ফারসী ইরাকে ও পশ্চিম এশিয়ার অন্যত্র, সেই প্রসার ও প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

'প্রাক্-সংস্কৃত' বা বৈদিক-পূর্ব আর্য্যযুগের সংস্কৃত তখনও কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতির বাহন হইতে পারে নাই, কারণ আর্য্য জাতি তখনও কতকটা আদিম যাযাবর অবস্থায় ছিল—বৈষয়িক সভ্যতায় ইহারা তখনও বেশি অগ্রসর হইতে পারে নাই; অসুর-বাবিলদের বিরাট্ ঐশ্বর্য্যময় সভ্যতা ইহাদিগকে তখন বিশেষ-ভাবে অভিভূত করিয়াছিল, ইহারা নিজেরাই অনেক কিছু নূতন বস্তু শিখিতেছিল। কিন্তু ইহারা ইরাক-অঞ্চলে ঘোড়া আনিয়াছিল; ঘোড়াকে শিখাইবার কালে আর্য্য অশ্বপালগণ যে-সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিত, সেইরূপ কতকগুলি শব্দ অসুর-বাবিল লেখের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই শব্দগুলির রূপ হইতে বুঝা যায় যে, এগুলি সংস্কৃতের পূর্ব অবস্থার শব্দ। যেমন, ঘোড়াকে মাঠে এক বার দৌড় করাইতে হইলে বলিত aika-wartana = 'অইক-ৱর্তন', অর্থাৎ সংস্কৃত 'এক-ৱর্তন'; তিন বার দৌড় করাইবার কালে বলিত tera-wartana = 'তের(= তির বা ত্রি ?)-ৱর্তন'; তদ্রূপ panza-wartana = পঞ্চ-ৱর্তন, satta-wartana = সত্ত(= 'সপ্ত')-ৱর্তন, nawa-wartana = নৱ-ৱর্তন; ঘোড়াকে থামানোকে বলিত wasana 'ৱসন'। অন্য শব্দের মধ্যে পাইতেছি maria = 'মর্য' (বৈদিক শব্দ, অর্থ 'বীর' বা 'মানুষ'), tapashash = 'তপঃ' (উত্তাপ); দেবতার নাম = Shuriash =

'স্বর্ঃ', Maruttash='মরুত', Shugamuna=মহামায়ী অথবা জ্যোতির দেবতা, বৈদিক প্রতিরূপ 'শোকমনাঃ' ('শুচ্'-ধাতু দীপ্তি অর্থে, তাহা হইতে), Dakash=নক্ষত্রগণের পিতারূপে উক্ত দেবতা, সংস্কৃত 'দক্ষ' (=দক্ষ), Shimalia=*Zhimalia=উজ্জ্বল অর্থাৎ হিম বা তুষার-ধবল পর্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবী, 'হিমালা', সংস্কৃত 'হিম'-শব্দের প্রাচীনতম প্রাক্-সংস্কৃত বা আর্য্য রূপ źhima এখানে পাইতেছি ; Indara='ইন্দ্র', Mitra='মিত্র', Nashattiya ='নাসত্য' অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়, Uruwna বা Aruna='বরুণ' ; এবং রাজাদের নাম, যথা Abirattash='অভিরথঃ', Shuzigash='সুজীগঃ', Artamanya='ঋতমন্যু', Arzawiya='আর্জব্য', Aitagama= *'অইতগাম', বৈদিক 'এতগাম', Artashumara='ঋতস্মর', Shuwardata =*'স্বর্দাত' বা 'স্বর্দত্ত', Tushratta=Duzhratha='দূরথ', ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দ ও নাম হইতে, ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা আসিবার পূর্বেই ইহার পূর্ব রূপ আর্য্য বা ভারত-ঈরানীয় ভাষা কিরূপে এশিয়া-খণ্ডের সভ্য জনমণ্ডলে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ হইতে ১৩০০—এই সময়ের মধ্যে আর্য্য জাতির জগৎকে আর কিছু দিবার ছিল না, এক অশ্ব-পালন ছাড়া ; সুতরাং এই সময়ের মধ্যে অন্য জাতির উপরে আর্য্যদের প্রভাব, ভাষায় ও জীবনের অন্য দিকে তেমন কার্য্যকর হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ হইতে ১৩০০-র মধ্যে ইরাক হইতে আরও পূর্বে ঈরানে আর্য্যগণ আসিয়া উপনিবিষ্ট হইল, এবং ঈরান হইতে ভারতে আসিল। প্রাক্-বৈদিক ভাষা ইহাদের দ্বারা ভারতে আনীত হইল, উত্তর-পাঞ্জাবে ইহার প্রথম স্থাপনা হইল। ভারতে তখন অস্ট্রিক(কোল, মোন্-খ্মের)- ও দ্রাবিড়-ভাষী লোকের বাস ছিল ; ইহাদের মধ্যে দ্রাবিড়-ভাষীরা নাগরিক সভ্যতায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। নবাগত আর্য্যগণ শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ লোক হইলেও, নাগরিক সভ্যতায় দ্রাবিড়দের অপেক্ষা হীন ছিল বলিয়াই মনে হয়। অস্ট্রিকদের সভ্যতা মুখ্যতঃ গ্রামীণ সভ্যতাই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। আর্য্যগণ আংশিক-ভাবে যাযাবর ও আংশিক-ভাবে কৃষিজীবী ছিল। পাঞ্জাবেই আর্য্যদের বাস বেশি করিয়া ঘটে, কারণ ভারতের এই অঞ্চল আর্য্যদের কেন্দ্র-স্থানীয় ঈরানের পাশেই অবস্থিত ছিল। (ব্যাপক অর্থে 'ঈরান' বলিলে, পারস্য আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান এই তিন দেশকেই ধরিতে হয়।) পাঞ্জাব হইতে আর্য্যগণ প্রথমটায় পূর্বদিকে,

গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রসৃত হয়; পরে সিন্ধু প্রদেশে ও দক্ষিণে মরুদেশে, ও গুজরাটের এবং মহারাষ্ট্রের দিকে ইহাদের বিস্তৃতি ঘটে। গঙ্গার দেশে বেশী করিয়া অনার্য্যদের সঙ্গে আর্য্যদের মিশ্রণ ঘটে, এবং এই মিশ্রণের ফলে উত্তর-ভারতে একটি নবীন জাতি ও সভ্যতার উদ্ভব হয়—সেটি হইতেছে প্রাচীন ভারতের হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতা। বৈদিক যুগের পর হইতে এই সভ্যতা ধীরে-ধীরে রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। ইহার সংগঠনে আর্য্য ও অনার্য্য উভয়েরই আহৃত উপাদান মিলিত হয়। এই নবীন সভ্যতাকে 'পৌরাণিক হিন্দু' সভ্যতাও বলা যাইতে পারে। বৈদিক সভ্যতা—ঋগ্‌বেদ আদি চারি বেদ এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি যাহার পরিচায়ক—তাহা হইতেছে মুখ্যতঃ আর্য্যজাতির জিনিস। ব্রাহ্মণ-যুগ হইতেই বেশি করিয়া জীবনে এবং ভাব-জগতে আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রণ ঘটিতে থাকে। জৈন, বৌদ্ধ, এবং উত্তর কালের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধের শেষ ভাগ হইতে যে রূপ গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা আরভমান আর্য্য-অনার্য্যের মিলনের ফল।

এইভাবে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি সময়ে আর্য্য-অনার্য্য, বৈদিক-অবৈদিক অথবা হিন্দু সভ্যতা, একটি বিশিষ্ট বস্তু হইয়া দেখা দিল। আর্য্য জগতের প্রাচীন বৈদিক রূপ, আর্য্যদের বিশুদ্ধি, আর রহিল না; অনার্য্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জগৎ-ও আর অবিমিশ্র রহিল না। ভিতরে-ভিতরে বহু অনার্য্য ভাব, চিন্তাধারা ও অনুষ্ঠান এই নবীন মিশ্র সভ্যতায় স্থান পাইল। কিন্তু বাহির হইতে হইল আর্য্যের ভাষার জয়-জয়কার। উপর-উপর আর্য্য ভাষা ঠিক আছে বলিয়া মনে হইলেও, ইহাতে বহু অনার্য্য শব্দ প্রবেশ করিল, এবং নানা স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ে ইহাতে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব আসিল, বৈদিক ভাষার ভাঙ্গন ধরিল। আর্য্যের বৈদিক ভাষা পরিবর্তিত হইয়া প্রাকৃতের রূপ ধারণ করিতে লাগিল—পূর্ব-ভারতেই এই পরিবর্তন একটু দ্রুত ঘটিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ৫০০-৪০০ শতকে পশ্চিম-পাঞ্জাব অঞ্চলে—পাণিনির দেশে—প্রচলিত আর্য্য ভাষা তখনও বৈদিক যুগের ভাষা হইতে বেশি পরিবর্তিত হয় নাই। পাঞ্জাব অঞ্চলের এই 'লৌকিক' বা কথিত ভাষার আধারে, পাণিনির পূর্ববর্তী আচার্য্যদের এবং স্বয়ং পাণিনির চেষ্টায়, একটি সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠিল, যেটি 'সংস্কৃত' নামে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল; এবং প্রথম-প্রথম বৌদ্ধ ও জৈনেরা পূর্ব-ভারতের ও মধ্য-ভারতের কথিত ভাষা, প্রাচীন প্রাকৃত (মাগধী, পালি ও অর্ধমাগধী) যদিও তাহাদের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে ব্যবহার করিত, তথাপি ক্রমে

তাহারাও ব্রাহ্মণদের মতো সংস্কৃতকেও মানিয়া লইল। এদিকে সংস্কৃত ভাষা নিজেও প্রাকৃতের প্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ক্রমে ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন মুখ্য রূপে প্রকাশিত নবীন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন হইয়া দাঁড়াইল। উত্তর-ভারতে মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য সংস্কৃতি বা সভ্যতা, যেমন-যেমন উত্তর-ভারত বা আর্য্যাবর্তের গণ্ডী বা সীমা ছাপাইয়া ভারতের অন্যত্র প্রসার লাভ করিতে লাগিল, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র পর হইতে, তেমনি-তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃতও প্রসারিত এবং জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইতে লাগিল। এইভাবে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতা বিহার হইতে বাঙ্গালা-দেশে, আসামে ও উড়িষ্যায় আগমন করিল ; সঙ্গে-সঙ্গে আর্য্য ভাষাও তাহার সাহিত্যিক রূপ সংস্কৃতকে লইয়া এই-সমস্ত প্রদেশকে জয় করিল, স্থানীয় অনার্য্য ভাষার লোপ সাধন করিয়া অথবা সেগুলিকে কোণ-ঠেসা করিয়া দিয়া, এই প্রদেশগুলিকে আর্য্যাবর্তের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিল। সেই ভাবে গাঙ্গেয় মিশ্র আর্য্যানার্য্য বা হিন্দু সভ্যতা, আর্য্য ভাষা সংস্কৃতকে লইয়া দাক্ষিণাত্যেও পহুঁছিল, এবং উত্তর-মহারাষ্ট্রকেও আর্য্যাবর্তের অংশ করিয়া দিল। আরও দক্ষিণে, অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রবিড় বা তমিল দেশ ও কেরলে, আর্য্যাবর্তের সভ্যতা গৃহীত হইল, সংস্কৃতও গৃহীত হইল ; কথ্য আর্য্য ভাষা প্রাকৃত কিন্তু অত দূর দক্ষিণে দ্রাবিড় ভাষাগুলির স্থান দখল করিতে পারিল না। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রাকৃত ভাষার বহু শব্দ এই-সব দ্রাবিড় ভাষাতে স্থান পাইল,—আর সংস্কৃতের তো কথাই নাই। কতকগুলি বিশেষ ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে, সংস্কৃত শব্দ বিশুদ্ধতম ও প্রাচীনতম দ্রাবিড় ভাষা 'চেন্-তমিড়্' বা প্রাচীন তমিলে যে-ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সেগুলিকে সংস্কৃত বলিয়া চিনিবার উপায় নাই ; কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের আশ-পাশের শতকগুলিতে, এখন হইতে ১৮০০।২০০০।২২০০ বৎসর পূর্বে, সুদূর দক্ষিণ-ভারতে আদি-দ্রাবিড় জাতির মধ্যে সংস্কৃত কি ভাবে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তমিলের এই-সব বিকৃত সংস্কৃতজ শব্দ হইতে বুঝা যায়। যেমন—'ঋষি' হইতে প্রাচীন তমিল 'ইরুটি', 'শ্রী' হইতে 'তিরু', 'স্নেহ' হইতে 'নেয়্' ও 'নেচম্', 'ব্রাহ্মণ' হইতে 'পিরামণন্', 'সহস্র' হইতে 'আয়িরম্', 'ধর্ম' হইতে 'তন্মম্' ও 'তরুমম্', 'সভা' হইতে 'অবৈ', 'সন্ধ্যা' হইতে 'অন্তি', 'শীর্ষ' হইতে 'ঈয়ম্', 'কৃষ্ণ' হইতে 'কিরুট্টিণন্' (এবং 'কৃষ্ণ'-শব্দের প্রাকৃত রূপ 'কণ্‌হ' হইতে 'কন্নন্')—এইরূপ শত-শত আছে, যেগুলি সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রাচীন দ্রাবিড়ের উপরে

সংস্কৃতের প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। এইভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা সুসভ্য দ্রাবিড় জনগণের ভাষাগুলিকে নিজ রাজচ্ছত্রের অধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, এখন হইতে ২০০০।১৮০০ বৎসর পূর্বেই।

নিখিল ভারত জুড়িয়া আর্য্য ও অনার্য্য উভয়-ভাষী লোকের মধ্যে এইরূপে সংস্কৃতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সাহিত্যের সংস্কৃত, 'লৌকিক সংস্কৃত' রূপ গ্রহণ করিবার অল্প কয়েক শতকের মধ্যেই। ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতের আর্য্য ভাষার (বিশেষ করিয়া, ইহার প্রতীক এবং প্রাচীন ও সাহিত্যিক রূপ হিসাবে, সংস্কৃতের) দ্বিগ্বিজয়, ভারতের বাহিরে আরম্ভ হইল। মুখ্যতঃ ব্যবসায়-সূত্রে, স্থল-পথে, হিন্দু-সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ উভয় মতের হিন্দু, ভারতের আশ-পাশের দেশ-সমূহে গতায়াত আরম্ভ করিল। সম্ভবতঃ হিন্দু সভ্যতার নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণের পূর্ব হইতেই ভারতের অনার্য্যগণ অন্য দেশে যাওয়া-আসা করিত—বিশেষতঃ অস্ট্রিক-জাতীয় অনার্য্যগণ স্থল-পথে ব্রহ্মদেশে ও জল-পথে মালয়-উপদ্বীপে, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপময়-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, এবং শ্যামে ও কম্বোজে যাইত, এই-সব দেশে অস্ট্রিক অনার্য্যদের জ্ঞাতিদেরই বাস ছিল, তাহাদের সহিত প্রাগৈতিহাসিক সংযোগ কখনও ছিন্ন হয় নাই; এবং উত্তর-ভারত ভাষায় ও সংস্কৃতিতে আর্য্য ও হিন্দু হইয়া গেলেও, সেই সংযোগ-সূত্র রক্ষিত হইয়াছিল, এবং আরও সুদৃঢ় হইয়াছিল। হিন্দু যুগে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের কয়েক শতক হইতে আরম্ভ করিয়া, সংস্কৃত ভাষা এইভাবে একদিকে যেমন পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ঈরানে ও মধ্য-এশিয়ায় আর্য্যদের জ্ঞাতিদের মধ্যে, ঈরানীয় শাখার পার্থব ও পহ্লব, সুগ্‌দ বা সোগ্‌দীয় (অথবা সুলিক বা চুলিক), এবং কুস্তন বা খোতনের অধিবাসীদের মধ্যে, ও তাহাদের উত্তরে ঋষিক বা তুষার (তোখারীয়) জাতির মধ্যে, প্রসার লাভ করিল (মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়াই এই অঞ্চলে আর্য্যভাষার বিস্তার ঘটিয়াছিল), তেমনি অন্যদিকে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশে (দক্ষিণ ও মধ্য-ব্রহ্মের অস্ট্রিক মোন্‌-জাতির মধ্যে, মধ্য-ব্রহ্মের এবং পরে উত্তর-ব্রহ্মের চীন-ভোট জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার ম্রন্‌-মা বা বর্মী জাতির মধ্যে), শ্যামে (দক্ষিণ-শ্যামের মোন্‌দের মধ্যে ও পরে উত্তর-শ্যামের চীন-ভোট জাতির শ্যাম-চীন শাখার দৈ বা থাই অথবা শ্যামীদের মধ্যে), কম্বোজের খ্মের জাতির মধ্যে, চম্পা বা কোচীন চীনের চাম জাতির মধ্যে, মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার মালয়দের মধ্যে, যবদ্বীপে, মদুরায় ও বলিদ্বীপে, বোর্‌নিওতে, এবং সুদূর ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জে,

হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে (হিন্দুত্ব এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় রূপেই প্রচারিত হইয়াছিল), সংস্কৃত ভাষাও নূতন-নূতন প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র লাভ করিল,—ঐ-সব দেশের ভাষা ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলিরই মতো সংস্কৃতের ছায়ায় আসিয়া সমবেত হইল। খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের ও পরের কয়েক শতকের মধ্যেই, ওদিকে কাস্পিয়ান হ্রদ ও সিন্-কিয়াঙ্ বা চীনা-তুর্কীস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব-ঈরান ও আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপকে ধরিয়া, এদিকে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, দক্ষিণ ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক প্রভৃতি এবং বোর্‌নিও, সেলেবেস্ ও ফিলিপ্পীন পর্য্যন্ত লইয়া, এক 'বৃহত্তর ভারত' গড়িয়া উঠিল ; এই বৃহত্তর ভারতের লোকেরা (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লোকেরা বিশেষ করিয়া) ধর্মে ও সভ্যতায় ভারতীয় হইয়া উঠিল, এবং সংস্কৃত তাহাদের মধ্যে সাদরে গৃহীত হইল। তাহাদের ভাষা লিখিত ভাষা ছিল না ; ভারতবর্ষ হইতে তাহারা বর্ণমালা ও লিপি গ্রহণ করে, ভারতীয় লিপিতে তাহাদের ভাষা-সমূহ প্রথম লিখিত হইল। ভারতীয় পুস্তকের—বৌদ্ধ শাস্ত্রের এবং রামায়ণ-মহাভারতাদি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থের—অনুবাদের সহায়তায় তাহাদের সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল বা সুদৃঢ় করা হইল ; সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের রাজারা নিজ অনুশাসন উৎকীর্ণ করাইতে লাগিলেন, ঠিক ভারতবর্ষে যেমনটি হইত। তাহাদের ভাষা-সাহিত্য ভারতীয় [সংস্কৃত] সাহিত্যের আদর্শে পুষ্ট হওয়ার ফলে, এবং ভারতীয় বর্ণমালা গৃহীত ও ভারতীয় লিপিতে তাহাদের ভাষা লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে, সংস্কৃত শব্দ এই-সকল ভাষায় ভূরি-ভূরি প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ['তৎসম' শব্দ] ও বিকৃত-সংস্কৃত ['অর্ধতৎসম'] শব্দের সম্ভারে, তাহাদের ভাষা সমৃদ্ধ হইল ; আধুনিক বাঙ্গালা হিন্দী মারাঠীর মতো, তেলুগু কানাড়ী মালয়ালম্ তমিলের মতো, উচ্চভাবের প্রায় তাবৎ শব্দ মধ্য-এশিয়ার খোতনী ভাষা ও তোখারী ভাষা আবশ্যক মতো সংস্কৃত হইতেই গ্রহণ করিত (এ বিষয়ে সুগ্‌দ বা শুলিক ভাষা একটু স্বতন্ত্র ছিল, এই ভাষা ছিল সমৃদ্ধ পহ্লবী ভাষার ভগিনী, এইজন্য সংস্কৃত হইতে শব্দ ধার করার রীতি ইহাতে ততটা প্রবর্তিত হয় নাই) ; এবং মোন্ ও খ্মের ভাষা, চম্পার চরম ভাষা, পরবর্তী কালে বর্মী ও শ্যামী ভাষাদ্বয়, মালাই ভাষা ও বিশেষ করিয়া যবদ্বীপীয়, সুন্দ-ভাষা, মদুরী ও বলিদ্বীপীয়, সংস্কৃত শব্দ আত্মসাৎ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন বিষয়ে ভারতীয় ভাষাগুলিরই শামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সিংহলের সিংহলী ভাষা তো ভারতের আর্য্য ভাষা-গোষ্ঠীর

অন্তর্গত—গুজরাট হইতে যে প্রাকৃত খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে সিংহলে নীত হয়, তাহা-ই পরে সিংহলী ভাষাতে পরিণত হয়,—প্রথম হইতে সংস্কৃত ও আর্য্য সংস্কৃতির সহিত ইহার অবিচ্ছিন্ন যোগ ছিল, এবং এখনও আছে।

সেরিন্দিয়া বা চীন-ভারত, অর্থাৎ এখনকার দিনের সোভিয়েৎ মধ্য-এশিয়া ও সিন্-কিয়াঙ্ বা চীনা-তুর্কীস্থান; ইন্দিয়া-মিনোর (ইণ্ডিয়া-মাইনর) বা লঘু-ভারত বা অগ্র-ভারত, অর্থাৎ এখনকার দিনের আফগানিস্থান; ইন্দোচীন বা ভারত-চীন, অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দোচীন; মালায়া বা মালয় উপদ্বীপ, এবং ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময়-ভারত; এই-সমস্ত দেশ লইয়া, এশিয়ার এই বিরাট্ অংশে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি, প্রায় সমস্ত পণ্ডিত লোকে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এবং ব্রাহ্মণেরা, সংস্কৃত জানিতেন, সংস্কৃত বুঝিতেন। দ্বীপময়-ভারতের একজন যবদ্বীপীয় ও মধ্য-এশিয়ার একজন তোখারী ভিক্ষু তখন অক্লেশে সংস্কৃতের মাধ্যমে পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে পারিতেন, এবং এই আলাপে ক্বচিৎ একজন চীনা ভিক্ষুও যোগদান করিতে পারিতেন। তিব্বত ও চীন, এবং চীনের শিষ্য কোরিয়া ও জাপান এবং তোঙ্-কিঙ্ ও আনাম [এখনকার ভিয়েৎ-নাম]—এই কয়টি দেশ নিজ-নিজ স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল; এই দেশগুলি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিলেও, ভারতীয় রীতিনীতি এ-সব দেশের স্বকীয় ও প্রাচীন রীতি-নীতির উপরে ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতির উপরে সম্পূর্ণ-রূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান ও তোঙ্-কিঙ্-আনাম-কে ঠিক 'বৃহত্তর ভারত' বলা যায় না—যদিও এই সব দেশের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই ছিল।

চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম পঁহুছিয়াছিল প্রথমটা মধ্য-এশিয়ার কুস্তন (খোতন) ও তুষার (তোখারী) রাজ্যের লোকদের মারফৎ; পরে ভারতের সঙ্গে চীনের যোগ ঘটে, এবং ভারত হইতে মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়া ও জল-পথে যবদ্বীপ হইয়া, ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারক ও ধর্মগুরুগণ চীনে যাইতে আরম্ভ করেন; চীন হইতে উত্তরের স্থল-পথে ও দক্ষিণের জল-পথে বৌদ্ধ শ্রমণ তীর্থ-যাত্রীরাও ভারতে আসিতে আরম্ভ করেন। যে-সব ভারতীয় ধর্মগুরু, পণ্ডিত ও প্রচারক চীনে গিয়াছিলেন, চীনাদের সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন এবং চীন-ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও জীবনী বহু স্থলেই চীনদেশে রক্ষিত হইয়া আছে; ইঁহাদের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ করিয়া করিতে হয়

—মধ্য-এশিয়ার তুষার-জাতীয় পণ্ডিত কুমারজীব (ইঁহার পিতা কুমার ছিলেন কাশ্মীরীয়, এবং মাতা জীবা ছিলেন তুষার-দেশের কুচী-নগরীর রাজ-কুমারী, পিতা ও মাতার নাম মিলাইয়া পুত্রের নাম হয় 'কুমারজীব'), এবং দক্ষিণ-ভারতের যোগী বোধি-ধর্ম। চীন-দেশীয় পণ্ডিত ভারত-যাত্রীদের মধ্যে ফা-হিয়েন (সংস্কৃত নাম—মোক্ষ-দেব), হিউয়েন্-ৎসাঙ্ (মহাযান-দেব) এবং য়ী-ৎসিঙ্ (পরমার্থ-দেব) সুপরিচিত। চীনা অনুবাদের প্রচার কোরিয়া, জাপান ও তোঙ্-কিঙ্-আনামেও হয়, কারণ ঐ দেশগুলির সভ্যতা ছিল মুখ্যতঃ চীনেরই সভ্যতা। চীনারা খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে সংস্কৃতের চর্চা করিত; সংস্কৃত-চীনা অভিধানও কতকগুলি প্রণীত হয়; এই অভিধানগুলির সাহায্যে কোরিয়াতে এবং জাপানেও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাঝে-মাঝে সংস্কৃত পাঠ করিবার প্রয়াস পাইতেন। এইরূপ দুইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে সংকলিত হয়, ও অষ্টাদশ শতকে প্রাচীন পুঁথি হইতে কাঠে খোদাই করিয়া জাপান হইতে এইরূপ দুইখানি অভিধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই দুইখানি অভিধান, মূল জাপানী সংস্করণের ছায়া-চিত্র প্রতিলিপি করিয়া ও ফরাসী ভাষায় নানা মূল্যবান্ টীকা টিপ্পনী দিয়া, পারিস হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন—এই বই, ও চীন-দেশে বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া ডাক্তার বাগচী কর্তৃক লিখিত দুই খণ্ডের বিরাট্ পুস্তক, আধুনিক যুগে ভারতীয়দের মধ্যে চীন-ভাষার চর্চার প্রথম ফল। অভিধান দুইখানিতে প্রথম দেওয়া আছে চীনা শব্দ, তাহার নীচে সপ্তম শতকের ভারতীয় লিপিতে (যাহার সহিত ঐ যুগের ও পরবর্তী যুগের চীনারা ও জাপানীরা পরিচিত ছিল) সংস্কৃত শব্দটি (চীনা লিপির পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত শব্দের অক্ষরগুলি উপর ইইতে নীচে দেওয়া হইয়াছে), সংস্কৃত শব্দের পাশে চীনা অক্ষরের সাহায্যে প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণ নির্দেশ—এইভাবে অভিধান রচিত হইয়াছে। একটি চীনা শব্দের একটি করিয়া মাত্র সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে।

ভোট বা তিব্বতীরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের সুবিখ্যাত রাজা স্রোঙ্-ব্ৎসন্-স্গম্-পো-র রাজত্বকালে। ঐ সময়ে ভোট পণ্ডিত থোন্-মি-সম্ভোট ভারতবর্ষে আসিয়া প্রাচীন কাশ্মীরী লিপির আধারে ভোট বা তিব্বতী লিপির গঠন করেন। ভোট-ভাষায় সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয়, এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র ব্যতীত অনেক অন্য সংস্কৃত

গ্রন্থও ভোট-ভাষায় অনূদিত হয়। ফলে, ভোটদের মধ্যে নিজ ভাষায় একটি বিরাট্ বৌদ্ধ সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চীনাদের লিপি ধ্বনি-নির্দেশক নহে; ইহা মুখ্যতঃ বস্তু-চিত্রময় ও ভাব-নির্দেশক বর্ণ-সমূহের সমষ্টি। বিদেশী ভাষার ধ্বনি চীনারা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিত না, এবং তাহাদের লিখন-রীতি ধ্বনি-নিরপেক্ষ হওয়ায়, চীনারা বিদেশী নামেরও যথাসম্ভব অনুবাদ করিয়া নিজ ভাষার শব্দ করিয়া লইবার প্রয়াস পাইত; বিদেশী ভাষার শব্দের তো কথাই নাই। এইজন্য বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অল্প কতকগুলি সংস্কৃত নাম ও শব্দ যথাযথ সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা দেখা গেলেও, সাধারণতঃ তাবৎ সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্দ চীনাতে অনূদিত হইয়াছে। 'বুদ্ধ' এই শব্দটি প্রাচীন চীনারা *Budh 'বুধ্' এই রূপে গ্রহণ করে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে; এবং একটি বিশেষ বর্ণ বা চিহ্ন দ্বারা এই 'বুধ্' শব্দের নির্দেশ তাহারা করিত। বর্ণ বা চিহ্নটি অপরিবর্তিত রহিল, কিন্তু শতকের পর শতক ধরিয়া তাহার উচ্চারণ বা ধ্বনি পরিবর্তিত হইতে লাগিল, এবং সেই-সব পরিবর্তন ধরিবার কোনও উপায় তখনও ছিল না, এখনও নাই; বিশেষ গবেষণা করিয়া এখন তাহা স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছে। খ্রীষ্টীয় ৫০০-র দিকে 'বুধ্' শব্দের চীনা উচ্চারণ *Bhyuwad 'ভ্যুঅদ্' বা *Bhyut 'ভ্যুৎ' হইয়া যায়; পরে *Bhut 'ভুৎ', এবং *Bhwat 'ভ্বাৎ, *Bhur 'ভুর্' প্রভৃতি বিভিন্ন রূপান্তর ঘটে; এবং আজকাল চীনের বিভিন্ন প্রান্তে এই শব্দ Fu, Fo, Fat, Fwat 'ফু, ফো, ফাৎ, ফ্বাৎ' প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে চীনাদের নিকট হইতে বর্মীদের পূর্বপুরুষগণ ব্রহ্মদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থান-কালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, তখন বুদ্ধ-বাচক চীনা শব্দ *Bhur 'ভুর্' তাহারা শিখিয়া লয়; খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে যখন বর্মী-ভাষা ভারতীয় লিপিতে প্রথম লিখিত হয়, তখন বর্মীরা ইহা Bhurāḥ 'ভূরাঃ' রূপে লেখে; এখনও বর্মীতে ঐ বানান-ই প্রচলিত আছে, তবে উচ্চারণ বদলাইয়াছে—আরাকানে 'ভূরাঃ' উচ্চারিত হয় Pharā 'ফরা' রূপে ও ব্রহ্মের অন্যত্র Phayā 'ফয়া' রূপে। এইভাবে সংস্কৃত শব্দটির বিকার, চীনাদের মধ্যে, ও চীনাদের নিকট হইতে ইহাকে লওয়ার পরে বর্মীদের মধ্যে, ঘটিয়াছে। চীনাতে যে অল্প কয়েকটি সংস্কৃত নাম গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির আধুনিক উচ্চারণে প্রায়ই এইরূপ বিকার দেখা যায়; যেমন, 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মা'=প্রাচীন চীনা উচ্চারণে Bram 'ব্রম্' বা Bam 'বম্', আজকাল Fan 'ফান্', জাপানীদের মুখে Bon 'বোন্' বা

Bong 'বোঙ্'; 'যক্ষ (=য়কৃষ)', আধুনিক চীনায় Yat-sen 'য়াৎ-সেন্' (চীনা জন-নায়ক স্থন্ য়াৎ-সেন্-এর ব্যক্তি-গত নামে এই সংস্কৃত শব্দটি-ই দেখা যায়—'স্থন্'-বংশীয় 'য়াৎ-সেন্' বা 'যক্ষ' অর্থাৎ 'দেব'); 'সংঘ'=Seng 'স্তঙ্'; 'অমিতবুদ্ধ' (অমিতাভ)=O-mi-to-fo 'ও-মি-তো-ফো'; 'ব্রাহ্মণ' =প্রাচীন চীনা Ba-ra-mon 'বা-লা(বা- রা)-মোন্'=আধুনিক Po-lo-men 'পো-লো-ম্যান্'; 'ধ্যান' (প্রাকৃত 'ঝাণ')=আধুনিক উচ্চারণে Ch'an 'ছান্'; ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ সংস্কৃত শব্দ সংখ্যায় অতি অল্প; চীনাদের চেয়ে বরং জাপানীরা পরে আরও সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, এখনও করিতেছে। চীনারা নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীদের নাম পাঠ করে; এইজন্যে শত-শত অনূদিত সংস্কৃত নাম ও শব্দ চীনা ভাষায় প্রচলিত থাকিলেও, সেগুলি আত্মগোপন করিয়া থাকে। 'অশ্ব-ঘোষ'-কে Ma-heng 'মা-হেঙ্' (অর্থাৎ 'ঘোড়ার হ্রেষা') বলিলে, 'তথা-গত'-কে Ju-lai 'ঝূ-লাই' (অর্থাৎ 'সেই-পথে-যিনি-গিয়াছেন') বলিলে, 'অবলোকিত-স্বর(=অবলোকিতেশ্বর)'-কে Kuan-yin 'কুআন্-য়িন্' (অর্থাৎ 'যিনি কণ্ঠস্বরের দিকে অবলোকন করেন'), 'ধর্ম-সিংহ'-কে Fa-shih 'ফা-শিঃ', অথবা 'ক্ষিতি-গর্ভ'-কে Ti-tsang 'তী-ৎসাঙ্' বলিলে, সংস্কৃতজ্ঞ কাহারও পক্ষে চীনা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ধরা সম্ভবপর নহে। এই প্রাচীন রীতি—নামের অর্থের অনুবাদ, নামের ধ্বনি-নির্দেশ নহে—ধরিয়া-ই রবীন্দ্রনাথের চীনা-নামকরণ হইয়াছিল Chu Chen-tan 'চু চেন্-তান্' ('চু' অর্থাৎ 'থিয়েন্-চু'='সিন্ধু'-দেশ, India, ভারতবর্ষ; 'তান্' অর্থাৎ সূর্য্যোদয় বা প্রভাতসূর্য্য=রবি; 'চেন্' অর্থাৎ বজ্র, বজ্রের দেবতা=ইন্দ্র)।

জাপান ও কোরিয়ার ভাষা এবং তোঙ্-কিঙ্-এর ভাষা চীনা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, কিন্তু চীনা হইতে সহস্র-সহস্র শব্দ এই তিন ভাষায় গৃহীত হইয়াছে. এবং চীন হইতে গৃহীত ভারতীয় (সংস্কৃত) শব্দ অথবা শব্দানুবাদ, এই তিন ভাষায় আগত এই-সমস্ত চীনা শব্দেরই অন্তর্গত। জাপান ও কোরিয়ার ভাষায় ও তোঙ্-কিঙের ভাষায় এই শব্দগুলির উচ্চারণ আবার অন্য ধরনের হইয়া গিয়াছে। এইরূপ শব্দের খুঁটিনাটি বিচারের আবশ্যকতা নাই। তবে জাপানীরা নূতন করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা আরম্ভ করিবার ফলে এবং নূতন করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করায়, আজকাল কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সরাসরি সংস্কৃত হইতে জাপানীতে আসিয়া গিয়াছে। জাপানে নাগরী লিপিতে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, প্রধান-প্রধান উপনিষদ্ ও ভগবদ্-

গীতারও অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত নামগুলির যথাসম্ভব প্রাচীন চীনা অনুবাদ-ই ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন, 'ধৃতরাষ্ট্র'=Ji-koku 'জি-কোকু' (='যিনি রাজ্যকে ধারণ বা রক্ষা করেন', চীনাতে Ti-kuo 'তি-কুও')। আধুনিক জাপানীতে প্রচলিত কতকগুলি নবীন ও প্রাচীন কালে আগত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত :—'বুদ্ধ'=প্রাচীন চীনায় Budh 'বুধ্', Bhyut 'ভ্যুৎ', তাহা হইতে প্রাচীন জাপানীতে Butu 'বুতু', আধুনিক জাপানীতে উচ্চারণে Bu-tsu 'বু-ৎসু', লেখাতে কিন্তু Bu-tu 'বু-তু'; 'ব্রাহ্মণ'=Baramon 'বারামোঙ্'; 'বসিষ্ঠ'=Bashi 'বাশী'; 'যম'=Yema 'য়েমা'; 'দুন্দুভি= প্রাচীন জাপানীতে tudumi 'তুদুমি', আধুনিক জাপানীতে tsudzumi 'ৎসুদজুমি'; 'বৈরোচন'=Birushana 'বিরুশানা'; 'বৈদূর্য্য'=ruri 'রুরি' (='লুরি', 'বেলুরি, বেলুরিয়' হইতে); 'সূত্র'=Sutara 'সুতারা'; 'বোধি' =bodai 'বোদাই'; 'সঙ্ঘারাম'=garan 'গারাঙ্'; 'প্রজ্ঞা'=প্রাচীন জাপানীতে pannya 'পান্‌ন্যা', আধুনিক জাপানীতে hannya 'হান্‌ন্যা'; 'ভিক্ষু, ভিক্ষুণী'=Biku, Bikuni 'বিকু, বিকুনি'; 'সঙ্ঘ'=Sō 'সো' (অর্থ, 'পুরোহিত'); 'বেদ'=Bida 'বিদা'; 'মণ্ডল'=Mandara 'মান্দারা, মাদারা' (অর্থ—'বর্ণ-মণ্ডল, বিভিন্ন রঙ্গের সমাবেশ'); 'সমাধি'=Sammai 'সাম্মাই'; 'শ্রমণ'=Shamon 'শামোঙ্'; 'পুণ্ডরীক'=hundarike 'হুন্দারিকে'; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই-সব শব্দ ও নাম বেশির ভাগ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবতা ও ভাবাবলী সম্পর্কীয় শব্দ।

দ্বীপময়-ভারতের যবদ্বীপীয়, বলিদ্বীপীয়, মালাই প্রভৃতি ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ স্থান করিয়া লইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দ, যথা, শার্দূলবিক্রীড়িত, শিখরিণী, বসন্ততিলক প্রভৃতিও যবদ্বীপীয় ও বলিদ্বীপীয় ভাষায় বিশেষ প্রচলিত, বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যে। খ্রীষ্টীয় এগারোর শতকের প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় মহাভারতের গদ্যানুবাদের আরম্ভ এইরূপ; ইহা হইতে প্রাচীনকালে যবদ্বীপে সংস্কৃতের প্রভাব অনুমান করা যাইবে—

> হন প্ৱয় মঙ্‌কে বুবুসেন্, ইকঙ্ কাল তন্ হন্ আদিত্য চন্দ্র নক্ষত্র বায়ু আকাশাদিক, প্রলয় রি বেকস্ সংহারকল্প, প্রাপ্ত স্বঙ্ সর্গকাল প্রতিনিয়ত মিজিল্ স-প্রকার-ঞ্ ঙুনি ইচ্ছা সঙ্-হ্যঙ্ তিনূৎঞান্ হন কতেকান্ শব্দ সংহারধর্ম, সঙ্-হ্যঙ্ শঙ্কর অতঃ কারণ-ঞান্ হন লাবন্ ভট্টারী দেহার্ধ, কারণ নির মপিসন্ লাবন্ ভট্টার ত্রিনেত্র শির, অন্ মুঙ্‌গিঙ্ কৈলাশ-শিখর

সদৃশ উত্তুঙ্গ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠ, সাক্ষাৎ মণ্ডলম্ স-ভুবন ইকা তঙ্ পর্য্যঙন্ স্থান সঙ্-হুঙ্।

দ্বীপময়-ভারতে প্রাচীন ও আধুনিক কালে সংস্কৃতের প্রচলন ও প্রভাবের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি; আমার 'দ্বীপময় ভারত' পুস্তকে (যবদ্বীপ-বলিদ্বীপ ভ্রমণের কথায়) এ বিষয়ে উল্লেখ ও উদাহরণ মিলিবে। [শ্যাম-দেশ ভ্রমণের বিবরণ সহ এই পুস্তকের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, "রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ" নামে, 'প্রকাশ-ভবন', ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।] আমাদের দেশে হিন্দীর মতো, মালাই-ভাষা দ্বীপময়-ভারতে বহু-প্রচলিত। মালাই-জাতির লোকেরা এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে—আর তাহারা সংস্কৃত হইতে প্রাচীন কালের মতো শব্দ গ্রহণ করে না, সংস্কৃতের চর্চা তাহাদের মধ্যে আর নাই, তাহারা এখন আরবী ফারসী, ইংরেজি, ওলন্দাজ প্রভৃতি সব ভাষা হইতে শব্দ লইয়া থাকে; তথাপি সংস্কৃত শব্দ মালাই ভাষাতে ভূরি-ভূরি এখনও ব্যবহৃত হয়; এমন কি, 'আমি'-অর্থে যে শব্দ মালাই ভাষায় আজকাল প্রচলিত সেই saya 'সায়া' শব্দটি সংস্কৃত 'সহায়' শব্দের বিকার ('আমি' অর্থাৎ 'আপনার সহায় বা আপনার দাস',—এই বিনয়-প্রদর্শন হইতে 'সহায়' অর্থে 'আমি', যেমন 'আমি' না বলিয়া 'দাস' বলিয়া নিজেকে উল্লেখ করা)। মালাই-ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত—'আগম (=ধর্ম), অল্প (গাফিলতি অর্থে), অংকার (=অহংকার, অর্থ—জবরদস্তি, অত্যাচার), antara আন্তারা (=অন্তর, পার্থক্য), atau আতাউ (=অথবা), bahasa, basa বাহাসা, বাসা (=ভাষা), byakti ব্যাক্তি (=ভক্তি, অর্থ—সুকৃতি, সেবা), bengsa বাংসা (=বংশ, জাতি), biyasa বিয়াসা (=অভ্যাস), bijaksana বিজাক্সানা (=বিচক্ষণ, অর্থাৎ পণ্ডিত, জ্ঞানী), binasa বিনাসা (=বিনাশ), buta বুতা (ভূত), budi বুদি (=বুদ্ধি), bumi বুমি (=ভূমি), chahaya চাহায়া (=ছায়া, অর্থ—তেজ, দীপ্তি), chekrabala চেক্রাবালা (=দিক্-চক্রবাল), চিন্তা, চিন্তামানি (=চিন্তামণি, একরকম সাপ), chuku চুকু (চুক্র=সিরকা), deksina দক্সিনা (=দক্ষিণ দিক্), denda দেন্দা (=দণ্ড, জরিমানা), genta গেন্তা (=ঘণ্টা), harga হার্গা (=অর্ঘ, মূল্য), hasta হাস্তা (=হস্ত, দৈর্ঘ্যের পরিমাণ), jentera জেন্তেরা (=যন্ত্র), jelma জেল্মা (=জন্ম), kerna

কারনা (=কারণ), kerja কের্জা (=কার্য্য), kosa কোসা (=অঙ্কুশ), maha মাহা (=মহান্), mengsa মাংসা (=মাংস), melati মেলাতি (=মালতীফুল), nadi নাদি (=নাড়ী), nama নামা (=নাম), papa পাপা (=দরিদ্র, পাপ), puteri পুতেরী (=পুত্রী, রাজকুমারী), রাজা, rupa রূপা (=রূপ), saksi সাক্সী (=সাক্ষী), sakti সাক্তি (=শক্তি, ঐশী শক্তি), segera সেগেরা (=শীঘ্র), sempurna সেম্পুর্না (=সম্পূর্ণ), semua সেমুআ (=সমূহ), senjata সেঞ্জাতা (সংজাত=অস্ত্র), surga সুর্গা (=স্বর্গ), upaya উপায়া (=উপায়, পথ), ইত্যাদি।

ইন্দোচীনের মোন্ ও খ্মের এবং বর্মী ও শ্যামী ভাষায় ঐ প্রকার সংস্কৃত শব্দের আধিক্য দেখা যায়। দ্বীপময়-ভারতের মতন এ অঞ্চলেও হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ) ধর্ম ভারতবর্ষেরই মতো জনগণের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; রাজারা সংস্কৃত নাম গ্রহণ করিতেন, রাজার অনুশাসন সংস্কৃতে হইত, দেশ ব্রাহ্মণের আদর্শে পরিচালিত হইত। মোন্ ও খ্মের জাতি প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করে, পরে বর্মী ও শ্যামীরা ইহাদের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হয়। মোন্ ও খ্মের ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে, কিন্তু এগুলি প্রায় সব সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত অবস্থায়। প্রাচীন মোন্ ভাষা হইতে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের উদাহরণ দিতেছি ; আধুনিক মোন্ ভাষায় এগুলি আরও বিকৃত হইয়া গিয়াছে, যথা—'কাল'='কাল্' ; 'শাস্ত্র'='সাস্' ; আরাধনা'='রাধনা' ; 'প্রতিসন্ধি'='পতিসন্' ; 'শীল'='সীল্' ; 'ইন্দ্র'='ইন্' ; 'উদ্যান'='উদ্যা' ; 'ব্রাহ্মণ'='বুংনঃ' ; 'মনুষ্য'='মনিস্' ; 'নারদ'='নার্' ; 'ধর্ম'='ধর্' ; 'মাণিক্য'='মনিক্' ; 'রত্ন, রতন'='রৎ' ; 'নগর'='নগির', আধুনিক মোন্ 'নাগোও' ; 'দোষ'='দোস্' ; 'অভিষেক'='বিসেক্' ; 'শঙ্খ'='সং' ; ইত্যাদি। কম্বোজের খ্মের ভাষার সংস্কৃত শব্দের কতকগুলি দৃষ্টান্ত, যথা—'ইন্দ্র'='ইন্, এইন্' ; 'গর্ভ'='কের্' ; 'অঙ্গ'='অং' ; 'দেবতা'=tepda 'তেপ্দা' ; 'পুরুষ'= pros 'প্রোস্' ; 'বংশ'='বং' ; 'লোভ'='লোপ্' ; 'শাসন' ('ধর্ম'-অর্থে)= 'সাস্' ; 'স্বর্গ'='স্বর্' ; 'রাক্'=peak 'পেআক্' ; 'নগর'=ankor 'আঙ্কর' ; 'কাব্য'='কাপ্' ; 'শ্বেতচ্ছত্র'='স্বেতছৎ' ; পালি 'অস্সম' (আশ্রম)= 'অস্ম্' ; ইত্যাদি।

শ্যামী বা থাই জাতির লোকেরা বৌদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশ ভ্রমণ-কালে আমাকে সেখানকার একজন রাজপুরুষ বলিয়াছিলেন—'জাতিতে বা রক্তে

আমরা চীনাদের জ্ঞাতি, কিন্তু ধর্মে ও সভ্যতায় আমরা ভারতীয়।' শ্যাম-রাজ্যের সমস্ত কার্য্যে এখনও ভারতের ছাপ, সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। কম্বোজের খ্মের জাতির মধ্যেও তাই। ভৌগোলিক নাম বর্মা হইতে কাম্বোডিয়া পর্য্যন্ত অধিকাংশ-ই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। বর্মী ও শ্যামী এবং মোন্ ও খ্মের ভাষায় এখনও উচ্চভাবের শব্দ সমস্ত-ই প্রায় সংস্কৃত ও ক্বচিৎ পালি হইতে লওয়া হয়। বর্মীদের প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকার নাম 'সূর্য্য' (পালি 'সূরিয়', বর্মী উচ্চারণে 'থুয়িয়া'); জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের 'গালোন্' অর্থাৎ 'গরুড়' নামে অভিহিত করে। শ্যামী বা থাই জাতির রাজাদের নাম সংস্কৃত; 'আনন্দ মহীদল' 'প্রজাধিপক', 'বজ্রায়ুধ', 'চূড়ালংকরণ', 'মহামুকুট'; রাজবংশের নাম 'মহাচক্রী' বংশ। রাজ্যের নানা বিভাগের পদবী সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত—'রথচারণপ্রত্যক্ষ' (=রেল-বিভাগের ট্রাফিক-সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট্), 'বারিসীমাধ্যক্ষ' (=জলসেচ-বিভাগের পরিদর্শক), 'রিজিতরাজভৃত্যাধিকার' (রাজার খাস বিভাগের কর্মচারীর খেতাব)। সাধারণ বহু বস্তুর নামও সংস্কৃত—'আকাশযান' (উচ্চারণে 'আগাৎ-ছান্') =বিমান বা হাওয়াই জাহাজ; 'দূরশব্দ' (উচ্চারণে 'থোরো-সাপ্') =টেলিফোন; 'শতাংশ' (উচ্চারণে 'সিতাঙ্') ='সেণ্ট' নামে মুদ্রা, টিকল্ বা বাৎ অর্থাৎ শ্যামী টাকার শত ভাগের এক ভাগ। এই সব সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ-বিকৃতির জন্য কানে শুনিয়া ধরা মুশ্‌কিল হয়, কিন্তু শ্যামী বর্ণমালায় লিখিত রূপ দেখিয়াই এগুলি কোন্ ভাষার তাহা সহজে বুঝা যায়। 'অরণ্য-প্রদেশ'-কে 'আরাঞ্-পাথেৎ', 'সমুদ্র-প্রাকার'-কে 'সমুৎ-বাখান', 'ব্রজপুরী'-কে 'ফেচাবুরী', 'রাজপুরী'-কে 'রাৎবুরী' রূপে উচ্চারণ করাতে, এই শব্দগুলির স্বরূপ লুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। শ্যামদেশে বিদেশী (ইউরোপীয়) পারিভাষিক শব্দাবলীর জন্য শ্যামী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত হইতে নূতন করিয়া পারিভাষিক শব্দ আবশ্যক-মতো গঠন করিয়া শ্যামী ভাষায় প্রয়োগ করিতেছেন। এইরূপ কতকগুলি শব্দ আমাদের দেশেও বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতিতে গৃহীত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, 'এক শ্যামী বিদ্যার্থী'-রচিত প্রবন্ধ, কলিকাতার 'বিশাল ভারত' নামক হিন্দী পত্রিকার ১৯৪১ সালের জুন মাসের সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়; পরে কাশীর 'নাগরী প্রচারিণী সভা পত্রিকা'র শ্রাবণ ১৯৯৮ সংবতের, ৪৬ খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায়, এই প্রবন্ধ আলোচিত হইয়াছিল।

সিংহলের সিংহলী ভাষা আমাদের বাঙ্গালা হিন্দী গুজরাটী মারাঠীর মতোই আর্য্যভাষা; ইহাতে বরাবরই ভারতীয় সংস্কৃত ও পালির প্রভাব অব্যাহত ছিল। সিংহলী ভাষার উচ্চ ভাবের প্রায় তাবৎ শব্দ সংস্কৃতের।

প্রাচীন মধ্য-এশিয়ার তোখারী ভাষা ও খোতনী ভাষা, সংস্কৃতের মতো ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্য ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সংস্কৃতের জ্ঞাতি-ই ছিল। এই দুইটিতে ভারতবর্ষীয় লিপি ব্যবহৃত হইত, সেইজন্য সংস্কৃত শব্দের আগমন সহজ ছিল। কিন্তু এগুলিতেও সংস্কৃত শব্দ, স্থানীয় উচ্চারণ-মতো বিকৃত হইত। খ্রীষ্ট-জন্মের পরে কয়েক শতক ধরিয়া উত্তর-ভারতে সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের যে উচ্চারণ ছিল, তৎসম্বন্ধে, খোতনী ও তোখারী ভাষায় বর্ণ-বিন্যাস-রীতি এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের পরিবর্তনের ধারা বিচার করিয়া, আমরা কতকটা আভাস পাইতে পারি। খোতনের পূর্বে 'ক্রোরৈন' নামে একটি রাজ্য ছিল; এখানে, এবং খোতনে, উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে আগত হিন্দুদের উপনিবেশ ছিল; সেইজন্য তাহাদের ভাষা—উত্তর-পশ্চিমের প্রাকৃত—এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত রাজকীয় দলিল-পত্রে সরকারী ভাষা হিসাবে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের এবং পরের কয়েক শতক ধরিয়া এই প্রাকৃত পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে তুর্কী-ভাষী লোকদের প্রসারের ফলে মধ্য-এশিয়ায় তোখারী, খোতনী এবং উত্তর-পশ্চিমীয় প্রাকৃত—এই তিনটি আর্য্য ভাষার বিলোপ ঘটে। এখন কেবল প্রাচীন নগর-সমূহের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত এই-সব ভাষায় লিখিত কাগজ-পত্রে ও লেখ-সমূহে প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় ভাষার (বিশেষ করিয়া সংস্কৃতের) প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যায়।

তিব্বত মধ্য-এশিয়ারই অংশ, কিন্তু তিব্বতের ভাষা চীনের ভাষার সহিত সম্পৃক্ত, ইহা অনার্য্য ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষা। তিব্বতীরা ভারতীয় বর্ণমালা গ্রহণ করায়, ইহাদের ভাষাতে সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় শব্দের প্রবর্তন সহজ-সাধ্য ছিল। কিন্তু জ্ঞাতি চীনাদের প্রদর্শিত পথেই তিব্বতীরা চলিল; ইহারা সংস্কৃত শব্দ ও নাম গ্রহণ না করিয়া, চীনাদের মতন এই শব্দ ও নাম-সমূহের তিব্বতী অনুবাদ-ই ব্যবহার করিতে লাগিল। বড়ো-বড়ো এবং কঠিন-কঠিন সংস্কৃত বই, পুরাপুরি নিজেদের শব্দ দিয়া, একটিও সংস্কৃত

শব্দ ধার না করিয়া, ইহারা অনুবাদ করিতে লাগিল। ভাব লইল, ভাষা লইল না। তিব্বতীদের মধ্যে সম্ভবতঃ মুখে-মুখে গান, গাথা বা গদ্য-কাব্য প্রচলিত ছিল, একটা জাতীয় সাহিত্য ও সুনির্দিষ্ট শব্দ-গঠন-রীতি তাহাদের ছিল। সেইজন্য হয়-তো ইহারা বিদেশী সংস্কৃতের শব্দ ধার করা আবশ্যক মনে করে নাই। এই হেতু চীনাদের মতো ইহাদের মধ্যেও ভারতীয় নাম-সমূহ অনুবাদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। যেমন—'বুদ্ধ' এই নামটিকে ইহারা অনুবাদ করিল Sangs-rgyal 'সঙ্‌স্‌-র্গ্যাল্' অর্থাৎ 'জাগ্রত (=বুদ্ধ) রাজা' (আজকালকার উচ্চারণে, Seng-gye 'সেঙ্‌-জে' রূপে এই শব্দটি বলা হয়); 'প্রজ্ঞাপারমিতা'=Shas-rab-pha-rol-tu 'শস্‌-রব্‌-ফ-রোল্‌-তু'; 'অমিতাভ'=Ḥod-dpag-med ':ওদ্‌-দ্‌পগ্‌-মেদ্' (আজকালকার উচ্চারণে ö-pä-me 'ও্য-প্যা-মে'); 'বিষ্ণু'=Khyab-jug 'খ্যাব্‌-জুগ্'; 'ভারত'=Rgya-gar 'র্গ্য-গর্'; 'সরস্বতী'=Dbyangs-chan-ma 'দ্‌ব্যাঙ্‌স্‌-চন্‌-ম'; 'অবলোকিতেশ্বর'=Spyan-ras-gzigs 'স্প্যান্‌-রস্‌-গ্‌জিগ্‌স্' (আধুনিক=Chen-re-si 'চেন্‌-রে-সি'); 'তারা'=Sgrol-ma 'স্‌গ্রোল্‌-ম' (=Ḍol-ma 'ডোল্‌-মা'); ইত্যাদি। কিন্তু এত করিয়া ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিলেও, 'র্গ্য-গর্‌-স্কদ্' অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার মোহে ইহারা বেশ পড়িয়াছিল; তিব্বতীদের পূজা-পাঠে সংস্কৃত মন্ত্র কিছু-কিছু ব্যবহৃত হয়, এবং 'ওঁ মণি পদ্মে হুং' মন্ত্রটিকে তো তিব্বতী বৌদ্ধদের সর্বত্র এবং সর্বজন-কর্তৃক ব্যবহৃত জাতীয় মন্ত্র বলা চলে।

মোঙ্গোল ও তুর্করাও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে, তুর্করা এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মোঙ্গোলদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় ধর্ম বজায় আছে, তবে তাহারা তিব্বতীদের নিকট হইতে এই ধর্ম পায় বলিয়া, তাহাতে সংস্কৃত অপেক্ষা ভোট-ভাষা বা তিব্বতীর প্রভাব-ই বেশী। তুর্কীদের প্রাচীন ভাষাতে দুই-চারিটা মাত্র সংস্কৃত শব্দ ও নাম ঢুকিয়াছিল; তুর্কীরা তিব্বতীদের ও চীনাদের মতো শব্দ ধার-করার চেয়ে শব্দ সৃষ্টি-করার দিকেই বেশী ঝুঁকিত। তুর্কীদের ভাষাতে আগত দুইটি সংস্কৃত শব্দ পারস্য-দেশ ঘুরিয়া ফারসী শব্দ রূপেই ভারতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে; একটি সংস্কৃতের 'ভগধর' শব্দ, 'ভাগ্যবান্' বা 'শ্রেষ্ঠ পুরুষ' ও পরে 'বীরপুরুষ' অর্থে; তুর্কীতে ইহার 'বগদির্, বগাদির্', প্রভৃতি বিকার ঘটে, ও শেষে ঈরানে ইহা 'বহাদুর' শব্দে পরিণত হয়; আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় আমরা ফারসী হইতে ইহাকে 'বাহাদুর' রূপে

গ্রহণ করিয়াছি। আর একটি শব্দ হইতেছে 'ভিক্ষু'-শব্দ ; তুর্কী ও মোঙ্গোল ভাষায় ইহার একটি রূপ হয় 'বাক্শী'। আগে নিরক্ষর যাযাবর তুর্কী ও মোঙ্গোলদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা-ই অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন হইতেন, এবং গতিকে তাঁহারা-ই সরকারী হিসাব-পত্র রক্ষার জন্য (বিশেষতঃ ফৌজের কাজে) নিযুক্ত হইতেন। ক্রমে শব্দটির অর্থ দাঁড়াইয়া গেল, 'হিসাব-নবীশ', এবং ফারসীতে ইহার বিশেষ অর্থ দাঁড়াইল, 'সৈন্যদলের খাজাঞ্চি'। (ইংরেজি clerk শব্দের উৎপত্তিও অনুরূপ—ইহা মূলে cleric অর্থাৎ 'সাধু বা সন্ন্যাসী' শব্দ হইতে।) ফারসীতে এই শব্দ 'বখ্শী' রূপ ধারণ করিল, এবং 'বখ্শী' হইতে আমাদের বাঙ্গালা পদবী 'বক্শী' বা 'বক্সী'।

মধ্য- ও উত্তর-এশিয়ায় এবং পূর্ব- ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তথা দ্বীপময়-ভারতে যে ভাবে সংস্কৃত ভাষা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বাহন হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ইন্দোচীন, দ্বীপময়-ভারত ও সিন্-কিয়াঙে যে ভাবে সংস্কৃত প্রায় দেব-ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, ঈরানে (পারস্যে) সে ভাবে সংস্কৃতের প্রসার বা প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। সংস্কৃতের মাতৃস্থানীয়া ইন্দো-ঈরানীয় বা আর্য্যভাষা প্রথমটায় উত্তর-ইরাকে ও এশিয়া-মাইনরের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ও পরে স্থানীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, এক থা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ভারতে সংস্কৃতের প্রতিষ্ঠার পরে, ভারতীয় আর্য্যদের নিকট জ্ঞাতি ঈরানীরা, Akhaimenes বা হখামনীষীয়-বংশের সম্রাট্দের সময়ে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র দিকে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজা হইয়া বসে, রাজার ভাষা বলিয়া তাহাদের ভাষার প্রভাব, ভারতের ভাষা প্রাকৃতের উপরে কতকটা পড়িয়াছিল ; কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব প্রাচীন পারসীকে বা অবেস্তার ভাষায় বিশেষ করিয়া পড়ে নাই।

তাহার পরে গ্রীকদের সহিত ভারতীয়দের পরিচয়—দিগ্‌বিজয়ী গ্রীক সম্রাট্ আলেক্সান্দরের অধীনে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র স্থাপন করে, গ্রীক রাজারা কয়েক শতক ধরিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বাহ্লীকে এবং ঈরানে রাজত্ব করেন ; তখন গ্রীক ভাষা ও ভারতীয় ভাষার মধ্যে লেন-দেন চলিয়াছিল—কিছু-কিছু গ্রীক শব্দ আমাদের প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে আসে, এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ গ্রীকেও যায়। তবে গ্রীকদের নিকট হইতে, পশ্চিম হইতে আমদানি কতকগুলি জিনিসের নাম ছাড়া, জ্যোতিষের কতকগুলি শব্দ

সংস্কৃতে আসিয়াছিল; কিন্তু ভারত হইতে পশ্চিমে রপ্তানি হইত এমন কতকগুলি বস্তুর নাম ছাড়া কোনও দর্শন বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শব্দ গ্রীকেরা সংস্কৃত হইতে লয় নাই। 'কস্তীর' (=টিন, গ্রীকে Kassiteros 'কাস্‌সিতেরস্'), 'মুষ্ক' (=কস্তুরী, মৃগনাভি, গ্রীকে moskhos 'মস্‌খস্'), 'শর্করা' (গ্রীকে Sakkharon 'সাক্‌খারন্'=প্রাকৃত 'সক্করা'), 'তমালপত্র' (গ্রীকে malabathron 'মালাবাথ্‌রন'), 'কটুক-ফল' (গ্রীক Karuophullon 'কারুওফুল্লন্', প্রাকৃত 'কড়ুঅফল'), 'ব্রাহ্মণ' (গ্রীকে Brakhmenes 'ব্রাখ্‌মানেস্') প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ মাত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ শর্করার দেশ; আখ হইতে রস বাহির করিয়া তাহা হইতে গুড় ও চিনি তৈয়ারের প্রণালী ভারতবর্ষ-ই প্রথম আবিষ্কার করে, এবং পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ভাষায় চিনি ও মিসরীর নাম ভারতের 'শর্করা' ও 'খণ্ড' এই দুইটি সংস্কৃত শব্দের বিকার হইতে জাত (যেমন ইংরেজি sugar-candy, ফারসী 'শকর-কন্দ'= 'শর্করা-খণ্ড'); কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আমরা ভারতের এই দুই নিজস্ব বস্তুকে বিদেশী বস্তু বলিয়া অভিহিত করি—'চিনি' অর্থে চীনদেশ-জাত বস্তু,—'চীনী', এবং 'মিসরী' অর্থে 'মিসরদেশ-জাত'।

খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম সহস্রকে ভারতের সহিত ঈরানের ঘনিষ্ঠ যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দুই দেশের মধ্যে অব্যাহত ছিল। ইহার পরে মুসলমান যুগে ফারসী ও আধুনিক পারসীক ভাষা, তুর্কী ও ঈরানী বিজেতার সরকারী ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল; তখন ফারসী-ই নিজে উত্তর-ভারতের ভাষাসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম সহস্রকে এবং তাহার পরে সংস্কৃত ও প্রাকৃত তথা আধুনিক ভারতীয় ভাষার শব্দ ফারসীতেও গৃহীত হইয়াছে —বিশেষ করিয়া ভারতীয় বস্তুর নাম, যে-সব বস্তু ভারতের পশ্চিমে রপ্তানি হইত। ফারসীতে নীত এইরূপ ভারতীয় অথবা সংস্কৃত শব্দের নমুনা— Shakar 'শকর্' (=শর্করা), Kirbas 'কির্‌বাস্' (=কার্পাস), but 'বুৎ'=(মূর্তি, 'বুদ্ধ'-মূর্তি), 'নার্‌গীল্' nargil (=নারিকেল), 'শমন্' (=শ্রমণ, বৌদ্ধ পুরোহিত), barahman 'বরহ্‌মন' (=ব্রাহ্মণ), Samandar 'সমন্দর্' (=সমুদ্র), 'চন্দন', lak 'লক্' (=লাক্ষা, গালা), 'নীল্', Babar 'ববর্' (=ব্যাঘ্র), 'শত্‌রঞ্জ্, চত্‌রঙ্গ্' (=চতুরঙ্গ), 'শাঘল্' (=শৃগাল), 'রায়্' (=প্রাকৃত 'রাঅ, রায়'=রাজা), ইত্যাদি। আবার এইরূপ শব্দ দুই-চারিটা

আরবীতেও গিয়া পহুঁছিয়াছে, যেমন—nārjīl 'নার্জীল' (=ফারসী 'নার্গীল্' =নারিকেল), 'শকর্' (=শর্করা), kāfūr 'কাফ়ূর' (=কর্পূর), 'সন্দল' (=চন্দন), misk 'মিস্ক' (=মুষ্ক, মৃগনাভি), janzābīl 'জনজ়াবীল' (=আদা, সংস্কৃত 'শৃঙ্গবের'), ইত্যাদি। গণিতে ও জ্যোতিষে এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় ভারতবর্ষ মধ্য-যুগের ঈরান ও আরবের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু যদিও ভারতীয় (সংস্কৃত) পুস্তক-সমূহ পহ্লবী ও আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল, ভারতীয় শব্দ তেমন পহ্লবী ও আরবীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ক্বচিৎ ভারতীয় নাম বিকৃত অবস্থায় আরবী ও ফারসীতে স্থান পাইয়াছে, ইহা সত্য বটে; যেমন—'করটক-দমনক', পহ্লবীতে Kalalag-Damnag 'কললগ্-দম্নগ্', আরবীতে Kalilah-Dimnah 'কলিলহ্-দিম্নহ্'; 'বিদ্যাপতি' (প্রাকৃত 'বিদ্দাপই')=Bidpay 'বিদ্পয়্, বিদ্বয়্'; 'সিদ্ধান্ত'=Sind-hind 'সিন্দ্হিন্দ'; 'চরক'=Sanaqa 'স্বনক'; ইত্যাদি। মুসলমান ধর্মের গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সূফী সাধকগণের সাধনা, দর্শন ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সূফী মতবাদের উৎপত্তিতে একদিকে যেমন আরবের 'তৌহীদ' অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর সাধনা ভিত্তি-স্বরূপ ছিল, তেমনি অন্য দিকে গ্রীসের দার্শনিক প্লাতোন্-এর চিন্তা ও তদনুবর্তী নব্য-প্লাতোনীয়দের মতবাদ ইহার মধ্যে দার্শনিকতা আনিয়া দেয়; এবং ইহার বিশিষ্ট কথা, Pantheism বা সর্বভূতে-ব্রহ্ম-বাদ, বিশ্বপ্রপঞ্চ-মধ্যে ব্রহ্মসত্তা সদা ক্রীড়মাণ, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম মূলে এক, বিশ্বসৃষ্টি পরব্রহ্মের লীলা মাত্র, এইরূপ উপলব্ধি, ভারতের ব্রাহ্মণ্য চিন্তার দান, অথবা ব্রাহ্মণ্য চিন্তার বেদান্তের প্রভাবের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে অনুরঞ্জিত। কিন্তু এই-সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব (অন্ততঃ আংশিক ভাবে) ভারত হইতে সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন খ্রীষ্টীয় ৯০০-র পরে প্রসারিত হয়, তখন সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলী আরবী ও ফারসী ভাষাতে গৃহীত হয় নাই। আরবী ভাষা বাহিরের শব্দ সিরীয়, ফারসী (পহ্লবী) ও য়ুনানী (গ্রীক) হইতে প্রচুর পরিমাণে লইয়াছে; কিন্তু মাঝে ফারসীর ব্যবধান থাকাতে, সংস্কৃত শব্দ সোজাসুজি আরবীতে স্থান লাভ করিতে পারে নাই; আর ফারসী তখন সম্পূর্ণ-রূপে আরবীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার প্রসাদোপজীবী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং মধ্য-যুগে ভারতের পশ্চিমে ভারতের বিজ্ঞান ও দর্শন অল্প-বিস্তর প্রসৃত হইলেও, ভারতের ভাষা সংস্কৃত সেরূপে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই; আরবী ও ফারসীর পৃষ্ঠপোষক মুসলমান তুর্কী ও ঈরানীদের ভারত-

বিজয়ের ফলে সংস্কৃত ভাষা, বিজিত, মূর্তিপূজক ও বিজেতার চোখে হেয় হিন্দু জাতির ভাষা বলিয়া, ঈরানী তুর্কী ও আরবের কাছে আর তাহার যোগ্য সমাদর পায় নাই। (অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ অল্-বীরূনীর মতো দুই-চারিজন উদার-হৃদয় পণ্ডিতের কথা আলাদা।) এই হেতু, পূর্ব এশিয়ার মতো পশ্চিম-এশিয়ায় সংস্কৃতের জয়জয়কার ঘটিতে পারে নাই।

এইরূপে তিন হাজার বৎসর ধরিয়া সংস্কৃতের গতি এশিয়া-খণ্ডে চলিয়াছিল। শ্রেষ্ঠ সভ্যতার ভাষা হিসাবে, মৌলিক দৃষ্টি ও চিন্তার ভাষা হিসাবে, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অবলোকন ও প্রকাশের ভাষা হিসাবে, পৃথিবীতে তিনটি ভাষার স্থান আছে—সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা। আরবী মুখ্যতঃ গ্রীক সভ্যতা এবং গ্রীক দৃষ্টি ও চিন্তার বাহন; আরবীতে নিহিত আধ্যাত্মিক অবলোকন ও প্রকাশ জগতে নূতন বস্তু ছিল না। এই হিসাবে সংস্কৃত ভাষা সভ্যতার ও সচ্চিন্তার পোষণে সহায়তা করিয়াছে, ও ইহাতে ভারতের মর্য্যাদার বৃদ্ধি করিয়াছে। সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়া চীনারা নিজ ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়, প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে; ভারতীয় ভাষার অর্থাৎ সংস্কৃতের বর্ণমালা ও ভারতীয় লিপি দেখিয়া কোরিয়ান ও জাপানীরা নিজেদের ভাষার জন্য ধ্বনি-নির্দেশক লিপির উদ্ভাবন করে। সংস্কৃতের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় বর্ণমালা ও লিপি মধ্য-এশিয়ায়, ইন্দোচীনে ও দ্বীপময়-ভারতে বহু জাতি কর্তৃক গৃহীত হয়।

আজকাল নূতন করিয়া ইউরোপে এবং অন্যত্র সংস্কৃতের ও সংস্কৃত বিদ্যার, সংস্কৃত চিন্তার আলোচনার ফলে, সংস্কৃতের দার্শনিক ও অন্যবিধ শব্দ এখন বিশ্ব-মানবের ভাষার সাধারণ ভাণ্ডারে উপনীত হইতেছে। আধুনিক কালে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার চর্চার প্রথম ফল—আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের উদ্ভব, আর্য্য জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা। 'গুণ, বৃদ্ধি, স্বরভক্তি, সন্ধি, সমাস, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ' প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাকরণের শব্দ এখন আন্তর্জাতিক হইয়া গিয়াছে। রুষ রসায়নবিৎ Mendelyeff মেন্দেল্যেফ্ তাঁহার আবিষ্কৃত Periodic Law বা 'পর্য্যায়-সূত্র' নামক বিশেষ সূত্রে সংস্কৃতের 'এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ' প্রভৃতি সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। 'ধর্ম', 'কর্ম', 'সংসার', 'অহিংসা', 'বুদ্ধ', 'নির্বাণ', 'বোধি', 'ব্রহ্মা' ও 'ব্রহ্মন্', 'শিব', 'নটরাজ', 'শক্তি', 'অবতার', 'আত্মন্', 'স্বরাজ', 'স্বস্তিক', 'স্বদেশী', 'মহাযান', 'হীনযান', 'বেদ', 'বেদান্ত', 'উপনিষদ্' প্রভৃতি শব্দ পৃথিবীর সর্ব-জাতির শিক্ষিত-সমাজে সুপরিচিত হইতেছে। সেদিন একখানি জাপানী

'নূতন শব্দের অভিধান' (A Dictionary of New Terms)-এ আমাদের 'স্বরাজ, স্বদেশী, সত্যাগ্রহ, বন্দে-মাতরম্' শব্দগুলিও স্থান পাইয়াছে দেখিলাম। এ-সমস্ত শব্দ আজকাল পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মারফৎ বিশ্বজনসমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই প্রকার আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ ছাড়া, ভারতীয় (সংস্কৃত ও অন্য) ভাষার অপর বহু শব্দ গত ৪৫০ বৎসর ধরিয়া পোর্তুগীস্ ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজদের মারফৎ ইউরোপে নীত হইয়াছে ॥

শারদীয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা"

বঙ্গাব্দ ১৩৫০

[পরলোকগত অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা "মঞ্জূষা"-র ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যায়, এশিয়া ভূখণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার বিষয়ে আমার রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকগুলি হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রসার বিষয়ে একটি দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাইবে। শ্লোকগুলি এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল। বাঙ্গালাতে প-বর্গীয় 'ব' (=b) এবং অন্তঃস্থ 'ব' (=v বা w), উচ্চারণে ও আকৃতিতে অভিন্ন, কিন্তু সংস্কৃতে এই দুইয়ের উচ্চারণ পৃথক্। উভয়ের এই উচ্চারণ-পার্থক্য নির্দেশ করিতে, উদ্ধৃত শ্লোক-গুলিতে অন্তঃস্থ 'ব' (=v বা w)-স্থানে 'ব' এবং প-বর্গীয় 'ব' (=b)-স্থানে 'ৰ' ব্যবহার করা হইয়াছে।]

। সংস্কৃত-দিগ্বিজয়ঃ ॥

[অধ্যাপক-শ্রীসুনীতিকুমার-দেবশর্ম-চট্টোপাধ্যায়-বিরচিতঃ]

আর্য্যাণাম্ পিতৃভূরাসীৎ পুরোত্তরকুরোঃ পরে।
কৌকসং গিরিমুল্লঙ্ঘ্য প্রাপ্তাস্তে ধাম বৈ নবম্ ॥ ১ ॥

['উত্তরকুরু'=মধ্য-এশিয়া (সিন্‌-কিয়াঙ, Sin-kiang); 'কৌকস'= ককেশস্ পর্বতমালা, Caucasus Mountains।]

তিগ্রা-সুপ্রাতু-নদ্যোর্বা অন্তর্বেদী যদুচ্যতে।
তত্রাসুর-ৰবেরুভ্যঃ প্রাপ্তবন্তঃ কলাঃ ৰহু ॥ ২ ॥

['তিগ্রা'=প্রাচীন পারসীক 'তিগ্রা'=অসুর-বাবিল ভাষায় Diglat 'দিগ্‌লাৎ', আরবী ভাষায় 'দিজ্‌লাহ্‌'=Tigris নদী; 'সুপ্রাতু'=প্রাচীন পারসীক 'উফ্রাতু'=অসুর-বাবিল ভাষায় Puratu 'পুরাতু'=আরবী 'ফ্রাৎ'=

Euphrātēs নদী ; 'অস্থর' = Ashshur 'অশ্‌শুর' = Assyrian ; 'ববেরু' = পালি জাতকে Baveru 'ববেরু' = 'বাবিলু' = Babylonian ।]

ছান্দসস্য হি যা মূলম্ আর্য্যবাগ্ বৈ প্রবৈদিকী ।
প্রাপ্য সা ভারতং বর্ষং রূপং জগ্রাহ সংস্কৃতম্ ॥ ৩ ॥

['প্রবৈদিকী আর্য্যা বাক্' = প্রাগ্‌বৈদিক আর্য্য ভাষা (Pre-Vedic Aryan Speech) ।]

নিষাদৈর্ দ্রমিড়ৈশ্চাপি কিরাতৈঃ পরিবর্ধিতা ।
সা সংস্কৃতাভিধা ভাষা দেবভাষাপদং গতা ॥ ৪ ॥

['নিষাদ' (Niṣāda) = অষ্ট্রিক (Austric)-ভাষী কোল ও অন্যান্য জন ; 'দ্রমিড়' (Dramiḍa) = দ্রাবিড়-ভাষী জন (Dravida) ; 'কিরাত' (Kirāta) = মোঙ্গোল (Mongol) বা ভোট-চীনা-ভাষী জন ।]

বিদ্যাবৈভবসম্পন্না সাহিত্যকলয়ান্বিতা ।
মণ্ডলে সর্বভাষাণাম্ আসীৎ সা চক্রবর্তিনী ॥ ৫ ॥
বাল্মীকি-ব্যাসয়োঃ কীর্তির্ যদীয়ে মূর্ধ্নি বর্ততে ।
ঋষিভির্ বহুভির্ যাসীৎ কবিভিঃ সেবিতা সদা ॥ ৬ ॥
মণ্ডিতা যোগিভিঃ সিদ্ধৈর্ ভক্তৈ র্লোকহিতৈষিভিঃ ।
আচার্য্যৈঃ পণ্ডিতৈঃ সদ্ভির্ যা চ নীতাঽমৃতম্ পদম্ ॥ ৭ ॥
সর্বেভ্যো ভূমিপুত্রেভ্যো জাতাঃ সন্তি হি যেঽমৃতাৎ ।
নিঃশ্রেয়সস্য লাভায় দিশন্তী বিবিধান্ পথঃ ॥ ৮ ॥
বিনিঃসৃতা ভারতাৎ সা ভূত্বা সংস্কৃতিবাহিনী ।
ঋষিবুদ্ধজিনাচারং ততানাখিলকৃষ্টিষু ॥ ৯ ॥
গম্ভীরা ললিতা বাণী পুষ্প-বজ্র-স্বরূপিণী ।
ধৃতা শিরসি যত্নেন সর্বৈর্ভূর্লোকবাসিভিঃ ॥ ১০ ॥
সিংহলেঽভিজগামাথ দক্ষিণং নবমালয়ম্ ।
কম্বুজেষথ চম্পায়াম্ রামণ্যেষু চ সর্বতঃ ॥ ১১ ॥

['সিংহল' (Ceylon) = লঙ্কা ; 'কম্বুজ' = খ্মের-জাতির দেশ, কাম্বোডিয়া (Cambodia) ; 'চম্পা' = চাম্-দেশ, বর্তমান দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের অন্তর্গত ; 'রামণ্য' (Rāmaṇya) = পালি 'রামঞ্ঞ' (Rāmañña) = Rmeñ 'র্মেঞ' বা Mon 'মোন্' জাতির দেশ, দক্ষিণ- ও মধ্য-ব্রহ্ম এবং দক্ষিণ-শ্যাম ।]

এবং বসন্তি যে প্রাচ্যাং সুদুর্দ্ধর্ষাঃ কিরাতজাঃ।
শ্যাম-ব্রহ্ম-সমাখ্যাতা দৈ-ম্রন্মা-সংজ্ঞকা হি যে ॥ ১২ ॥

['দৈ' (Dai)='থৈ' (Thai) 'থাই' বা শ্যামী (Siamese) অর্থাৎ শ্যামদেশীয় ; 'ম্রন্মা' (Mranmā)='ম্যম্মা', 'ব্যম্মা'=ব্রহ্ম বা বর্মী ;— ইহারা ভাষায় 'কিরাত', অর্থাৎ ভোট-চীনা-ভাষী (Sinc-Tibetan)।]

রামণ্য-কম্বুজেভ্যশ্চ যৈর্লব্ধোত্তরকালতঃ।
সংস্কৃতা প্রাকৃতা গীশ্চ ভারতীয়াঽপি সংস্কৃতিঃ ॥ ১৩ ॥
আগ্নেয়ে বিদ্যতে কোণে সাগরো দ্বীপশোভিতঃ।
তত্র নীতা ররাজৈষা ভাষা রাজ্ঞীব ভারতী ॥ ১৪ ॥

['আগ্নেয়-কোণ'=পূর্ব-দক্ষিণ কোণ (South-East)।]

সেবিতাসীচ্চ বর্হিণ্যাং স্বর্ণদ্বীপে তথান্ততঃ।
যবদ্বীপে বলিদ্বীপে পূজিতা চ বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥

['বর্হিণী' (Barhiṇī)=বোর্নিও (Borneo) ; 'স্বর্ণ-দ্বীপ'=সুমাত্রা (Sumatra) ; 'যব-দ্বীপ'=Java ; 'বলি-দ্বীপ' (অথবা 'বলি-অঙ্ক')=Bali ।]

অধুনাপ্যর্চনারীতির্ বহুশো দৃশ্যতে জনৈঃ।
শ্যামাদিপ্রাচ্যদেশেষু দেশে দ্বীপময়েঽপি চ ॥ ১৬ ॥
আসিয়ায়াস্তথা মধ্যে যে যে দেশা ভবন্তি বৈ।
আর্য্যানার্য্যা জনাস্তত্র সিতপীতাদিবর্ণতঃ ॥ ১৭ ॥
তেষাম্ মধ্যে ভারতীয়া যেঽভবন্নার্য্যভাষিণঃ।
কুস্তনং নগরং তত্র স্থাপয়িত্বাঽবসন্ পুরা ॥ ১৮ ॥

['কুস্তন'=Khotan খোতান-এর প্রাচীন সংস্কৃত নাম।]

ধর্মং সংস্থাপয়ামাসুস্ তত্র তে বুদ্ধদেশিতম্।
এবং ব্রাহ্মং চ বৌদ্ধঞ্চ বচনং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৯ ॥
জনেষূদীচ্যদেশেষু তদাভূচ্চিত্রকীর্তিষু।
প্রসারঃ সংস্কৃতের্ নো বৈ প্রেয়সে শ্রেয়সেঽপি চ ॥ ২০ ॥
অভূৎ ক্ষেত্রমসৌ দেশঃ কৃষ্টীনাং সংগমস্থ বৈ।
ভারতস্থ চ চীনস্থ পর্শোশ্চ যবনস্থ চ ॥ ২১ ॥

['অসৌ দেশঃ'=Serindia ; 'পর্শু' (Parśu)='পর্শ্ব', 'পর্স্ব'=পারসীক (Persian) ; 'যবন'=Iavones, Iōnes=Ionian, য়ুনানী বা গ্রীক।]

জনাস্তত্রাঽবসন্ যেঽপি শকাশ্চ সুলিকাস্তথা।
আর্য্যাণাং যবনানাঞ্চ ঋষীকা জ্ঞাতয়শ্চ যে ॥ ২২ ॥

['শক' = Skuthes = Scythian ; 'স্থলিক' (Sulika) = সোগ্দীয় পারসীক, Sogdian Iranian ; 'ঋষীক' (Ṛṣīka, = উত্তর সিন্-কিয়াঙে কুচা (Kucha) ও কারা-শার (Qara-shahr)-এ অধিষ্ঠিত ইন্দো-ইউরোপীয়গণ, তথাকথিত 'তোখারীয়' (Tokharian) ।]

কিরাতজাতিজা ভোটাস্ তুরুষ্কা মঙ্গলাস্তথা ।
কোরয়াশ্চ মহাচীনা যমতো-বংশজাশ্চ বৈ ॥২৩॥

['ভোট' (Bhōṭa) = 'বোদ্' (Bod) বা তিব্বতী, মূলে মোঙ্গোলীয় (কিরাত) ; 'তুরুষ্ক' (Turuṣka) = তুর্ক ; 'মঙ্গল' = মোঙ্গোল ; 'কোরয়' = কোরীয়, Korean ; 'মহাচীন' (Ta-Ts'in) = চীন-দেশ ; 'যমতো' = Yamato জাপানী ।]

কৈবল্যদায়িনী ভাষা সর্বৈরেতৈঃ সমাদৃতা ।
অনূদিতা ক্বচিজ্জাতা চীন-ভোটানুগামিনী ॥২৪॥
যবনেষ্বপি সা ভাষা প্রসৃতা প্রিয়দর্শিষু ।
বিদ্যাভ্যো জ্যোতিষাদিভ্যো যৈরাসীৎ সমলংকৃতা ॥২৫ ॥
আরব্য-পারসীকেষু মানিতা জ্ঞানদায়িনী ।
গণিতং জ্যোতিষং শাস্ত্রম্ আখ্যানং বৈদ্যকং তথা ॥ ২৬ ॥
তেভ্য এতানি দত্তানি জ্ঞানঞ্চাধ্যাত্মিকং মুদা ।
জীবব্রহ্মৈকতা প্রোক্তা ব্রহ্মনির্বাণিকা তথা ॥ ২৭ ॥

['আরব্য-পারসীক' = মধ্যযুগে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রমন্যাস ও দর্শনের (সুফীবাদের) চর্চায় আরব ও পারসীকেরা সংস্কৃতবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয় ।]

এবং পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে চ জনা যে শক্তিসাধকাঃ ।
তেষাং যে বংশজাঃ সন্তি পাতালে জনমেজয়াঃ ॥ ২৮ ॥

['পাশ্চাত্ত্য-খণ্ড' = ইউরোপ ; 'পাতাল' = আমেরিকা ।]

বাণীয়ং তৈর্গৃহীতাঽপি ভবেৎ কালোপযোগিনী ।
যোগক্ষেমস্য সত্যস্য শাশ্বতস্য চ সিদ্ধয়ে ॥ ২৯ ॥
সমগ্রজনজাতানাং হিতপ্রিয়বিধায়িনী ।
গীরিয়ং ভারতীয়া সা সদাস্তু স্বস্তিবর্ধিনী ॥ ৩০ ॥

"মঞ্জুষা"
৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা
খ্রীষ্টাব্দ, ১৯৫০

ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ একবার আমায় লিখেছিলেন—"প্রকাশ আমার ধর্ম। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, যেমন আমার প্রকাশ এক দিকে হ'য়েছে, তেমনি গানে আর সুরেও হ'য়েছে, ছবি-আঁকায় হ'চ্ছে, আর নাট্যাভিনয়েও হ'য়েছে।" বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত আর বিশ্বস্মর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এত বিভিন্ন পথ ধ'রে ঘ'টেছিল যে, তা ভাব্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়। যে কয়টি পথের কথা তিনি নিজে উল্লেখ ক'রেছিলেন, সে কয়টি ছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভা আরও কত বিভিন্ন প্রকারের কর্মে বা চেষ্টায় আপনাকে প্রকাশিত ক'রেছিল! কবি, ঔপন্যাসিক, নৈবন্ধিক,—তাঁর এই-সমস্ত সাহিত্যিক পরিচয় তো বিশ্ব-বিখ্যাত, এবং তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় ছিল কবি ও লেখক হিসাবেই। কিন্তু তাঁর স্বদেশ-বাসী এবং স্বভাষা-ভাষীদের সকলেই সংগীতকার—'বাগ্‌গেয়কার' আর 'কলা-বিশুদ্ধ গীতির স্বর-সংযোগের স্রষ্টা'—ব'লে সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রে আর ভালো-বেসে এসেছে। যাঁদের সে সৌভাগ্য জীবনে ঘ'টেছে, তাঁরা নাট্যাভিনয়ের প্রযোজক আর নাট্যাভিনেতা হিসাবেও রঙ্গমঞ্চে তাঁকে দেখেছেন; আর তাঁরা স্বীকার ক'র্‌বেন যে—সেখানেও তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর কলমে-আঁকা অদ্ভুত রসের ছবিগুলির মধ্যে এক-একখানি মানুষের মুখ আবার অপূর্ব মানবিকতা-রসে ভরপূর ছিল—অল্প-সংখ্যক সমঝদার রসিক-জনের কাছে সেগুলি সম্মান লাভ ক'রেছে; শিল্পীরাও তাঁর হাতের কাজ এই-সব ছবির সমাদর ক'রেছেন। নীরস শব্দতত্ত্বের আলোচনায় তিনি বাঙলা ভাষায় পথিকৃৎদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন, শাব্দিকেরাও এবিষয়ে তাঁকে তাঁদের একজন প্রধান নেতা ব'লে মেনে নিয়েছেন। এ-সমস্ত বিদ্যা আর সুকুমার শিল্পের বাইরেও, তাঁর একটা বিরাট্ কর্মি-জীবন ছিল, তার পুরা আলোচনা এখন সম্ভবপর হবে না। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে, চিন্তা আর কর্ম, দুই পথেই নিজের শক্তি সার্থক-ভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি শিক্ষাব্রতী এবং আদর্শ শিক্ষক ছিলেন—শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। কৃষি, শিল্প আর শিল্প-বিষয়ক তাঁর উদ্যোগ শ্রীনিকেতনে দেখা দিয়েছিল। নিখিল ভারতের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর পাশেই

অবস্থিতি ক'রে এসেছেন। বিভিন্ন জাতির মানুষকে মিলিয়ে' দেবার পথে যে-সমস্ত শক্তি বিগত শতক-পাদের অধিক ধ'রে কাজ ক'রে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই-সমস্ত শক্তির এক প্রধান উৎস—আর বোধ হয়, সারা পৃথিবীর এত নানা জাতি আর সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে, তাঁর রচনা আর তাঁর বিশ্বমানবিকতার বাণীর জন্য, তিনি-ছাড়া আর কেউ এতটা প্রিয় আর এতটা আপনার হ'তে পারেন নি।

সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংগীত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমার মতো লোকের কিছু ব'ল্‌তে যাওয়া ধৃষ্টতা। তবে আমি নিজেকে, রবীন্দ্রনাথ যাঁর পরিচয় বাঙালী পাঠকসমাজে করিয়ে' দিয়ে গিয়েছেন, সেই "উকীল শ্রীযুক্ত ঢুকড়ি দত্ত" মহাশয়ের সঙ্গে পুরাপুরি এক পর্য্যায়ের মানুষ ব'লে মনে করি না, কারণ সত্যসত্য-ই আমার "গান জিনিসটা শুন্‌তে বড়ো ভালো লাগে।" কেন ভালো লাগে, তার বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা কখনও করি নি; তবে কী ভালো লাগে, ধীরে-ধীরে তার একটা বিচার ক'র্‌তে পেরেছি। রাগ বা সুরের জ্ঞান আমার নেই, 'কানেড়া রাগ' কি 'নাকেড়া রাগ', তাও ঠাওর ক'র্‌তে পারি না। তবে একটা জিনিস ছেলেবেলা থেকেই আমাকে পেয়ে ব'সেছে—সেটা হ'চ্ছে ধ্রুপদের সরল সবল স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বর-রেখার সমাবেশ।

আট-নয় বছর বয়স, এখন থেকে ৪৪।৪৫ বছর পূর্বেকার কথা। আমার মামার-বাড়ি হাওড়া শহরের অন্তর্গত শিবপুরে—তখন শিবপুর ছিল একখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, তার নিজ বিশিষ্টতা আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল; এই গ্রাম বহু চট-কলের আর পশ্চিমা কুলিদের ধাক্কায়, শালিমার-কারখানার আর রেল-লাইনের চাপে, এখন Cosmopolitan Greater Calcutta-র এক বিশিষ্টতা-বিহীন অংশ মাত্র হ'য়ে প'ড়্‌ছে। তখন শিবপুর ছিল, বাঙলা দেশের হৃদয় আর মস্তিষ্ক স্বরূপ ভাগীরথীতীরবর্তী ভদ্রগ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম; এখানে ভাগ্যবান্‌দের ঘরে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, কথকতা আর 'শখের যাত্রা'র পাট ছিল (এক নগর-কীর্তন ছাড়া বৈঠকী রস-কীর্তন তখন প্রচলিত হয়নি), সংস্কৃত-বিদ্যার চর্চা ছিল—আর ছিল, উচ্চ অঙ্গের সংগীতের চর্চা। 'কাণা নিকুন' নামে পরিচিত অন্ধ গায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্ত তখন শিবপুরের বিখ্যাত গায়ক ছিলেন, ক'ল্‌কাতা থেকে, আর অন্য দূর-দূর জায়গা থেকে তাঁর ডাক

আস্‌ত, আর অন্য নামী কালোয়াত গায়ক অনেকগুলি ছিলেন, পাখোয়াজী অনেক ছিলেন—তাঁদের নাম ছেলেবেলায় শুনেছি, তাঁদের কতবার মামার-বাড়িতে দেখেছি, গান-বাজনাও তাঁদের অনেক শুনেছি—কিন্তু অন্য কারও নাম মনে রাখ্‌তে পারিনি। আমার দুই মামা ছিলেন, দু'জনেই কালোয়াতি গানের সাধক ছিলেন। তাঁদের আমলে, মামার-বাড়িতে প্রায়-ই শনিবার রবিবার গানের মজলিস ব'স্‌ত; যে-সময়ে মায়ের সঙ্গে আমরা মামার-বাড়িতে যেতুম, সে-সময়ে এই-সব মজলিসের এক পাশে উপস্থিত থাক্‌বার সৌভাগ্য আমাদের হ'ত। ১৮৯৯ সাল, তখন আমার বয়স আট-নয় বছর, ক'ল্‌কাতায় তখন ভীষণ প্লেগের প্রকোপ,—আমরা প্রায় একটি বছর শিবপুরে মামার-বাড়ির কাছেই আমাদের একটি বাড়িতে ছিলুম, আমার পিতা শিবপুর থেকে নৌকো ক'রে ক'ল্‌কাতায় আপিস ক'র্‌তেন,—তখন এই-সব গানের জলসায় সপ্তাহে দু-বার ক'রে অন্ততঃ জমা হ'তে পার্‌তুম। অন্যান্য মাস্তুতো ভায়েদের সঙ্গে, বাড়ির ভাগ্‌নে হিসাবে আমাদের প্রতিপত্তি আর দাপট ছিল খুব-ই। কর্তা ব্যক্তিদের অসাক্ষাতে তানপুরা খোলা পেলেই তার তার নিয়ে টানাটানি, আর পাখোয়াজের ময়দার তাল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি আর লোফালুফি, এ-সব তো ছিল-ই। কালোয়াতি গানের—ধ্রুপদ আর খেয়ালের—চর্চা যখন হ'ত, সব সময়ে যে ভালো লাগ্‌ত ব'ল্‌তে পারি না; টপ্পা অবধি চ'ল্‌ত, বোধ হয় এঁরা ঠুমরি-গজলে নাম্‌তেনই না—সে-সব তখন শুনি নি। মাঝে-মাঝে বাঙলা গান হ'ত (পরে বুঝেছি, সে-সব ছিল নিধুবাবুর টপ্পা); আর কেউ হয়-তো বাড়ির মেয়েদের খুশী কর্‌বার জন্য এক-আধখানা 'শ্যামা-সংগীত' গাইতেন; ধ্রুপদ-খেয়ালের গণ্ডী কখনও-কখনও এই ভাবে দয়া ক'রে কেউ অতিক্রম ক'র্‌তেন। এক-এক সন্ধ্যায় বড়ো গোছের জলসা হ'ত, তখন নানা লোক আস্‌তেন, মামার-বাড়ির সামনের সরু গলি-পথে অনেকগুলি ঘোড়ার-গাড়ি জমা হ'ত। রবিবার দিন কখনো-কখনো সারা দিন ধ'রে গানের মজলিস চ'ল্‌ত,—গায়ক-বাদকদের কেউ-কেউ থেকে যেতেন, মামার-বাড়িতেই তাঁদের মাধ্যাহ্নিক সেবা হ'ত। তখন চায়ের রেওয়াজ ছিল না, পান তামাক হর-দম চ'ল্‌ত।

এই রকম সংগীতের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাল্যকাল অতিবাহিত হ'চ্ছিল। একদিন বর্ষাকালের দুপুর বেলা, আকাশে খুব মেঘ জ'মেছে, বৃষ্টিও ঝুপ্‌ঝুপ্‌

ক'রে প'ড়ছে, বাইরে গিয়ে দৌড়-ধাব ক'রে খেল্‌বার সময় সেটা নয়—তখন আধ-খানা না'রকেল-মালায় দড়ি বেঁধে খড়ম ক'রে প'রে, খড়মে-বাঁধা দুই দড়ি দু হাতে ধ'রে, সেই খড়ম পায়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ক'র্‌তে-ক'র্‌তে ছোটাছুটি করা শিবপুর গ্রামের ছেলেদের একটা প্রিয় খেলা ছিল। মামার-বাড়ির বৈঠকখানায় অন্ধ নিকুঞ্জ দত্ত তানপুরা নিয়ে ধ্রুপদে একখানা মেঘ-মল্লার ধ'রেছেন, একজন পাখোয়াজ ধ'রেছেন, আর অন্য দু-তিনটি মাত্র শ্রোতা চুপ ক'রে শুন্‌ছেন—সেই ধ্রুপদখানি-ই যেন তখন-ই আমায় চিরতরে ভারতবর্ষের ধ্রুপদ সংগীতের কেনা গেলাম ক'রে নিলে—

ঘোরে ঘোরে বরখত বদরবা।

ধ্রুপদের মোহ কখনও কাটিয়ে' উঠ্‌তে পারি নি। বহুদিন পরে, আমার এক মামাতো ভগিনীপতি, শিবপুরের ছেলে ব'লে তিনিও উচ্চাঙ্গের সংগীতের চর্চা ক'র্‌তেন, তাঁর কাছে অনুরোধ ক'রে তাঁর চমৎকার কণ্ঠে গাওয়া দু-চার খানি ধ্রুপদ বার-বার শুনেছি—

তীন গ্রাম সপ্ত স্বর ইকইস মূরছনা। প্রভৃতি।

ক'ল্‌কাতায় সুকিয়াস্‌-রো-তে আমাদের বাড়ির পাশেই সংগীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাসা নিলেন, তখন কয়েক বছর ধ'রে তাঁর ওখানে ধ্রুপদ-খেয়ালের জলসায় হাজির থেকে সংগীত-রস আস্বাদনের সুযোগ হ'য়েছিল।

ধ্রুপদ ভালো লাগ্‌বার কারণ বোধ হয়, সবল এবং নিরাভরণ সৌন্দর্য্যের প্রতি, grand style-এর রচনার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ; যে-জন্য প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্য, হিন্দুযুগের মহাবলিপুরম আর ঘারাপুরীর ভাস্কর্য্য, পৃথিবীর সব জাতির বড়ো-বড়ো উপাখ্যান বা মহাকাব্য; অনাবশ্যক বচন-বিস্তার বা ভাবের মার-পেঁচ না দেখিয়ে' সহজ সোজা ভাবে অনুভূত আর চীনা কবিতার মতো সরল কবিতার রূপে প্রকাশিত রস-বস্তু; বাস্তুশিল্পের বিরাট্‌-বিরাট্‌ সৃষ্টি-সমূহ—যেমন গ্রীক দোরীয় রীতির মন্দির, হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির, তাজ, প্রাচীনতম যুগের বিজাস্তীয় ও গথিক গির্জা, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির, তঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির;—এই-সব জিনিস ভালো লাগে। বিশেষ ক'রে তানসেনের ধ্রুপদ কেন ভালো লাগে, তার একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'রেছিলুম কয়েক বৎসর পূর্বে, "কবি তানসেন" নাম

দিয়ে একটি প্রবন্ধে ('প্রবাসী' মাসিক পত্রিকার ১৩৪০ সালের বৈশাখ-মাসের সংখ্যায় এটি বেরিয়েছিল)।*

প্রাচীন ভারতের সংগীতের পুরাতন কোনও নমুনা এ পর্য্যন্ত সুরক্ষিত হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় নাচের একটা ধারণা ক'রতে পারা যায়, উদয়গিরি ভারহুৎ সাঁচীর আর মথুরা অমরাবতীর খোদিত চিত্র থেকে, অজণ্টা বাঘ গুহার আঁকা ছবি থেকে। সামগানের যে ধারা এখনও পর্য্যন্ত চ'লে এসেছে, তা থেকে এক ধরনের অতি বিশিষ্ট ধর্ম-সংগীতের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সাওঁতাল মুণ্ডা টোডা প্রভৃতি অনুন্নত জাতির স্বকীয় গানের সুর থেকে ভারতের আদিম অধিবাসীদের গানের ধাঁজটাও অনুমান করা যায়। সংগীত-সম্বন্ধে প্রাচীনতম সংস্কৃত বই কোনোটি-ই খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর ওদিক্‌কার নয়। খ্রীষ্ট-জন্মের প্রথম দুই-তিন শতকের মধ্যে লেখা শূদ্রকরাজার 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে, নায়ক চারুদত্ত অনেক রাত ধ'রে গান শুনে বাড়ি ফির্‌ছেন—তিনি পথে চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে সঙ্গী বিদূষক মৈত্রেয়ের কাছে উচ্ছ্বসিত ভাবে গায়ক রেভিলের প্রশংসা ক'র্‌ছেন—

রক্তং চ নাম মধুরং চ সমং স্ফুটং চ
ভাবান্বিতং চ ললিতং চ মনোহরং চ।
কিংবা প্রশস্তবচনৈর্বহুভির্মদুক্তৈর্
অন্তর্হিতো যদি ভবেদ্, বনিতেতি মন্যে॥

তার গান এত সুন্দর যে, যদি গায়ক চোখের বাইরে থাকেন, মনে হয় কোনও নারী গাইছে। এতে গানের পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যের চেয়ে মহিলোচিত মাধুর্য্যের প্রশংসাই দেখ্‌ছি। এ জিনিস মৈত্রেয়ের ভালো লাগে নি—তিনি ব'ল্‌ছেন—

মণুস্‌সো বি কাঅলীং গাঅন্তো, সুক্খ-সুমণো-দাম-বেট্‌ঠিদো বুড্‌ঢ-
পুরোহিদো বিঅ মন্তং জবন্তো, দিঢং মে ণ রোঅদি॥

'পুরুষ-মানুষ যদি কাকলি গায়, তা-হ'লে শুখনো ফুলের-মালা মাথায় জড়িয়ে' বুড়ো পুরোহিতের মন্ত্র-জপ করার মতন, আমার তা মোটেই ভালো লাগে না।'

* 'মিত্র ও ঘোষ' হইতে প্রকাশিত লেখকের 'ভারত-সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধ-সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে (বঙ্গাব্দ ১৩৭০) এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

বীণা বাজিয়ে' উজ্জয়িনীর বিদগ্ধজন-সভায় ভাব-রেভিল যে গান গেয়েছিলেন, তার ঠাট কী ধরনের ছিল, তা জান্‌বার উপায় নেই। দুষ্মন্তের অন্যতমা রাণী হংসপদিকা বীণা বাজিয়ে' যে 'বর্ণপরিচয়' বা মূর্ছনা রাজাকে উদ্দেশ ক'রে শোনাচ্ছিলেন, তাও কী ধরনের ছিল তা বল্‌তে পারা যায় না। মহাকবি বাণভট্ট অরণ্যের মধ্যে শিবের মন্দিরের অলিন্দে তরুণী তাপসী মহাশ্বেতার গানের বর্ণনা ক'রেছেন—শ্রীযুক্ত [অধুনা পরলোকগত] প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের গদ্য-কবিতাময় সুন্দর বঙ্গানুবাদে সেই বর্ণনাটুকু উদ্ধার ক'রে দেবার লোভ সংবরণ ক'র্‌তে পার্‌ছি না—

> সেই মেয়েটির কোলের উপর, চন্দ্রাপীড় দেখ্‌তে পেল, প'ড়ে র'য়েছে হাতীর-দাঁতে গড়া একখানি বীণা। দক্ষিণ করের অঙ্গুলিগুলি বীণার তারের উপর লীলাভরে চ'লেছে খেলে, আর কম্পিত অধরের অবকাশ দিয়ে ঝ'রে প'ড়্‌ছে দেব বিরূপাক্ষের বন্দনাগান—সেই বীণাতন্ত্রীঝংকারমিশ্র অমানুষিক স্বরলালিত্য।
>
> সাক্ষাৎ যেন গন্ধর্ববিদ্যা।
>
> গীতরবে আকৃষ্ট হ'য়ে মন্দিরদ্বারে স্থির হ'য়ে বসে আছে মৃগ বরাহ সিংহ—
> অনেক প্রাণী—আর বীণার ঝংকারের মাঝে মাঝে উঠ্‌ছে সেই
> অষ্টাদশবর্ষীয় প্রবাল-অধরের গান।
>
> চন্দ্রাপীড়ের মনে হ'ল—
>
> "......যে গান শুন্‌ছি সে গান মর্ত্যের নয়—নিশ্চয় গন্ধর্বলোকের।..."
>
> তারপরে সমাপ্ত হ'ল গীত।
>
> স্তব্ধ হ'ল বীণা, যেন শান্ত হ'ল কুমুদিনীকে ঘিরে ভ্রমরের মধুগুঞ্জন।
>
> মেয়েটি তখন উঠে শিবপ্রদক্ষিণ ক'রে নত হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌ল।

এই রকম গানের স্বর-লয় যদি পাওয়া যেত! কিন্তু সে কণ্ঠস্বর সে বীণাধ্বনি চিরতরে স্তব্ধ—তার ক্ষীণ ধারা হয়-তো আমাদের মধ্য-যুগের সংগীতে একটু-আধটু ঝংকৃত হ'চ্ছে।

উত্তর-ভারতের রাজপুত ছবি থেকে, পশ্চিম-বাঙলার শ্রেষ্ঠ পুঁথির পাটা থেকে, যেমন বাঘ অজন্টার ভিত্তি-চিত্রের ধারণা, ঘারাপুরী-কৈলাস-মহাবলিপুরম্‌-বাদামীর, মথুরা-অমরাবতীর আর ভারহুৎ-সাঁচীর খোদিত-চিত্রের ধারণা, সম্পূর্ণ ভাবে করা যায় না; তেমনি বোধ হয় আকবর-তানসেনের

সময়ের, খ্রীষ্টীয় ১৬-শ শতকের, হিন্দু সংগীত ধ্রুপদ থেকে (যে ধ্রুপদ গুরু-পরম্পরায় কতকটা তার তিন-চার শ' বছরের ধাঁজটুকু এখনও পর্য্যন্ত অনেকটা বজায় রেখেছে এ অনুমান করা অসংগত হবে না), খ্রীষ্টীয় ৭ম বা ৩য় অথবা খ্রীষ্ট-পূর্ব ২য় বা ৩য় শতকের প্রাচীন ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে পুরা বোধ হওয়া অসম্ভব। 'সংগীতদর্পণ' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত-বিষয়ক বই থেকে, উত্তর-ভারতের ধ্রুপদ আর দক্ষিণ-ভারতের 'পদম্' আর 'কীর্তনম্'-এর মতো প্রাচীন বা প্রাচীন-গন্ধী সংগীত-রীতি থেকে, তার কতকটা অনুমান মাত্র ক'র্‌তে পারা যায়; 'সংগীতদর্পণ' প্রভৃতি প্রাচীন বই (আমাদের বাঙলা দেশের আর নেপালের বৌদ্ধ পুঁথিতে আঁকা ছবি অজণ্টার আভাস যেমন কতকটা দেয় সে-রকম ভাবে) বাণভট্ট-কালিদাস-শূদ্রকের যুগের সংগীতের একটা আভাস হয়-তো দিতে পারে। কিন্তু সে-সব আলোচনা হ'চ্ছে সংগীতের ইতিহাস আর সংগীতের গতির বিষয়ে গবেষণার কথা।

ভারতে আর্য্যভাষার বিকাশ হ'য়েছে এই পথ ধ'রে—'সংস্কৃত' বা আদি-আর্য্য, 'প্রাকৃত' বা মধ্য-আর্য্য, আর 'ভাষা' বা নব্য-আর্য্য। মধ্য আর নব্য আর্য্যের সন্ধিক্ষণে আছে অপভ্রংশ, যা হ'চ্ছে একাধারে প্রাকৃতের অন্তিম রূপ, 'ভাষা'র আদিম রূপ। এই 'ভাষা'র ইতিহাস আরম্ভ হ'য়েছে খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিক্ থেকে; এখনও পর্য্যন্ত এই 'ভাষা'-যুগ অর্থাৎ নব্য-আর্য্য যুগ-ই চ'লেছে। এই নব্য-আর্য্য যুগের ভাষাতে আবার তিনটি স্তর ধরা হয়—আদ্য, মধ্য, নব্য। ভাষার ক্ষেত্রে আদি-আর্য্য, মধ্য-আর্য্য, নব্য-আর্য্য—এসব স্তরের প্রচুর উপাদান বিদ্যমান; কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে, অনুরূপ নব্য-আর্য্য বা 'ভাষা' যুগের মধ্য স্তরের (অথবা আদ্য স্তরের) পূর্বেকার উপাদান আমাদের সাম্‌নে আর বিদ্যমান নেই। আমীর খুস্‌রৌ আর গোপাল নায়ক—এঁরা ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের লোক; এঁদের সময় পর্য্যন্ত ধ্রুপদ-খেয়ালের সুর-লয়-যুক্ত গান রক্ষিত হ'য়েছে। এর পূর্বে আমরা জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ পাচ্ছি, খ্রীষ্টীয় বারোর শতকে, গানের কথা পাচ্ছি, সুর-তালের নাম পাচ্ছি, কিন্তু সুরটি পাচ্ছি না—অন্ততঃ বাঙালাদেশে পাচ্ছি না; শুনেছি মহারাষ্ট্রদেশে নাকি পুরাতন সুর রক্ষিত আছে। সুর-তালের নাম দেখে, গানের ঢঙ দেখে মনে হয়, গীতগোবিন্দের সে-সব গান ধ্রুপদের পর্য্যায়েরই ছিল। এর পূর্বে, খ্রীষ্টীয় বারোর শতকের প্রথম অর্ধে সংকলিত সংস্কৃত বিশ্বকোষ "মানসোল্লাস" বা "অভিলষিতার্থ-

চিন্তামণি”-তেও গানের কথা পাচ্ছি; কিন্তু সুর-লয় জান্‌বার উপায় নেই। শিল্পী আর শিল্পের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রাজপুত রাগ-রাগিণী-চিত্রের আলোচনা-মূলক তাঁর বিরাট্ সচিত্র গ্রন্থের ভূমিকাতে আমাদের রাগ-রাগিণীগুলির ইতিহাস আলোচনা ক'রেছেন। আমাদের সংগীতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর কল্পনা কত পুরানো, তা ব'ল্‌তে পারা যায় না; তবে নাম থেকে অনুমান হয়, অন্ততঃ কতকগুলি প্রাচীন রাগ আর রাগিণী, বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত বা বিভিন্ন প্রদেশে উদ্ভূত জনপ্রিয় সুরের বা গতের আধারে তৈরী হয়েছিল; যেমন গূর্জরী বা গুজরী, মালব, বঙ্গালী, গৌড়, মালব-কৌশিক, বত্রাড়ী, গন্ধার, ঝিঞ্জৌটী, কানড়া। অর্থাৎ এ থেকে প্রমাণ হয়, আমাদের মধ্য-যুগে অর্থাৎ ১২০০-১৬০০-র মধ্যে যা Classical Music বা উচ্চাঙ্গের সংগীত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, তা মূলে, তার হাজার বছর আগে, বহুল পরিমাণে লোক-সংগীত-ই ছিল। মার্জিতরুচির লোকের হাতে, শিক্ষিত কলাবন্তের হাতে, লোক-সংগীত বা গ্রাম-গীত, উচ্চ অঙ্গের সংগীতে উন্নীত হ'য়ে থাকে—সব দেশেই এটা দেখা যায়। পরবর্তী কালে সেই ধারা-ই চ'লে এসেছিল ব'লে মনে হয়; আমাদের প্রাচীন সংগীত কখনও স্থিতিশীল ছিল না, গতিশীল অর্থাৎ প্রাণবন্ত ছিল—আর সেইজন্যই এ জিনিস এতকাল ধ'রে জীয়ন্ত চ'লে এসেছে। দরকার-মতো বিদেশী জিনিস এতে ঢুকেছে, লোক-গীতের বা গ্রাম-গীতের সুরও এতে প্রভাব বিস্তার ক'রেছে, এর সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়েছে। শুদ্ধ আর মিশ্রিত, প্রাচীন আর নবীন, দু রকমেরই স্থিরীকৃত melody অর্থাৎ রাগের রেওয়াজ বোধ হয় গোড়া থেকেই আছে। আজ যা মিশ্র রাগ, classical বা প্রাচীন হ'য়ে কা'ল তা শুদ্ধ রাগের সম্মানই পেলে। তানসেনের সৃষ্টি “দরবারী কানড়া” বা “মিয়াঁ-কী মল্‌হার”—এই রকম রাগকে কেউ এখন আর non-classical অর্থাৎ নিকৃষ্ট, অথবা উৎকৃষ্ট বা উচ্চাঙ্গের নয়, এমন কথা ব'ল্‌বেন না।

খ্রীষ্টীয় বারোর-তেরোর শতকের পর, এদেশে তুর্কী-বিজয়ের পর থেকে, ফারসী বা মুসলমান ঈরানের সংস্কৃতি নোতুন ক'রে ভারতবর্ষের হিন্দু সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করে। ধর্মের আর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে ঈরান থেকে একটা প্রবল সূফী প্রভাব ভারতের নব-জাগরিত ভক্তি-বাদের উপরে প'ড়েছিল ব'লে মনে হয়। সূফী অনুভূতি আর দর্শন হ'চ্ছে মুখ্যতঃ শেমীয় আরব ইস্‌লামের ধর্মভাব আর অনুভূতির প্রতি আর্য্য ঈরানের মনের

প্রতিক্রিয়ার ফল,—কিন্তু এর সংগঠনে ভারতের বেদান্তেরও যে একটা বড়ো স্থান ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উত্তর-ভারতের বাস্তু-শিল্পেও বেশ প্রচুর পরিমাণে ঈরানের প্রভাব পড়ে, ভারতীয় আর ঈরানীয়।

এই দুই বাস্তু-রাতির মিশ্রণে মধ্য-যুগের উত্তর-ভারতীয় বাস্তু-রীতিতে তার এক নোতুন Indo-Moslem বা ভারতীয়-মুসলমান ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষাতে আর সাহিত্যেও (উত্তর-ভারতে বিশেষ ক'রে, যেখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ঘ'টেছিল) ঈরানী প্রভাব প'ড়্তে থাকে—বিভিন্ন উত্তর-ভারতীয় নব্য-আর্য্য ভাষায় ফারসী শব্দ এসে নিজেদের ঠাঁই ক'রে নিতে থাকে,—আর, সতেরোর-আঠারোর শতকে দকনী অর্থাৎ দক্ষিণাপথে উত্তর-ভারতের মুসলমানদের দ্বারায় নীত আর প্রতিষ্ঠিত হিন্দী, আর উর্দু অর্থাৎ উত্তর-ভারতের মুসলমান রাজ-দরবারে প্রচলিত হিন্দী, এই দুটি ভারতীয় ভাষা, মুসলমান ঈরানের ফারসী ভাষা আর সাহিত্যের আদর্শে গ'ড়ে উঠে। উত্তর-ভারতের সংগীতেও সেই রকম মুসলমান (অর্থাৎ ঈরানী) প্রভাব কিছু কম পড়ে নি। কিন্তু ঈরানের গজল-মর্সিয়া-কাওয়ালির সুর এসে গেলেও, আমাদের ভারতীয় সংগীতের জা'ত একেবারে যায় নি, আমাদের রাগ-রাগিণীর ঠাট ঠিক-ই বজায় ছিল, বাইরে থেকে যা এসেছিল তাকে একেবারে হজম ক'রে নিজের অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছিল। ভারতীয় সংগীতের বিকাশ তার পুরানো ধারা বজায় রেখেই চ'ল্ল। মুসলমান গায়কেরা আর সংগীতের মুসলমান পৃষ্ঠপোষকেরা সকলেই প্রাচীন যুগ থেকে উপলব্ধ রাগ-রাগিণী-মূলক ভারতীয় সংগীতের রীতি বা পদ্ধতিকে গ্রহণ ক'র্লেন। দেশে ধ্রুপদ ছিল, আমীর খুস্রৌ ঈরানী প্রভাব এতে সংযুক্ত ক'র্লেন, তিনি আর তাঁর সমসাময়িক সংগীত-রসিকেরা নোতুন জিনিস আন্লেন—'খ্যাল' বা খেয়াল। পাঞ্জাবের প্রচলিত লোক-সংগীতের আধারে গ'ড়ে উঠ্ল 'টপ্পা', শোরী মিঁয়ার প্রভাবে যা উত্তর-ভারতের প্রৌঢ় বা শিক্ষিত সংগীতের সভায় একটি মর্য্যাদার আসন পেলে। তেমনি বুন্দেলখণ্ডের লোক-সংগীত থেকে 'দাদরা' এল'। প্রাচীন কালে যে ভাবে প্রাদেশিক সংগীতের ক্ষেত্র থেকে প্রাণরস নিয়ে ভারতীয় শিক্ষিত বা উচ্চকোটির সংগীত-তরু সমৃদ্ধ হ'য়েছিল, এ সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি হ'ল। মধ্যযুগে বাঙলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হাতে 'কীর্তন'-এর সৃষ্টি হ'ল, ষোলোর আর সতেরোর শতকে ; এর মূলে ছিল প্রাচীন রাগ আর তার তাল। কিন্তু বাঙলার স্থানীয় লোক-সংগীতের প্রভাবে

প'ড়ে কীর্তন একটা বিশিষ্ট রূপ ধ'রে নিলে। প্রাচীন ভারী আর বিলম্বিত চালের কীর্তন কখনও-কখনও ধ্রুপদকেই স্মরণ করিয়ে' দেয়; কিন্তু হাল্‌কা চালের কীর্তনও এল'। বাঙলাদেশে এদিক্‌কার কালে এই জিনিসের চল বেশী ক'রে হ'ল। বাঙলাদেশ উত্তর-ভারতের রাজধানী দিল্লীর তুর্কী পাঠান আর মোগল দরবার থেকে দূরে ছিল ব'লে, মধ্য-যুগে বাঙলার লোক-সংগীত উত্তর-ভারতের উচ্চ-কোটির সংগীতকে তেমন কিছু দিতে পারে নি—নিজের প্রকৃতি আর রুচি অনুযায়ী বাঙলাদেশের লোকেরা কীর্তন আর বাউল, ভাটিয়াল, রামপ্রসাদি প্রভৃতি কতকগুলি ঢঙের সুর নিয়েই খুশী ছিল; আর পশ্চিমের সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে পেরেছিলেন এমন শিক্ষিত সংগীতজ্ঞদের মধ্যে বাঙলাদেশেও ধ্রুপদ-খেয়াল একটা সম্মানের আসন ক'রে নিলে। পশ্চিম-বাঙলায় বিষ্ণুপুর-নগর মল্ল-বংশীয় রাজাদের আমলে আঠারো শতকের গোড়া থেকে ধ্রুপদ-খেয়ালের একটি কেন্দ্র হ'য়ে পড়ে; পূর্ব-বঙ্গে ঢাকাও সেই রকম পশ্চিম থেকে আগত কালোয়াতি গানের আর একটি কেন্দ্র হয়। লখ্‌নৌয়ের শৌখীন বাদশাহদের আমলে উত্তর-ভারতের সংগীতের গতি অব্যাহত থাকে, গজল কাওয়ালি আর টপ্পা-ঠুমরির খুব-ই উন্নতি হয়। ধ্রুপদ-খেয়ালের পাশে-পাশে বাঙলাদেশেও টপ্পা-ঠুমরির প্রচলন হয়, আর এই বিষয়ে রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) উনিশের শতকের মধ্য-ভাগে বাঙলা সংগীতে তাঁর গান আর সুরের সাহায্যে যুগান্তর আনয়ন করেন।

দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটক-পদ্ধতির সংগীতের ইতিহাস আমরা ঠিক জানি না। বিগত শতকের মধ্য-ভাগে তেলুগু-ভাষী কবি আর সংগীতকার, শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত ত্যাগরাজ, দক্ষিণের ধ্রুপদ 'কীর্তনম্' রচনা করেন; দক্ষিণ-ভারতের সংগীতে, উত্তর-ভারতের তানসেনের মতোই তাঁর গৌরবময় স্থান। ত্যাগরায়ের তেলুগু কীর্তনম্-গুলি রামচন্দ্র-বিষয়ক, উত্তর-ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের ধ্রুপদের পদের মতন কর্ণাটকীয় সংগীতে এগুলির প্রসিদ্ধি—তমিল কানাড়ী আর মালয়ালী গায়কেরাও তেলুগু কীর্তনম্ গেয়ে থাকেন, যেমন মারাঠী, পঞ্জাবী, কাশ্মীরী, গুজরাটী, বাঙালী গায়কেরাও তানসেনের ব্রজভাষা-হিন্দীতে নিবদ্ধ ধ্রুপদ গেয়ে থাকেন। দক্ষিণ-ভারতের সংগীতে বোধ হয় আমাদের খেয়াল-টপ্পা-ঠুমরির মতো প্রাচীনের নবীনতর রূপভেদ দেখা দেয় নি—মুসলমান-পূর্ব যুগের, শুদ্ধ হিন্দু-সংগীতের রূপটি বোধ হয় দক্ষিণ-ভারতেই বেশি ক'রে সংরক্ষিত হ'য়ে আছে।

আধুনিক কালে ভারতবর্ষের সংগীতে স্বর-স্রষ্টা অনেক হ'য়েছেন। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় সংগীতে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—অন্য কারও সে রকম স্থানটি নেই ব'লে মনে হয়। বড়ো-বড়ো গায়কদের কথা ব'ল্‌ছি না, ভাতখাণ্ডে প্রমুখ প্রাচীন সংগীতের সংশোধক বা গবেষক এবং সংস্কারকদের কথা ব'ল্‌ছি না। আধুনিক বাঙলা গানকে অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষেরই সংগীতকে পুষ্ট ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। এখন, বিশেষ ক'রে বিগত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে রেডিও আর বেশি ক'রে সিনেমার কল্যাণে, নিখিল ভারতের সংগীত বিভিন্ন-প্রদেশ-নির্বিশেষে এক-ই ছাঁচে ঢালা হ'য়ে যাচ্ছে। এক-ই হিন্দী গান বোম্বাই, পুনা, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, হাইদরাবাদ, মথুরা, নাগপুর, ক'ল্‌কাতা, ঢাকা, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ, লখ্‌নৌ, দিল্লী, লাহোর, করাচী, অজমেরের রাস্তায় পথ-চল্‌তি লোকের মুখে শোনা যাচ্ছে—এই-সব গান, সিনেমার প্রভাবের ফল। পারসী থিয়েটারের মারফৎ বোম্বাইয়ের প্রচলিত স্বর (প্রাচীন রাগ-রাগিণী ভেঙে, অথবা বিলিতি গান ভেঙে তৈরা) বাঙলাদেশে এসে যাচ্ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর হালে গুরুসদয় দত্ত, ইংরেজি স্বরও বাঙলায়—ভারতবর্ষে—আমদানি ক'রেছেন। বাঙলা গানের স্বর ততটা ভারতের অন্যত্র স্থান পাচ্ছিল না ; এক তো এই-সব গানের ভাষা বাঙলা, বাঙলার বাইরের লোকে বোঝে না—আর বাঙলা গানে (classical বা প্রাচীন গানের চেয়ে) কথার স্থানটি অনেক উঁচুতে ; তারপর এই-সব গানের স্বর, নিখিল-উত্তর-ভারত-কর্তৃক সম্মানিত ভারিক্কে রাগ-রাগিণীর নয়, ভাঙা রাগ-রাগিণীর। এই দুই কারণে, প্রচলিত বাঙলা গানের স্বর বাইরে ততটা যেতে পারে নি—কীর্তন বাউল ভাটিয়াল তো দূরের কথা। এগুলি খাঁটি বাঙালী Folk-music বা লোক-সংগীতের পর্য্যায়ের ব'লে, বাঙলার ভিতরে অনেকটা, আর বাইরে, অপাংক্তেয় ছিল ; এক কীর্তন তো সেদিন-মাত্র দেশবন্ধু-চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, রসময় মিত্র আর সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়দের চেষ্টায় বাঙালার শিক্ষিত সমাজে নিজের স্থান ক'রে নিয়েছে। নহলে, কীর্তন কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই নিবদ্ধ ছিল, বাউল ভাটিয়াল যে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা পেয়েছে, তা মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে। বাঙালী ওস্তাদ বা কালোয়াতদের কাছে এগুলির মর্য্যাদা ছিল না, সেইজন্য বাঙলার বাইরেকার ওস্তাদ আর কালোয়াতদের শ্রদ্ধাও এই-সমস্ত বিশিষ্ট বাঙলা সংগীত পেতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ-খেয়াল প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পের প্রশস্ত রাজমার্গের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তিনি এগুলিকে উপেক্ষা করেন নি। প্রথম-প্রথম শুদ্ধ বা প্রাচীন রাগ-রাগিণীর সংগীতের মোহে তিনিও প'ড়েছিলেন, এবং তাতে ফল ভালোই হ'য়েছিল। প্রথম জীবনে রচিত তাঁর অনেক গানের সুরে আমরা শুদ্ধ প্রাচীন সংগীতের পুর্ণ অনুকরণ দেখ্‌তে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়,—তাঁর সুপরিচিত ব্রহ্ম-সংগীতটি—

তোমারি মধুর রূপে ভ'রেছে ভুবন……।

এটি ঝিঞ্ঝোটী (বা ঝিঝিঁট) রাগের একটি বিখ্যাত ধ্রুপদ-চৌতালের ব্রজ-ভাষা গানেরই সুরের পুরা অনুকরণ; এই প্রাচীন ব্রজভাষা বা হিন্দী গানটি এই; কার রচনা এটি জানি নে *—

তেরৌ রী নয়ন বান, ভৌ হৈ ধনুখ, চৌন্দ্র-বদন-পর ঝলকত মোহত মন॥
অরুন-বরন অধর, দৌন্ত কুন্দন বহার দেত;
সোহৈ ঐসী বেনী সির-পর—নাগ-কৌ ফন॥
স্রবন কুণ্ডল, নাস বেসর, কৌণ্ঠ মাল; ভুজ ম্রিনাল, কুচ উতৌঙ্গ, নাভি ভ্রমর;
পহিরৈ নীল সাড়ী॥.
কটি কিঙ্কিনী, কদলী-খৌম্ভ জৌঙ্ঘ, চরন কনক-নূপুর; চলত চাল
গতি মরাল, জোবন-ভরী॥

কিন্তু নিছক ধ্রুপদের মৃদঙ্গ-নির্ঘোষ—কালোয়াতি সংগীতের, শুদ্ধ বা উচ্চ হ'লেও এ যুগের লোক আমাদের মধ্যে বেশির ভাগের কাছে, কতকটা আড়ষ্ট আর প্রাণহীন গীত—সকলকার প্রীতি-দায়ক হয় না; সংগীতেও এমন সব জিনিস চাই, যা তার আশ-পাশের জীবনের পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্যুত বা পৃথগ্‌ভূত নয়। এই জন্যই, যেমন মধ্য-যুগের হিন্দী বাঙলা ভেঙে আধুনিক হিন্দী বাঙলা, তেমনি মধ্য-যুগের সংগীতের ধারা কালোয়াতি সংগীতের বিকাশে বা বিকারে জাত আধুনিক সংগীত, রবীন্দ্রনাথকে সহজ ভাবেই টেনে নিলে।

* শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর "বিষ্ণুপুর ঘরাণা" বইয়ে এই গানটিকে বাঙলার প্রখ্যাত ধ্রুপদী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের রচিত ব'লে উল্লিখিত ক'রেছেন (কলিকাতা বুক্‌ল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ৩৭)। বাঙলার ধ্রুপদী গাইয়েদের কেউ-কেউ যে ব্রজভাষাতে তাঁদের বাণী রচনা ক'রেছেন, তার যথেষ্ট উদাহরণ আছে।

সংস্কৃত-চর্চার বারণ নেই, কিন্তু ভাষার চর্চাও চাই; সংস্কৃত-চর্চা নিজেই একটা উদ্দেশ্য হ'তে পারে, কারণ তা একটি বড়ো দরের মানসিক বা আধ্যাত্মিক আনন্দের সাধন স্বরূপ হ'য়ে থাকে; কিন্তু সংস্কৃত-চর্চা বাঙলা-ভাষার উন্নতির জন্যও হ'তে পারে। উচ্চ অঙ্গের সংগীত কতকটা আধুনিক সংগীতেরই পটভূমিকা-স্বরূপ বিদ্যমান, তাই তার চর্চা আবশ্যক—আধুনিক সংগীতের দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখ্‌লে এ কথাটি বলা যায়।

অপূর্ব রসানুভূতির অধিকারী রবীন্দ্রনাথ যখন গান বাঁধ্‌তে আর সুর দিতে নিযুক্ত হ'লেন, তখন তাঁর সৃষ্ট বাঙলা গানের সুর একটা স্বতন্ত্র বস্তু হ'য়ে দাঁড়াল। তিনি গানে কথার যথোচিত মূল্য দিলেন। গানের বাণী বা কথা, আর গানের সুর, এই দুইয়ে হাত ধরাধরি ক'রে না চ'ল্‌লে, একটিকে না দেখে কেবল আরটির দিকেই দৃষ্টি দিলে, গান আর গান থাকে না, হ'য়ে দাঁড়ায়—হয় খালি কবিতা, নয় কেবল গৎ। বাক্য আর অর্থের মতো, কথা আর সুরের হর-গৌরী-মিলন হ'লেই সত্যকার 'গান' হয়। কবি নিজেই তাই গেয়েছেন—

প্রতিদিন তব গাথা গাবো আমি সুমধুর,
তুমি মোরে দাও কথা, তুমি মোরে দাও সুর॥

প্রাচীন 'বাগ্‌গেয়-কবি' অর্থাৎ সংগীত-রচকেরা একথা বুঝ্‌তেন; সেইজন্যই জয়দেবের পদের এত যত্ন-সাধ্য লালিত্য; তানসেন-প্রমুখ ধ্রুপদ আর অন্য সংগীত-রচকেরাও বুঝ্‌তেন—তানসেন, আমার মনে হয়, কেবল সংগীতকার ছিলেন না, বড়ো দরের কবিও ছিলেন, তা তাঁর রচিত বাণী বা কথা থেকে উপলব্ধি করা যায়। তানসেনের কাছেও তাঁর গানের কথা বা বাণী যথোচিত মর্য্যাদা পেয়েছিল। তাঁর রচিত একটি গানের শেষে তিনি ব'লেছেন—

তানসেন অন্তর-বানী ধুরুপদ পুকার॥

অর্থাৎ, তানসেনের অন্তরের বাণী এই ধ্রুপদ-গানেই উচ্চ-রবে ঘোষিত হ'চ্ছে।

কিন্তু মাঝের যুগের ওস্তাদ বা কালোয়াত অর্থাৎ ব্যবসায়ী গায়ক, যাঁদের হাতে বেশি ক'রে সংগীত-শিক্ষা সমাজের তরফ থেকে দেওয়া হ'য়ে থাকে, তাঁরা এ কথাটা প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁরা হ'য়ে পড়েন সংগীতের নিছক বৈয়াকরণ; সংগীতের কথার মূল্য তাঁদের কাছে বড়ো একটা ছিল না—যা তা শব্দ বা অক্ষর হ'লেই তাঁদের চ'ল্‌ত। বাঙলার ওস্তাদের হাতে তানসেনের শুদ্ধ ব্রজভাষার মতো অমন সুন্দর আর মার্জিত একটা সাহিত্যের ভাষার কি 'হেনস্থা'ই না ইদানীং হ'য়েছিল! অজ্ঞাতার্থ হিন্দী শব্দের কথা ছেড়ে দিচ্ছি,

পশ্চিমা উচ্চারণে শুদ্ধ সংস্কৃত কথাগুলিরও অদ্ভুত সব বিকৃতি ঘ'টেছিল, 'সদ্যোজাত' হ'য়ে গিয়েছিল 'সাধেও জাত', 'মোক্ষদায়িনী' (উচ্চারণে 'মোচ্ছ-দায়িনী') হ'য়ে গিয়েছিল 'মুচ্ছে দায়িনী'; 'পক্ষিগণ', 'পাচিগণ'; 'অধ্যয়ন', 'আধেয়ান'; আর 'বীচ মেঁ' হ'য়ে গিয়েছিল 'বিছুমে', 'উমড়-ঘুমড়' হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল 'উমডে গুমডে', ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'কাদম্বরী'র সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ ক'রে যে সুন্দর আর বাঙলা-সাহিত্যে সুপরিচিত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে এ সম্বন্ধে তিনি ব'লেছেন—গানের কথায় আছে 'চলত রাজকুমারী', কিন্তু সুরের মোহে প'ড়ে গিয়েছেন যে ওস্তাদ গাইয়ে', তিনি ঘুরে ফিরে 'চ-ল-ত' শব্দটিকে নিয়েই সুরের পেঁচ ক'ষ্‌তে লেগে গিয়েছেন—এদিকে রাজকুমারীর চলা আর হয় না, কালোয়াতি সংগীতের সমঝদারদের তাতে আপত্তি নেই। গানের মধ্যে কথার মূল্যের প্রতি তিনি আবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌লেন। এ সম্পর্কে এ কথাও স্বীকার্য্য যে, বাঙলার কীর্তনে সুর আর বাজনার একটা বড়ো স্থান থাক্‌লেও, কথার উপরেই একটু বেশি জোর দেওয়া হ'ত—কীর্তনের মধ্যে আঁখর দেবার রীতি এর-ই ফল; এই জন্যও বোধ হয় ওস্তাদ-মহলে কীর্তন জা'তে উঠ্‌তে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব-সম্বন্ধে ভারতবর্ষে সুপরিচিত ওলন্দাজ-জাতীয় সংগীতবিদ্‌ ও গবেষক শ্রীযুক্ত [অধুনা পরলোকগত] A. A. Bake আর্নল্ড্‌ বাকে যা ব'লেছেন, তা উদ্ধার ক'রে দেওয়া যেতে পারে—

Knowing the old *rāgas* perfectly well, he too had the right to use and change them as his own inspiration told him to do. Had not the old mystics created their own *rāgas*, the *Bāuls* their own tunes, and had not *Kīrtan* adapted the old forms to new needs ?

His perfect balance of words and melody, and his simplicity and conciseness of construction, are contributions to the whole of Indian music that cannot be under-rated easily.

It is characteristic ef the genius of Rabindranath Tagore that he has, as if by instinct, found the *Dhrūpad* the only form in ancient Indian music that could serve as a basis for his creations. From long before the Muhammadan conquest, even up to our present days, this form of Indian music, regarded as most sacred, continued to exist, in which the

words had and have their importance. Still the holy character implied the use of very difficult tune and very dignified *rāgas*. The poet has succeeded in keeping the essential features of construction, but nevertheless has made the form supple and clear, fit for the direct appeal even to the heart of the simple peasant.

This happy combination of the *Dhrūpad* and folk-music is the strongest feature of the musical *œuvre* of Tagore. ('Rabindranath Tagore's Music', in the *Golden Book of Tagore*).

কথা আর স্বর পরস্পরের সঙ্গে এতটা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত থাকার দরুনই রবীন্দ্রনাথের গানের এতটা জনপ্রিয়তা। তা ছাড়া, কথার নিজের বিশেষ কাব্য-সৌন্দর্য্য আর মর্য্যাদা বুঝে, তাকে তিনি তাঁর সংগীত-রচনায় যথোচিত স্থান দেন। বাঙলার বাউল আর ভাটিয়াল, বাঙলার কীর্তন,—Folk-lore অর্থাৎ 'লোক-যান' (অর্থাৎ কিনা আধুনিক শিক্ষা হ'তে দূরে থেকে, প্রাচীন মনোভাব নিয়ে যে-সব গ্রামীণ ব্যক্তি প্রাচীন সংস্কৃতির আব-হাওয়ায় পরিবর্ধিত হ'য়ে চিরাচরিত রীতিতে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন, তাঁদের চর্য্যা অর্থাৎ আচার এবং বিচার, সংগীতও এর অন্তর্গত) আলোচনা করেন এমন পণ্ডিতেরা, অথবা গ্রামীণ পদ্ধতির জীবনের প্রতি দরদী লোকেরা, হয়-তো কালে-ভদ্রে যার চর্চা ক'র্‌বেন, কিন্তু যা ক্রমে শিক্ষার আর আধুনিকতার প্রসারের সঙ্গে 'সেকেলে' আর 'গ্রাম্য' ব'লে লুপ্ত হ'য়ে যাবে,—এরকম লোক-সংগীতের গণ্ডীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে আর নিবদ্ধ রইল না, বাঙলার জাতীয় সংগীতের পর্য্যায়ে উন্নীত হ'ল; শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে স্থান পেয়ে, রবীন্দ্রনাথের গানে স্থান পেয়ে, বাঙলার এই-সব লোক-সংগীত এখন নিখিল ভারতের নিকট গৃহীত হ'চ্ছে; তাই আমরা হিন্দী আর অন্য ভাষার সবাক্ চিত্রের গানে কীর্তন ভাটিয়াল বাউলের ঝংকার মাঝে-মাঝে শুন্‌ছি। শ্রীযুক্ত বাকে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ ক'রে লিখেছিলেন—It was the folk-music of Bengal that stirred the depth of his nature with such wonderful results. তিনি আরও মন্তব্য ক'রেছেন—Only the fact that the educated classes of his country

who live in towns have lost contact with the real folk-life accounts for the discredit of his music in the appreciation of so many who love and admire his poems ;—এ কথাটা পুরোপুরি ঠিক না হ'লেও, আংশিক-ভাবে ঠিক তো বটেই। পূর্ব-বঙ্গের বাউল আর ভাটিয়াল, আর পশ্চিম-বঙ্গের কীর্তন—এইতে মিলে তাঁকে সারা বাঙলার লোক-সংগীতের রাজা ক'রে তুলেছে।

রবীন্দ্র-সংগীতের আর একটি বড়ো জিনিস হ'চ্ছে, তার দেওয়া সুরের মধ্যে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটুকু—the Rabindra touch. আমরা 'হিন্দুস্থানী দরদ'-এর কথা শুনি, হিন্দী গানে কোথাও-কোথাও তা অনুভবও করি। দু-একটা এমন খোঁচ-খাঁচ, টান-টোন, গলার কাঁপুনি গানের সুরের মধ্যে থাকে, তাতেই জিনিসটি একেবারে যেন কোন্ উর্ধ্বে উঠে যায়, তার সাধারণত্ব আর থাকে না। এই Rabindra touch—রবীন্দ্রের পুণ্যস্পর্শ, রবীন্দ্রের হাত, বা রবীন্দ্র-শ্রী—আমরা সকলেই বুঝি; রবীন্দ্র-সংগীতের ভালো গাইয়েরা এইটুকুই প্রকাশ ক'র্তে পারেন ব'লেই তাঁদের কদর। 'আমারে করো তোমার বীণা', 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী', 'আজি দখিন দুয়ার খোলা', 'অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে', 'এসো, এসো বসন্ত ধরাতলে', 'আমার নিশীথ-রাতের বাদলধারা', 'কার বাঁশী বাজিল', 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না', 'মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে',—ইত্যাদি ইত্যাদি কত গান মনে পড়ে, যা তরুণ অবস্থা থেকে শুনে আস্ছি, দরদী গায়কের মুখের ধ্বনি যে-সব গানের সুরের মধ্যে নিহিত এই অবর্ণনীয় রবীন্দ্র-শ্রীটুকুকে ফুটিয়ে' তুলে মনের মধ্যে একটি অব্যক্ত আকুলতা এনে দিয়েছে, এখনও এনে দেয়। গুরু-পরম্পরায়, আর রেকর্ডের সাহায্যে এই জিনিসটি রক্ষিত হ'তে পার্বে। কালের স্থূল হস্তাবলেপের ফলে এই রবীন্দ্রীয় শ্রীটুকু হয়-তো বা বিলুপ্ত হ'য়ে যেতে পারে; কিন্তু তাহ'লে রবীন্দ্র-সংগীতের অনেকটাই চ'লে যাবে। আশা করি, এই জিনিসটুকু আধুনিক ভারতীয় সংগীতে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট দান ব'লে, এটুকুর রক্ষার জন্য সকলেই অবহিত হবেন। এটা একটা বিশেষ ঢঙ্ বা ভঙ্গী নয়; এটি আরও সূক্ষ্ম, তুলির টানের মতন গলার বিশেষ রেশের ব্যাপার। আমার মতন অনভিজ্ঞ মানুষের কানে যে ভাবে এই Rabindra

touch-এর প্রকাশটুকু তার স্পর্শ এনে দিয়েছে, কেবল তারই বিষয়ে কিছু বল্‌বার জন্য এই অক্ষম চেষ্টা-মাত্র ক'র্‌লুম—বিশেষজ্ঞরা আমার কথাগুলি ক্ষমা-ভাবের সঙ্গে গ্রহণ ক'র্‌বেন।

এই-সব, আর নিশ্চয়ই আরও অনেক-কিছু জড়িয়ে' রবীন্দ্র-সংগীতকে ভারতের সংগীতের ইতিহাসে তার একটা নিজস্ব স্থান দিয়েছে। আমাদের দেশের বড়ো সংগীত-কারদের সঙ্গে তুলনা কর্‌বার দরকার নেই; মহাকাল যথা-সময়ে যার যে স্থান তা ঠিক ক'রে দেবেন; কিন্তু ভারত-সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে ভারত-সংগীতের আলোচনা ক'র্‌তে গেলে, আধুনিক কালে ভারতের সংগীত-বিষয়ক প্রচেষ্টার সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌তে হ'লেই, রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না ক'রে পারা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতে ইউরোপীর সংগীতের Harmony অর্থাৎ বিবাদের মধ্যে সংবাদ আন্‌বার পক্ষেও ছিলেন। পথিকৃৎ বা সংস্কারক না হ'লেও, সংগীতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রধান রসস্রষ্টা আর পদপ্রদেষ্টা॥

গীতবিতান বার্ষিকী

বঙ্গাব্দ ১৩৫০

(স্বল্প সংযোজন সহ)

অহম-রাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ

আমাদের প্রাদেশিক ইতিহাস, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-ভারতের অংশ-স্বরূপ বাঙ্গালার ইতিহাস, আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। বাঙ্গালী অর্থাৎ বঙ্গভাষী জনগণের এবং অসমিয়া ও উড়িয়া-ভাষী জনগণের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত করিবার উপাদান যাহা আছে, তাহা হইতে কতকগুলি অনুমান করা চলে মাত্র। খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বেকার কয়েক শত বৎসর হইতে এই পূর্ব-ভারত অঞ্চলে আর্য্য প্রাকৃত ভাষার স্থাপনার ও ইহার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে, ভবিষ্যতের বাঙ্গালা- অসমিয়া-উড়িয়া-ভাষী জনগণের উদ্ভব সম্ভবপর হইল। আদিম 'নিষাদ' বা Austric অষ্ট্রিক অর্থাৎ 'দাক্ষিণ'-ভাষী জাতি, এবং দ্রাবিড়-ভাষী-জাতি, ইহাদের আধারের উপরে আসিল আর্য্য-ভাষী জাতি। পূর্ব-ভারতে—হিমালয়ের দক্ষিণ পাদ-দেশে, উত্তর-বঙ্গে, পূর্ব-বঙ্গে ও আসামে—উপনিবিষ্ট হইল 'কিরাত' অথবা মোঙ্গোল জাতির মানুষ, উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গালার কতকগুলি জেলায় এবং ব্রহ্মপুত্র-নদের দেশে; অনুমান হয়, ঐ অঞ্চলের মিশ্রিত দাক্ষিণ বা নিষাদ তথা দ্রাবিড়-ভাষীদের প্লাবিত করিয়া দিয়া বা তাহাদের নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের পথ ধরিয়া নবাগত কিরাত বা মোঙ্গোল জাতির নানা শাখা আসিয়া ব্রহ্মপুত্রের দেশে, নাগা, মিকির, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া এবং গারো পাহাড়ে, মণিপুরে, কাছাড়ে ও শ্রীহট্ট জেলায় (সুরমা নদীর দেশে), ত্রিপুরা ও কুমিল্লায়, ময়মনসিংহ, বগুড়া ও রঙ্গপুরে, দিনাজপুরে, জলপাইগুড়িতে ও কোচবিহারে উপনিবিষ্ট হয়। এই সমস্ত মোঙ্গোল জনগণ বেশির ভাগ এখন বাঙ্গালী ও অসমিয়া জাতির-ই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

কিরাত বা মোঙ্গোল-জাতীয় মানুষের ভারতে আগমন ঘটিয়াছিল সম্ভবতঃ আর্য্যদের আগমনের পূর্বে। শুক্ল যজুর্বেদে (৩০।১৬) পর্বতগুহাবাসী কিরাতের উল্লেখ প্রথম পাই;—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-এর বহু পূর্বেই ইহাদের কতকগুলি গোত্র বা গোষ্ঠী পূর্ব-হিমাচলের সানুদেশে আসিয়া প্রথম উপনিবিষ্ট হয়। মহাভারত ও মনুসংহিতায় পর্বতবাসী কিরাতদের কথা আছে। গ্রীক

লেখকগণও খ্রীষ্ট-জন্মের কাছাকাছি সময়ে Kirrbadoi নামে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন—ইহারা উত্তর পূর্ব-ভারতের পর্বতাঞ্চলে থাকিত।

ভারতীয় সভ্যতার আর্য্য, দ্রাবিড় ও নিষাদ বা দাক্ষিণ জাতিত্রয়ের আহৃত উপাদান লইয়া বিচার, আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত চলিতেছে; কিন্তু কিরাত বা মোঙ্গোল জাতির দ্বারা পূর্ব-ভারতে ভারতীয় সভ্যতা কী ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, কী বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, তাহার বিচার বা আলোচনা এখনও হয় নাই—সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা। উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-ভারতে হিন্দু সংস্কৃতির যে অভিনব এবং স্বতন্ত্র বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেও আমরা—শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বিশেষতঃ—এখনও সচেতন হই নাই। আসামের ও উত্তর এবং পূর্ব-বঙ্গের হিন্দু তান্ত্রিক বা শাক্ত ধর্মের, বৈষ্ণব ধর্মের এবং গ্রাম্য লোক-ধর্মের বা লোকযানের যে বিকাশ দেখা যায়, এই প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান তীর্থ-গুলির পশ্চাতে যে অধুনা-লুপ্ত প্রাগ্-হিন্দুধর্ম-জগতের ইঙ্গিত আমরা দেখিতে পাই, সে-সমস্ত কথা এখনও আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র হইয়া উঠে নাই। এই অঞ্চলে উপনিবিষ্ট এবং এখনকার কালের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিলীন ও বিলীয়মান, ভোট-চীন-ভাষী অহম, কুকি, নাগা এবং মোন্-খ্মের-ভাষী খাসিয়াদের বৈশিষ্ট্য—তাহাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রকৃতি বা ধর্মপ্রবণতা, এবং তাহাদের চিন্তা-ধারা ও কর্ম-প্রচেষ্টা—স্থানীয়, অর্থাৎ আসাম এবং উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের জনগণের জীবনে ও ইতিহাসে যে প্রতিফলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোট-চীন ও মোন্-খ্মের-ভাষী এই সমস্ত মোঙ্গোল-জাতীয় মানুষের চরিত্রে যে-সব বিশিষ্ট গুণ আছে, সাধারণ ভাবে সে-সব গুণের নির্ধারণ বা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার; তবে সাহস ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মনির্ভরশীলতা ও কর্মপ্রাণতা, এবং তৎসঙ্গে উদ্ভাবনী কল্পনা ও চিত্তের প্রফুল্লতা—একটি সদানন্দ ভাব—ইহাদের কতকগুলি লক্ষণীয় সদ্‌গুণ, এবং সরল-বিশ্বাস-প্রবণতা (ভাবুকতা বা ভাবপ্রবণতা নহে), পশু ও মানুষ উভয় সম্পর্কে নিষ্ঠুরতা (কখনও-কখনও বর্বরের ন্যায় নিষ্ঠুরতা)—ইহাদের দুইটি অবগুণ বলিয়া মনে হয়। মোটের উপর, মোঙ্গোল-জাতীয় মানুষ (এক চীনদেশের কথা আলাহিদা) বেশির ভাগ হইতেছে কৃতকর্মা, ভাবুক বা চিন্তাশীল নহে; জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে ইহাদের প্রণিধান ভাসা-ভাসা বা উপর-উপর, গভীর নহে; ইহারা তথ্য-প্রিয়, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নহে। যখন পূর্ব-ভারতের ইতিহাসে, সম্ভবতঃ

এখন হইতে তিন সহস্র বৎসর পূর্বে এই মোঙ্গোল-জাতির মানুষ আসিয়া দেখা দিল (ভারতে ইহাদের আগমন সম্ভবতঃ ইহারও পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল), এবং মিশ্র হিন্দু বা ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই এই ইতিহাসে ইহাদের চরিত্রের ছাপ পড়িল। একটি জিনিস উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গ এবং আসাম সম্বন্ধে দেখা যায়—বিদেশাগত তুর্কী এবং উত্তর-ভারতীয় মুসলমান আক্রমণকারীকে এই অঞ্চলের মোঙ্গোল-জাতীয় লোকেরা যতটা বাধা দিয়াছে, ভারতের অন্য বহু অঞ্চলের মানুষেরা ততটা বা তার চেয়ে বেশি বাধা হয়-তো দিয়াছে; কিন্তু অন্য অঞ্চলের লোকেরা এই আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। দিল্লী হইতে বিজাপুর যত দূর, কোচবিহার, গৌহাটি বা ত্রিপুরা তাহা অপেক্ষা বেশি দূর নহে; এবং মুসলমান রাজশক্তির কেন্দ্র বাঙ্গালা দেশের গৌড় ও ঢাকা নগর হইতে এই প্রদেশগুলি খুব দূরেও নহে। ইহাতে অবশ্য উত্তর- ও দক্ষিণ-ভারতের পাঞ্জাবী হিন্দু, রাজপুত ও অন্য লড়াকিয়া সম্প্রদায়সমূহ, মারাঠা তেলুগু ও কানাড়ীদের শৌর্য্যের অমর্য্যাদা নাই। বঙ্গ-দেশের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের ব্যাহত করিতে—দেশের ভৌগোলিক সমাবেশ এবং দেশের জলবায়ু—এই দুইটি নিঃসন্দেহে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল; বিদেশী শত্রু কর্তৃক রুষদেশ আক্রমণের সময়ে একজন রুষ-সম্রাট্ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন—রুষদেশের দুইটি অজেয় সেনাপতি আছে, সেনাপতি জানুয়ারি ও সেনাপতি ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ রুষের ভীষণ শীত—সেইরূপ মন্তব্য বাঙ্গালা ও আসাম সম্বন্ধেও করা যায়; আমাদের এই পূর্ব অঞ্চলের দেশের দুইটি অজেয় সেনাপতি—আষাঢ় ও শ্রাবণ, বর্ষার দুই মাস—বহুবার বিদেশী আক্রমণকারীদের ব্যর্থ করিয়াছে। আকবর বাদশাহের সময়েই কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় পূর্ব-ভারতে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিরাট্ স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। সমগ্র আসাম কখনও তুর্কী বা ভারতীয় মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয় নাই। শ্রীহট্ট বিজিত হইলেও, পার্বত্য-ত্রিপুরা বরাবর-ই স্বাধীন ছিল; বার-বার আক্রমণেও আসাম এবং ত্রিপুরা আত্মরক্ষা করিয়াছে, কৌশল ও শৌর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই বিদেশীদের দূরীভূত করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, মোগলদের হাতে উত্তর-বঙ্গের জয় ছিল নাম-মাত্র, তাহাদের অধিকার ছিল পরোক্ষ, প্রায়-স্বাধীন জমিদারদের মারফৎ তাহারা নিজেদের ক্ষমতা পরিচালনা

করিবার চেষ্টা করিত। উত্তর-বঙ্গে "কম্বোজ" জাতির রাজারা এক সময়ে, তুর্কীদের আগমনের পূর্বে, হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, খ্রীষ্টীয় দশম শতকে; অনুমান হয়, এই "কম্বোজ" জাতি "কওঁচ" বা "কোঁচ" অথবা "কোচ" ছাড়া আর কিছু-ই নহে—এই কোচেরা ভোট-চীন জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত বিরাট্ "বড়" বা "বোড়ো"-ভাষী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল; এখন ইহারা বঙ্গভাষী ও হিন্দু (অথবা মুসলমান) হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১১৯৮ সালে বখ্ত্যার খল্জীর অধীনে তুর্কীরা প্রথম আসাম আক্রমণ করে—উত্তর-বঙ্গের ও আসামের ভোট-চীন বোড়ো-জাতীয় কোচ ও মেচগণের সহিত তুর্কীদের সংঘর্ষ হয়; এই কোচ ও মেচগণ চেহারায় মোঙ্গোল জাতির অন্য শাখা তুর্কীদেরই মতো ছিল, একথা মুসলমান ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রথম আক্রমণে বখ্ত্যারের তুর্কেরা পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া, কোনও ক্রমে বিরাট্ বাহিনীর অল্পসংখ্যক লোক লইয়া ফিরিয়া আসে। এই ঘটনার পরে প্রায় দশ-বারো বার উত্তর-বঙ্গ ও আসাম বাঙ্গালার মুসলমান সুলতান কর্তৃক ও পরে মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ও ঔরঙ্গজেব কর্তৃক আক্রান্ত হয়—তুর্কীরা, এবং পরে বাঙ্গালী সেনা ও রাজপুত সেনা লইয়া মোগল মুসলমানেরা দুই-একবার আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে ১৬৮১ সালে আসামের অহম-রাজ স্বর্গদেব গদাধর সিংহ (চু-পাৎ-ফা) কর্তৃক এই বিদেশীরা বিতাড়িত হয়। ত্রিপুরার ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে, ত্রিপুরা-রাজগণ (বিশেষ করিয়া পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে মহারাজ ধন্যমাণিক্য) একদিকে আরাকানের মগদের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে বাঙ্গালার মুসলমান সুলতান ও মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথের বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে সগর্ব উক্তি—"এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে"—ত্রিপুরার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের কুকি-জাতীয় সেনাপতি রায় চয়চাগ অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশল দেখাইয়া ত্রিপুরা-আক্রমণকারী বাঙ্গালার মুসলমান সুলতান হোসেন শাহের সেনাকে পরাজিত করিয়া দূর করিয়া দেন। আকবরের সময়ে ত্রিপুরার মহারাজা বিজয়মাণিক্য (১৫৩৫-১৫৮৩) শ্রীহট্ট জয় করেন—শ্রীহট্ট মুসলমান বাঙ্গালার অধীন ছিল,—খাসিয়াদের জৈন্তিয়া রাজ্যও জয় করেন, এবং বাঙ্গালার শেষ পাঠান সুলতানের সঙ্গেও ইনি যুদ্ধ করেন। গৃহবিবাদের ফলে ত্রিপুরার রাজারা

দুর্বল হইয়া পড়েন, কিন্তু পার্বত্য-ত্রিপুরা বরাবর-ই বিদেশীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে, উত্তর-বঙ্গে রাজা বা জমিদার 'কাঁশ' অর্থাৎ কংশ, দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাজবংশকে উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হিন্দু রাজত্বের পত্তন করেন ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তুর্কী-বিজয়ের পরে উত্তর-ভারতের আর কোনও হিন্দু রাজা যাহা করিতে সাহস করেন নাই, ইনি তাহা করিয়াছিলেন—নিজের নামে ইনি হিন্দুভাবের মুদ্রা বাহির করেন। ইঁহার নামে কতকগুলি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে ; মুদ্রাগুলির একদিকে বাঙ্গালা অক্ষরে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য-স্থাপনের পরে গৃহীত ইঁহার নাম পাওয়া যায়—"শ্রীশ্রীদনুজমর্দনদেবস্য"—ও অন্য দিকে "শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণস্য" ; তারিখ শকাব্দায় দেওয়া, এবং টাঁকশালের নামও দেওয়া আছে "পাণ্ডুনগর" বা "পাণ্ডুয়া", "সপ্তগ্রাম" বা "সাতগাঁ" বা "চট্টগ্রাম"। এই-সব টাঁকশালের নাম হইতে বুঝা যায় যে, সারা বাঙ্গালা জুড়িয়া ইঁহার ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। ইঁহার পরে সম্ভবতঃ ইঁহার পুত্র মহেন্দ্রদেব রাজা হন, মহেন্দ্রদেবের-ও অনুরূপ রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে ইঁহার এই পুত্র, অথবা হয়-তো আর এক পুত্র, মুসলমান হইয়া জালালুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। নূতন করিয়া পুনঃস্থাপিত হিন্দু রাজ্যের এই ভাবে অবসান হয়। কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে, বিদেশী রাজার শাসন হইতে এই মুক্তিলাভের ব্যাপার উত্তর-বঙ্গেই ঘটিয়াছিল, এবং হয়-তো এই স্বাধীনতার যুদ্ধে উত্তর-বঙ্গের দুর্ধর্ষ ও শক্তিমান্ ভোট-চীন বংশসম্ভূত হিন্দু প্রজারই কৃতিত্ব ছিল, কোচ ও অন্য বোড়ো-জাতীয় পরাক্রান্ত পাইক বা পদাতিক সৈন্য বর্মাবৃত অশ্বারোহী তুর্কী মুসলমান সেনাকে পরাজিত করিয়াছিল। দনুজমর্দনদেবের পুরা পরিচয় ঠিকমতো জানা যায় নাই ; ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথবা কায়স্থ ছিলেন, এইরূপ বিভিন্ন মত আছে। হয়-তো ইনি আদৌ উত্তরবঙ্গের হিন্দু কোচ বংশীয়-ই ছিলেন—পরবর্তী কালের কোচ রাজাদের মতো। এ সম্বন্ধে আর-ও অনুসন্ধান আবশ্যক।

ভোট-চীন মোঙ্গোল-জাতীয় যে-সমস্ত বিভিন্ন গণ পূর্ব-ভারতে (আসাম ও বাঙ্গালায়) উপনিবিষ্ট হয়, তাহারা বেশির ভাগ ছিল বোড়ো শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর বা উপজাতির। সম্ভবতঃ ইহাদের অভিজাত-সম্প্রদায়, হিন্দু ধর্মের অনুপ্রাণনায়, খ্রীষ্টীয় দশম শতকে, তুর্কীদের আগমনের পূর্বে, উত্তর-বঙ্গে (বরেন্দ্র ভূমিতে) "কম্বোজ" রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহাদের রাজারা-ই খ্রীষ্টীয় বারোর-

তেরোর শতকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজত্ব করিতেন এবং তখন তুর্কীদের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়াছিলেন। উত্তর-বঙ্গের কোচ ('নারায়ণী') রাজবংশ, ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশ, কাছাড়ের হিড়িম্বা রাজবংশ, পূর্ব-আসামের চুটিয়া রাজবংশ —ইহাদের সকলেরই প্রজা ও যোদ্ধা ছিল বেশির ভাগ বোড়োদের লইয়া। ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ হইতে পাতকই পর্বত অতিক্রম করিয়া পূর্ব আসামে অসম বা অহম জাতির লোকেরা, তাহাদের রাজা ও অভিজাত বংশের নেতৃত্বে আসিয়া, দেশের বোড়ো ও অন্য মিশ্র দাক্ষিণ ও দ্রাবিড়-জাতীয় হিন্দু বা হিন্দু-ভাবাপন্ন লোকেদের জয় করে, এবং পূর্ব-আসামে অহম রাজ্য স্থাপন করে। পরে ধীরে-ধীরে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অহমদের অধিকার বিস্তৃত হয়—অহম বা অসমদের নাম হইতেই সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নাম হয় "আসাম"। এই অহমরা ছিল ভোট-চীনদের Dai দৈ বা Thai শাখার; ইহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত জাতি হইতেছে শ্যামের থাই বা শ্যামী, ও ব্রহ্মের শান Shan এবং ইন্দোচীনের Lao জাতি। অহমরা বিশেষ সাহসী ও সৈনিকগুণযুক্ত জাতি ছিল, এবং তাহাদের আগমনে আসাম ও পূর্ব-ভারতের ক্ষাত্রশক্তির বিশেষ প্রাবল্য ঘটে। অহমরা নিজেদের দেশ উত্তর-ব্রহ্মে ও শ্যামে হিন্দু সভ্যতার সহিত সংস্পর্শে আসে; কম্বোজীয় বা খ্মের ও শ্যামী জাতির নিকট হইতে ইহারা ভারতীয় লিপিবিদ্যার সহিত পরিচিত হয়; এবং সম্ভবতঃ আসামে আসিয়া ব্রাহ্মণদের সহায়তায় হিন্দু দেবতাদের সঙ্গে তাহাদের নিজেদের দেবতাদের একটা সমীকরণ করে—যেমন "চাও-ফা" অর্থাৎ স্বর্গদেব বা ইন্দ্র, "জাচি-ফা" অর্থাৎ "সরস্বতী, "লাউথ" অর্থাৎ বিশ্বকর্মা, "লুঙ্-চাই-নেৎ" অর্থাৎ বায়ু, "খান্-খাম্-ফা-ফা" অর্থাৎ আদ্যাশক্তি, "খুন্-তুন্-ফা" অর্থাৎ চন্দ্রদেব, "খন্-বান্‌ফা" অর্থাৎ সূর্য্যদেব, ইত্যাদি। অহম রাজারা তাঁহাদের হিন্দু প্রজার কাছে "ইন্দ্রবংশের রাজা" বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু ইহাদের স্বকীয় পুরাণকথা, নিজেদের ধর্মানুষ্ঠান পূজা-পদ্ধতি, "দেওধাই" নামে নিজেদের পুরোহিত-সম্প্রদায়, নিজেদের কালগণনা-রীতি, নিজেদের ভাষা ও বর্ণমালা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া—১২২৮ হইতে আনুমানিক ১৬৫০-১৭০০ পর্য্যন্ত—বলবৎ রাখেন। ইহাদের আচরণ ও সামাজিক রীতিনীতি হিন্দু ধর্ম গ্রহণের পরেও কোনও-কোনও বিষয়ে লক্ষণীয় রূপে অহিন্দুই থাকিয়া যায়। রাজাদের নাম অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত অহম ভাষায় হইত; যেমন "চুকাফা, তেও-থম্-থি, চু-ডাঙ্-ফা, চু-গিম্-ফা",

ইত্যাদি। ১৪৯৭ হইতে রাজাদের অসমিয়া ভাষায় একটা করিয়া উপনাম হইতে থাকে, যেমন "খোরা-রজা, ভগা-রজা, নরিয়া-রজা, ল'রা-রজা", ইত্যাদি। অহম রাজ চু-তাম্‌-লা (১৬৫৪-১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম উপরন্তু সংস্কৃত নাম গ্রহণের রীতি প্রবর্তিত করেন—তিনি "জয়ধ্বজ সিংহ" নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার পরে মাত্র পাঁচ জন অল্প দিনের রাজা ভিন্ন, সমস্ত অহম-রাজগণ সংস্কৃত নামেই সুপরিচিত হন। চু-পাৎ-ফা বা গদাধর সিংহ হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখান, কিন্তু তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। গদাধর সিংহ আসামে মোগল অধিকারের বিলোপ-সাধন করেন। গদাধর সিংহের পুত্র চু-খ্রুং-ফা বা রুদ্রসিংহ আসাম অঞ্চলে মোগলের ক্ষমতার অবসান করেন, এবং করতোয়া নদী পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-বঙ্গ, আসামের সীমান্ত বলিয়া দাবি করিয়া বাঙ্গালার মোগল সুবেদারের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন —ঢাকার উদ্দেশে অভিযান করিবার সময়ে পথে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অহমদের পূর্বে আসামে ষোড়শ শতকে বিশেষ প্রবল হন কোচ-রাজা মল্লদেব নরনারায়ণ সিংহ। ইঁহার ভ্রাতা ও ইনি অহমদের পরাজয় করেন, কাছাড় ও জৈন্তিয়া রাজ্য জয় করেন, এবং এমন কি ত্রিপুরা-ও জয় করেন বলিয়া কথিত হয়—যদিও ত্রিপুরার ইতিহাসে এ কথা নাই। পাথরে-তৈয়ারী কামাখ্যার বর্তমান দেবীর মন্দির ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের (চিলা রায়ের) যত্নে নির্মিত হয়। হিন্দু সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত বিদ্যা নিজ রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে সুপতিষ্ঠিত করিতে কোচরাজগণ বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু ইহা ব্যতীত, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বপ্ন বা দূর-দৃষ্টির পরিচয় ইঁহারা কেহ দেন নাই। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার বিরাট্ রাজ্য (সাম্রাজ্য বলাও চলে) গৃহবিবাদের ফলে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (শুক্লধ্বজের পুত্র) রঘুদেব নারায়ণের মধ্যে বিভক্ত হয়, ইহার পরে কোচ জাতির রাজ্যশ্রী আর কখনও পূর্ব গৌরবে উন্নীত হইতে পারে নাই।

কোচবিহারের, আসামের (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার), কাছাড়ের, জৈন্তিয়া রাজাদের, শ্রীহট্টের রাজাদের এবং ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস, বাঙ্গালীর কাছে—বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙ্গালীর কাছে—গৌরববোধের সহিত আলোচনার বিষয়। বাঙ্গালার মধ্যযুগের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত বলিয়া, আসামের ইতিহাসও বাঙ্গালী ছেলেদের পাঠ্য হওয়া উচিত; আর কোচবিহার,

কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার ইতিহাস তো বাঙ্গালার ইতিহাসেরই অংশ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে প্রাথমিক ও সহজ-লভ্য বই তেমন নাই। তবে পরলোকগত রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দুই খণ্ডে প্রকাশিত বাঙ্গালার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ "বৃহৎ বঙ্গ" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গাব্দ ১৩৪২) পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষের দিকে অতি মনোজ্ঞ-ভাবে লিখিত এই ইতিহাসের সার-সংকলন পাওয়া যাইবে। কোচবিহারের ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য দুইখানি বই আছে, দুই-ই কোচবিহার সরকার হইতে প্রকাশিত—একখানি হইতেছে, হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি-এল মহাশয় সংকলিত The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlements, Cooch Behar, 1903 (৭০০ পৃষ্ঠারও অধিক বড়ো বই, ইহার ইতিহাস-অংশ, পৃঃ ২০১-২৮৭, এই অংশে মহারাজ নরনারায়ণের সাম্রাজ্যের মানচিত্র লক্ষণীয়); এবং অন্যখানি খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহ্মদ সাহেব কর্তৃক সংকলিত "কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড," কোচবিহার রাজশক ৪২৬=১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (৪৫৫+ ৩পৃষ্ঠা)। চৌধুরী আমানতউল্লা খাঁ সাহেবের পুস্তকখানি ইতিহাসের দিক্ হইতে বিশেষ উপযোগী এবং সুলিখিত। ত্রিপুরার ইতিহাসের মুখ্য আধার হইতেছে বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত "রাজমালা" গ্রন্থ—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভ হইতে ধারাবাহিক-ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পুস্তক লিখিত হয়। এই পুস্তকের ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। রাজমালার আধারে বহু পূর্বে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ত্রিপুরার ইতিহাস "রাজমালা" নাম দিয়া প্রণয়ন করেন। সমগ্র রাজমালা পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া, ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে টীকাটিপ্পনীর সহিত এই গ্রন্থের ছয় "লহর"-এর মধ্যে প্রথম তিন লহর, এক অতি-সৌষ্ঠবময় রাজসংস্করণে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। অবশিষ্ট অংশ তিনি প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্করণের ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না।

অনেক ক্ষেত্রে একদেশদর্শী পক্ষপাতদুষ্ট ফারসী ইতিহাসের বাহিরে, পূর্ব-ভারতের ইতিহাস আলোচনার বহু মূল্যবান্ সাধন হইতেছে আসামের

"বুরঞ্জী" বা ইতিহাস-সাহিত্য। অহম-রাজারা ব্রহ্মদেশ হইতে তাঁহাদের ভাষায় ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি আসাম-দেশে প্রবর্তন করেন। এই ইতিহাসকে অহম-ভাষায় "বু-রন্-জী" বলে। অহম-ভাষার এই "বু-রন্-জী" শব্দ ("বু"= পুরানো বা না-জানা কথা ; "রন্"=জানা ; "জী"=ভাণ্ডার) 'ইতিহাস' অর্থে অসমিয়াতে এখন সর্বজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছে। ভারতের আর কোনও ভাষায় এই প্রকার ঐতিহাসিক সাহিত্য নাই ; এ বিষয়ে অসমিয়া ভাষা একক। সন তারিখ দেওয়া রীতিমতো ইতিহাস রচনার রীতি আসামে অহম রাজারাই প্রবর্তন করেন। অহম-ভাষায় একটা বেশ বড়ো বুরঞ্জী-সাহিত্য আছে ; কিন্তু অহম-ভাষা বিগত উনবিংশ শতকের মধ্যেই প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়— অসমিয়া-ভাষীদের মধ্যে বাস করিতে-করিতে এই ভাষার অস্তিত্ব রাখা অহমদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই ; অহম "দেওধাই" বা পুরোহিতেরা এই ভাষা কিছু-কিছু জানিতেন। কিন্তু এখন অহম-জানা লোক আর নাই বলিলেও চলে। ইংরেজ ইতিহাসানুরাগীদের চেষ্টায় দুই-একখানি অহম-ভাষার বুরঞ্জী ইংরেজি অনুবাদ সমেত অহম অক্ষরে মূলের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ অহম-ভাষাতেই বুরঞ্জী বা ইতিহাস লেখা হইত। পরে, অহম-রাজদরবারে ও রাজবংশে আর্য্য অসমিয়া ভাষার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে, অসমিয়া ভাষাতেও বুরঞ্জী লিখিত হইতে থাকে। অসমিয়া ভাষায় রচিত অনেকগুলি বুরঞ্জী পাওয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়, অসমিয়া ভাষাতে রচিত বুরঞ্জীগুলি-ও আসাম সরকারের "ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা বিভাগ"-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আসামের সুবিখ্যাত কবি ও সুসাহিত্যিক, গৌহাটীর কটন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূঞা এম-এ, বি-এল (কলিকাতা), পি-এচ-ডি (লণ্ডন), রায় বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া (ও দুই-এক ক্ষেত্রে ইংরেজিতে অনূদিত হইয়া) প্রকাশিত হইতেছে। আসামের অহম-রাজাদের ইতিহাস-সম্পর্কে, তাঁহাদের রাজ্যশাসন, সামাজিক ও অন্য রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এই বুরঞ্জীগুলি একমাত্র প্রামাণিক পুস্তক তো বটেই ; এতদ্ভিন্ন, কোচবিহারের রাজাদের সম্বন্ধে, কাছাড়ী ও জৈন্তিয়া রাজাদের সম্বন্ধে, এবং এমন কি ত্রিপুরার রাজাদের সম্বন্ধেও, অন্যত্র অপ্রাপ্য নানা তথ্য ও ইতিহাসের কথা এই-সকল বুরঞ্জী হইতে পাওয়া যায়। ইংরেজি সংক্ষিপ্তসার সমেত এগুলির প্রকাশ দ্বারা অধ্যাপক সূর্য্যকুমার ভূঞা মহাশয় ও অন্য অসমিয়া পণ্ডিতগণ পূর্ব-ভারতের

ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনার পক্ষে অমূল্য উপাদান আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন; এই জন্য তিনি ও তাঁহার সহকর্মিগণ ভারতের ইতিহাসের আলোচক প্রত্যেক সুধীজনের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

অধ্যাপক ভূঞা ১৯৩৮ সালে "ত্রিপুরা বুরঞ্জী" নামে একখানি অতি মূল্যবান্ বুরঞ্জী-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালী পাঠকদের দৃষ্টি এই পুস্তকের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট করেন আমার ভূতপূর্ব ছাত্র, গৌহাটীর কটন কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ। ইনি ২৩এ ভাদ্র ১৩৫২ তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকা"-তে এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন; এবং যতীন-বাবুর মুখে শুনিয়া, আমি "ত্রিপুরা বুরঞ্জী"-র গুরুত্ব প্রথম উপলব্ধি করি। পরে বিগত ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে শিলঙ্-এ "নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন"-এ যোগ দিবার কালে. গৌহাটীতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূঞার সৌজন্যে "ত্রিপুরা বুরঞ্জী" এক খণ্ড ও অন্য বুরঞ্জী গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া এই বই পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করি। সূর্য্যকুমার-বাবু স্বকীয় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই বইয়ের বৈশিষ্ট্য ধরিয়াছেন, এবং ভূমিকায় এই বই সম্বন্ধে নিজ বিচার অতি সমীচীন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। "ত্রিপুরা বুরঞ্জী"-র লিখনকাল ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ; সরল ভাবে লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হিসাবে বইখানি অপূর্ব। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে অহম এবং ত্রিপুরা রাজ-দরবারের বর্ণনা-চিত্রের মাধ্যমে, এই পূর্ব-ভারতের দুই হিন্দু রাজবংশের রীতি, নীতি, তথা ইহাদের বাহ্য সংস্কৃতির সূক্ষ্ম আলেখ্য-রচনায় ইহা অমূল্য, এবং সম্পূর্ণ অনপেক্ষিত। এতদ্ভিন্ন, কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার বস্তুতান্ত্রিক ও নির্বৈয়ক্তিক বর্ণনায়, "ত্রিপুরা বুরঞ্জী"র লেখকদ্বয়কে আন্তরিক সাধুবাদ না দিয়া পারা যায় না; কটকী রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগীকে একাধারে উচ্চকোটির সাহিত্যিকের ও ঐতিহাসিকের, এবং চক্ষুষ্মান্ দর্শকের ও বর্ণনা-কুশল লিপিকরের-ও সম্মান দিতে হয়।

"ত্রিপুরা বুরঞ্জী"তে নিতান্ত অনপেক্ষিত ভাবে আসামের অহম-রাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের ভাবনা ও সুদূর-প্রসারী দেশাত্মবোধের ও সংস্কৃতি-রক্ষামূলক প্রচেষ্টার পরিচয় আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। একটি প্রাচীন গ্রীক প্রবাদ আছে—ইলিয়াড মহাকাব্যের বীর রাজা Agamemnōn আগামেমনোন্-এর পূর্বেও শূর-বীর অনেক হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু

তাঁহাদের বীরত্ব-কথাকে অমর করিয়া রাখিবার জন্য Homer হোমের-এর ন্যায় কবির অভাব ছিল, সেই জন্য তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির অতলে চলিয়া গিয়াছে। রুদ্রসিংহ স্বর্গদেবের ভাবের ভাবুক হয়-তো আরও অনেক ছিলেন—কিন্তু রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের মতো কেহ তাহার কোনও পরিচয় রাখিয়া যায় নাই—রাখিয়া গেলেও, হয়-তো তাহা মহাকালের করাল গ্রাসের মধ্যে গিয়া অবলুপ্ত হইয়াছে। রুদ্রসিংহ স্বর্গদেব যাহা চাহিয়াছিলেন—তাহা হয় নাই; মহাকালের বিধান, এখন তাহা লইয়া আফ্‌শোশ করিবার কিছু নাই। খ্রীষ্টীয় ষোলো, সতেরো ও আঠারোর শতকে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, বিরোধ ও মিলনের পথে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মিলিত সৃষ্টি আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা সৃজ্যমান। ভারতের ভিতর এই দুই সংস্কৃতিব মধ্যে কোথাও বৈরিভাব, কোথাও-বা মৈত্রী দৃষ্ট হয়; এবং বহু স্থলে বৈর ও মিত্রতা পাশাপাশিই অবস্থান করিতেছিল, এখনও যেমন করিতেছে। মুসলমানের দ্বারা পূর্ণভাবে বিজিত হয় নাই বলিয়া, এবং মোগল রাজশক্তি তখনও বিজীগিষু বলিয়া, আসামের মানুষের কাছে, ত্রিপুরার মানুষের কাছে, মুসলমানের সংস্কৃতি ছিল—স্বাধীনতা-নাশক শত্রুর দুর্বোধ্য বা অবোধ্য ব্যাপার ও মনোভাব। এখানে কালধর্ম এবং পারিপার্শ্বিক বিচার করিতে হইবে। ইস্‌লাম সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ধ্বংসমূলক আগ্রহে ক্রিয়াশীল ইস্‌লাম সম্বন্ধে, সোমনাথের পুরোহিতদের, পৃথ্বীরাজ চৌহানের, বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা বুক্ক রায়ের ও মহারাজ কৃষ্ণদেব রায়ের, মহারাণা সংগ্রাম সিংহের, মহারাণা প্রতাপ সিংহের, মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর, শিখ নেতা বন্দা বাহাদুরের, শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের যে মনোভাব থাকা স্বাভাবিক, সম্রাট্ আকবরের পার্ষদ বীরবলের ও রাজা মানসিংহের নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ও রাজা রামমোহন রায়ের, মুসলমান-যুগের সূফী মতের সহিত পরিচিত ফারসী-পড়া হিন্দু শিক্ষিত জনের, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো সাধকের, এবং মুসলমান সংস্কৃতি ও চিন্তার সহিত সুপরিচিত আধুনিক কালের সহৃদয় শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে, সে মনোভাবটি ঠিক পাওয়া যাইবে না। সেইরূপ হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে সাধারণ অশিক্ষিত তুর্কী সৈনিকের যে ধারণা বা বোধ বা বিচার ছিল, সুলতান মহ্‌মুদ গজনবীর যে ধারণা ছিল, ঔরঙ্গজেব বাদশাহের ঐতিহাসিক বদায়ূনী প্রভৃতির যে ধারণা ছিল এবং এখনও আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক দল-বিশেষের

কোনও-কোনও মুসলমান নেতার মনে যে ধারণা দেখা যায়, সে ধারণা বহু সূফী সাধকের নহে, অল্-বীরূনী, আবুল ফজল ও ফয়জীর মতো পণ্ডিতের নহে, আকবর বাদশাহ্ ও রাজকুমার দারা শেকোহের নহে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও আধুনিক কালের শত-শত শিক্ষিত মুসলমানের নহে। ইস্‌লামের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যাহারা নরহত্যা ও লুণ্ঠন করে, তাহারা, এবং ইস্‌লামের রহস্যবাদের মধ্যে নিহিত সংস্কৃতি, ইস্‌লামের নাগরিকতা—এই দুইটি যে বিভিন্ন জগতের বস্তু, তাহা উভয় সম্প্রদায়ের সুধীবৃন্দ জানেন। কিন্তু তথাপি, ভাবশুদ্ধির সহিত বিচার করিয়া দেখিলে, যাহাদের বিদেশীয় আততায়ী এবং ধর্মদ্বেষী বলিয়া মনে করি, যাহারা আমার দেশকে ও আমার দেশের মানুষকে নিজের অধীনে আনিয়া আমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়-ই ধ্বংস করিতে চাহে, সেইরূপ শত্রুর সহিত সমস্ত শক্তি দিয়া লড়িতে যে চেষ্টা করে, এই অত্যাবশ্যক শত্রু-দূরীকরণে যে দৈহিক শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করিতে চাহে, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্র-ই তাহাকে সাধুবাদ দিবেন। রাজা স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ সেই-রূপ নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে পূর্ণরূপে সাধুবাদ পাইবার যোগ্য; এবং অনুরূপ অবস্থায় যদি কেহ পড়ে, তিনি তাহারও অনুকরণের পাত্র। নিজের ধর্ম ও স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও সমাজ—সংক্ষেপে, নিজের "চোটী বেটী রোটী" শিখা বা ধর্ম অর্থাৎ মেয়েদের সম্মান, এবং অর্থ নৈতিক জীবন—যে হিন্দু, অথবা অন্য ধর্মের মানুষ, বিধর্মী ধ্বংসকামীর হাত হইতে বাঁচাইতে চাহে, শিবাজী ও রুদ্রসিংহের মতো বীর তাহার নমস্য, তাহার অনুকরণীয়।

মহারাজ রুদ্রসিংহের পিতা স্বর্গদেব গদাধরসিংহ বহু দুঃখের মধ্য দিয়া জীবনের এক অংশ অতিবাহিত করেন। ইনি রাজা হইবার পূর্বে গদাপাণি নামে পরিচিত অহম-রাজবংশের এক কুমার ছিলেন; রাজসিংহাসনে ইঁহারও দাবি ছিল। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে, শক্তি-পরিচালনা লইয়া ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল। বিভিন্ন দলের প্রধানরা যাহাকে খুশী রাজা করিতেছিলেন, এবং রাজার নামে নিজেদেরই অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতেছিলেন। এইরূপে ১৬৪৯ হইতে ১৬৭৯ পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরের মধ্যে ১১ জন রাজা আসামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে দীর্ঘতম রাজত্ব হইতেছে রাজা জয়ধ্বজ সিংহের (৯ বৎসর, ১৬৫৪-১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ),

ও রাজা চক্রধ্বজ সিংহের (৭ বৎসর, ১৬৬৩-১৬৭০)। এই ১১ জনের শেষ রাজা ছিলেন চু-লিক্-ফা ওরফে "ল'রা রজা" বা "শিশু রাজা"। রাজবংশীয় গদাপাণি পাছে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, এই আশঙ্কায় অত্যাচারী মন্ত্রী নিমাতি বর-ফুকন ইহাকে ধরিয়া বধ করিবার সংকল্প করেন। গদাপাণি, লাই ও লেচাই নামে নিজ দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, নাগা-পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লয়েন, এবং পরে নানা স্থানে তাঁহাকে আশ্রয়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। তাঁহার পত্নী সাধ্বী জয়মতী কুয়ঁরী ধরা পড়েন। স্বামীর পলায়নস্থান তাঁহার শত্রুদের জানাইয়া দিবার জন্য জয়মতী কুয়াঁরীর উপর নানা নিষ্ঠুর অত্যাচার চলে। তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। গদাপাণি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া বন্দী ও মৃতপ্রায় স্ত্রীর সঙ্গে গিয়া দেখা করেন, কিন্তু পাছে স্বামী ধরা পড়েন, এই আশঙ্কায় জয়মতী কুয়ঁরী যেন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এই ভাব প্রকাশ করেন, ও চোখের ইঙ্গিতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে স্বামীকে অনুরোধ করেন। গদাপাণি নিরুপায় হইয়া স্ত্রীর অনুরোধ পালন করেন, এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জয়মতীর মৃত্যু হয়। দেশের মধ্যে অরাজকতা; ওদিকে বাহিরে মোগলদের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। তখন নিমাতি বর-ফুকনের বিরুদ্ধে অন্য কয়েক জন সেনাপতি ও উচ্চবংশীয় রাজপুরুষ ষড়যন্ত্র করিয়া, গদাপাণিকে রাজা নির্বাচিত করিলেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গদাপাণি, "চু-পাৎ-ফা" বা "স্বর্গদেব গদাধরসিংহ" নাম লইয়া, "ল'রা-রজা"র স্থানে রাজা হইলেন।

গদাধরসিংহ ও তৎপুত্র রুদ্রসিংহ (পূর্বনাম ছিল 'লাই'), ইঁহাদের দুই জনের আমলে অহম রাজশক্তি সর্বোচ্চ শিখরে উত্থিত হয়। গদাধরসিংহ যে অতি যোগ্য পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজত্বের সব কথা আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। দেশের ভিতরে নানা স্বার্থপরতা ও নীচতা, বিরূপ ভাব ও ষড়্‌যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে তাঁহাকে লড়িতে হয়। পার্বত্য জাতি মিরি এবং নাগাদিগের বিরুদ্ধে (তাহারা পাহাড় হইতে নামিয়া সমতল ভূমিতে অসমিয়া প্রজার উপর অত্যাচার করাতে) গদাধরসিংহকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পনেরো-বৎসর-ব্যাপী রাজত্বের সব-চেয়ে গৌরবময় কৃতিত্ব হইতেছে এই যে, তিনি স্বদেশের যে অংশ মোগলদিগের অধীনে ছিল—গৌহাটী নগর ও কামরূপ জেলা—তাহা অধিকার করিয়া লয়েন; গৌহাটীতে মোগলদের

ভীষণ পরাজয় ঘটে, এবং মোগল সেনার প্রচুর দ্রব্য-সম্ভার—সোনা, রূপা, হাতী, ঘোড়া, গোরু, মহিষ, নানা আকারের কামান ও বন্দুক, তরবারি বর্শা ও অন্য অস্ত্র,—অহমদের হস্তগত হয়। ১৬৮১ সালে এই বিজয়ের পরে, আসাম আর কখনও মুসলমান সেনার দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই।

গদাধরসিংহ হিন্দু নাম লইলেও, পূরাপুরি হিন্দু হয়েন নাই—কতকটা আধা-হিন্দু-ই ছিলেন। তিনি যোদ্ধা ছিলেন, এবং প্রকৃতিতে আদিম অহম-ই ছিলেন। অসাধারণ শক্তির মানুষ ছিলেন তিনি। পুরাতন বুরঞ্জী মতে, আসামের ঐতিহাসিক Sir Edward Gait স্যর এড্ওয়ার্ড গেট লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রচুর ভোজন করিতেন, এবং মোটা নূতন চাউলের ভাত ও অগ্নিদগ্ধ বাছুরের মাংস তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। তাঁহার ভীষণ বিদ্বেষ ছিল আসামের বৈষ্ণব মহন্তদিগের উপরে। এই মহন্তগণ জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, রাজার তাহা পছন্দ হয় নাই। ব্যক্তিগত ব্যাপারে, রাজা হইবার পূর্বে, কতকগুলি মহন্তের আনুকূল্য না পাওয়াতে—গদাধরসিংহের ক্রোধের কারণ ছিল। বৈষ্ণব মহন্তগণের শিক্ষায় নিরামিষাশী হইয়া পড়িলে, তাঁহার প্রজাগণ সৈন্য-হিসাবে অনুপযুক্ত হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কাও তাঁহার ছিল। কিন্তু স্বদেশ আসামের পক্ষে উপকারক এবং উপযোগী কিছু বাহির হইতে পাইলেই তিনি গ্রহণ করিতেন—বাঙ্গালা ও কোচবিহারে প্রচলিত জমির মাপের ও খাজানা নির্ধারণের পদ্ধতি তাঁহার নিজ রাজ্যেও তিনি প্রবর্তিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, অহম-রীতি অনুসারে, অহমদের প্রাচীন রাজধানী চরাই-দেওতে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়, এবং প্রত্যহ তাঁহার সমাধিতে শূকর, মুরগি, মাছ ও মদের নৈবেদ্য তাঁহার আত্মার উদ্দেশে অর্পিত হইবার ব্যবস্থা হয়। শ্রাদ্ধ-উপলক্ষ্যে অহমদিগকে প্রচুর পরিমাণে শূকর ও মহিষ মাংস খাওয়ানো হয়।

"পিতা গদার মহত্ত্ব, মাতা জয়ার সতীত্ব,
পুত্র রুদ্রর বীরত্ব, তিন অসমর বিশেষত্ব।"

—এইরূপ একটি উক্তি আসামে প্রচলিত আছে। ইহা হইতে অসমিয়া জনগণের কাছে পিতা মাতা ও পুত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

গদাধরসিংহের পুত্র, ইঁহার অহম নাম "চু-খ্রুং-ফা", হিন্দু নাম রুদ্রসিংহ, ১৬৯৬ সালে রাজা হন, এবং ১৭১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

বৈষ্ণবদের উপরে যে-সমস্ত বিধি-নিষেধ ছিল, রাজা হইয়াই রুদ্রসিংহ সে-সমস্ত তুলিয়া দিলেন, ধর্ম বিষয়ে বৈষ্ণবদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন, কিন্তু কেবল বৈষ্ণবদের সমস্ত সত্র ব্রহ্মপুত্র-মধ্যস্থিত মাজুলি-দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন। আসামের জনগণ যাহাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভারতের অন্য অংশসমূহের তুল্য হইয়া উঠে, সেই চেষ্টায় তিনি বাঙ্গালা দেশ হইতে বহু কারুশিল্পী, পূর্তকার, সংগীতকার, বাদক, পণ্ডিত প্রভৃতিকে আসামে আনান। সংস্কৃত বিদ্যালয় তিনি অনেক স্থাপিত করেন এবং বাঙ্গালা দেশের বড়ো-বড়ো সংস্কৃত-বিদ্যার কেন্দ্রে আসাম হইতে বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী পাঠান। শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য তিনি বাঙ্গালা দেশ হইতে শান্তিপুর মালিপোতা নিবাসী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যকে আসামে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন—শেষে, তিনি স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও, নিজের পুত্রদিগকে এবং সভার তাবৎ ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করান, এবং তাঁহাকে কামাখ্যা-মন্দিরের অধ্যক্ষ করিয়া দেন। এইভাবে তাঁহার চেষ্টায় অহমগণ দ্রুত পুরাপুরি হিন্দু বনিয়া যাইতে থাকে, এবং আসামে জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রুদ্রসিংহ শিবসাগরের নিকটে রঙ্গপুর নামক ক্ষুদ্র রাজধানী নগরে নিজের বাসের উপযোগী ইষ্টক-নির্মিত প্রাসাদাদি বাঙ্গালী মিস্ত্রি আনাইয়া তৈয়ারী করান—ইহার পুর্বে অহম-রাজগণ মুখ্যতঃ কাঠের বাড়িতে বাস করিতেন। নিজের মাতা সতী সাধ্বী জয়মতী কুয়ঁরীর স্মৃতির উদ্দেশে "জয়সাগর" নামে একটি বিরাট্ পুষ্করিণী এবং "জয়দোল" নামে ইষ্টক-নির্মিত মন্দির উৎসর্গ করেন। মৃত্যুর পরে হিন্দু-মতে তাঁহার দেহের দাহের ব্যবস্থা হয়—অহম-মতে সমাধি দেওয়া হয় নাই।

রুদ্রসিংহের কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা আসাম সরকারের মুদ্রাসংগ্রহে আছে। যোগিনীতন্ত্রের বর্ণনা-মতো কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ অর্থাৎ অহমদের অধিকৃত দেশ অষ্টভুজ বলিয়া কল্পিত হওয়ায়, আসামের মুদ্রাসমূহ, গোলাকার হইত না, অষ্টভুজ হইত। ১৬১৮ শকাঙ্কিত একটি মুদ্রায় পুরাতন অসমিয়া (বা বাঙ্গালা) অক্ষরে এক দিকে লেখা আছে—"শ্রীশ্রীমৎ স্বর্গদেবরুদ্রসিংহস্য শাকে ১৬১৮"; ইহার তলায় আছে, সিংহাকৃতি dragon ড্রাগন বা অহম-জাতির কল্পিত মহানাগ মূর্তি; এবং অন্য দিকের লেখা হইতেছে "শ্রীশ্রীহরগৌরীপাদাম্বুজমধুকরস্য।" সরল রেখার পরে বিন্দুর নকৃশা

মুদ্রার ধারে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। আর এক প্রকারের মুদ্রায় আছে এক দিকে "শ্রীশ্রীমৎসৌমরেশ্বরদেবরুদ্রসিংহস্য শাকে ১৬১৯"; ইহার তলায় পলায়মান হরিণের পশ্চাতে ধাবমান সিংহ বা ব্যাঘ্র অথবা ড্রাগন, এবং অন্যদিকে "শ্রীশ্রীহরগৌরী-পদ-যুগল-কমল-মধুকর।" এই দুই প্রকারের লিপি-এবং চিত্র-যুক্ত রূপার পূরা মুদ্রা বা টাকা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অর্ধমুদ্রা বা আধুলিও আছে। আধুলির একদিকে লেখা "শ্রীশ্রীরুদ্রসিংহস্য', ও অন্যদিকে "শ্রীশ্রীশিবপদপরস্য"। এই আধুলিও অষ্টকোণ। অহম ভাষায় রুদ্রসিংহের কোনও মুদ্রা এতাবৎ পাওয়া যায় নাই, যদিও তাঁহার পরবর্তী দুই একজন রাজার অহম-ভাষায় ও ফারসী ভাষায় লেখা সমেত পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রা আছে, সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রা তো আছেই। রুদ্রসিংহের পিতা গদাধরসিংহের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেবল অহম-ভাষায়। অহম রাজারা ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতে পারেন নাই। আসামের কাছাড়ী, চুটিয়া ও অন্য বোড়ো-ভাষী হিন্দু পাঁচটি কিরাত জনসমূহের মধ্যে অহমরা একটি জন-মাত্র ছিল। ১৫৩০-এর দিকে রাজা চু-হুংমুং-র নেতৃত্বে অহমদের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—ইহারা চুটিয়া ও কাছাড়ীদের জয় করে, এবং আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহাদের ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়। বাহিরের জগতের সহিত অহমদের তখন সংযোগ ঘটে। অহম-রাজ চু-ক্লেং-মুং (১৫৩৯-১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম নিজ মুদ্রা প্রচার করেন—অহম-ভাষায়। ইহার পূর্বে কোচ-রাজ নরনারায়ণ-(১৫৪০-১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ত্রিপুরা-রাজ প্রথম-ধন্যমাণিক্য (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় নিজ নিজ রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন। সম্ভবতঃ সমগ্র বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দুরাজা দনুজ-মর্দনদেব (১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তৎপরে নরনারায়ণ ও ধন্যমাণিক্যের মুদ্রার অনুকরণে অহম-রাজ সু-তাম্-লা বা জয়ধ্বজ-সিংহ (১৬৫৪-১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) সংস্কৃত ভাষায় প্রথম মুদ্রা বাহির করেন—ইহার মুদ্রার এক দিকে আছে "শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণদেবস্য শাকে ১৫৭০" ও অন্য দিকে "শ্রীশ্রীহরিচরণ-পরায়ণস্য।" তদনন্তর চু-পুং-মুং বা চক্রধ্বজসিংহ (১৬৬৩-১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ) অনুরূপ মুদ্রা বাহির করেন—এক দিকে লেখা "শ্রীশ্রীস্বর্গদেব-চক্রধ্বজ সিংহস্য শাকে ১৫৮৫" এবং অন্য দিকে "শ্রীশ্রীশিবরাম-পদারবিন্দ-পরায়ণস্য।"

রুদ্রসিংহের রাজত্বের লক্ষণীয় ঘটনা দুইটি; একটি হইতেছে কাছাড়ী ও জৈন্তিয়া রাজার যুদ্ধ, এবং নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে কাছাড় ও জৈন্তিয়া

রাজ্য অহম সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া যাওয়া; এবং দ্বিতীয় ঘটনা হইতেছে, তাঁহার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ ও মোগলের সহিত শক্তি পরীক্ষায় আয়োজন। কাছাড় রাজ্য ইতিপূর্বে অহমদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া অহম-রাজের সামন্ত-রাজ্য-রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়-রাজ তাম্রধ্বজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। অহমদের সহিত কাছাড়ীদের যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে তাম্রধ্বজ পরাজিত হইলেন, এবং অহম সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিশেষ বিপন্ন হইলেন। তখন জৈন্তিয়া-রাজ রামসিংহ, অহমদের বিরুদ্ধে তাম্রধ্বজকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। রামসিংহের উদ্দেশ্য মন্দ ছিল—বিপন্ন তাম্রধ্বজকে নিজের বশে পাইয়া তিনি কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিলেন; ভবিষ্যতে কাছাড়-রাজ্য অধিকার করা ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। বন্দী অবস্থায় তাম্রধ্বজ আসাম-দেশীয় দুইজন বৈরাগীকে পাইয়া তাহাদের মারফৎ নিজের খবর তাঁহার রানী চন্দ্রপ্রভার নিকটে পাঠাইলেন। চন্দ্রপ্রভার সম্বন্ধে প্রাচীন অসমীয়া বুরঞ্জীতে লিখিয়াছে—"কছারী রজার দেবীজনা (প্রধানা রানী) মহাসুন্দরী। চন্দ্র-সূর্য্যতে মলি আছে দেবীতে মলি নাই। কেশ সাত-হাতীয়া।" বৈরাগীর মুখে খবর পাইয়া চন্দ্রপ্রভা দেবী ইহাদের হাতে রুদ্রসিংহকে পত্র দিলেন, মাথার কেশ একগাছি নিদর্শন রূপে দিলেন—রুদ্রসিংহের শরণাপন্ন হইয়া, বিশ্বাসঘাতক জৈন্তিয়া-রাজের হাত হইতে স্বামীর মুক্তির জন্য অনুরোধ করিলেন। কিছুকাল পরে, রুদ্রসিংহের সেনাপতিদের কৌশলে, কাছাড়-রাজ তাম্রধ্বজ সমেত জৈন্তিয়া-রাজ রামসিংহ ধৃত হইয়া রুদ্রসিংহের দরবারে প্রেরিত হইলেন। এইরূপে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে দুইটি প্রবল হিন্দু রাজ্য অহম-রাজার অধীনে আসিল। ১৭০৮ সালে অহম-রাজার অধীনে আসার পরে, তাম্রধ্বজ ও রামসিংহ উভয়েরই মৃত্যু হয়। এই দুই দেশে রুদ্রসিংহ নূতন রাজা প্রতিষ্ঠিত করেন, যুদ্ধে অহম-রাজকে তাঁহারা সৈন্য সাহায্য করিবেন এই শর্তে।

ইহার পরে রুদ্রসিংহ বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত মুসলমান মোগল শাসকের সহিত শক্তি পরীক্ষার সংকল্প করিলেন। এই সংকল্পের পিছনে ছিল এক বিরাট্ আদর্শ—সমস্ত পূর্ব-ভারতে মুসলমান শাসনের স্থানে পুনরায় হিন্দু-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা। যে আদর্শের অনুপ্রেরণায়, গুরু সমর্থ শ্রীরামদাসের শিষ্য শিবাজী, সমগ্র ভারতে "হিন্দুপদ-পাদশাহী" স্থাপনের জন্য মহারাষ্ট্রে "ভগবা ঝাণ্ডা" উড়াইয়াছিলেন, নিজ গুরুর উত্তরীয়কে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর গৈরিক

ঊর্দ্ধবাসকে, পতাকা করিয়া, পুনরুজ্জীবিত হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—এ যেন সুদূর প্রাচ্য-ভারতে সেই আদর্শের এক প্রতিস্পন্দন-রূপে দেখা দিয়াছিল। শক্তি ও যুক্তি—এই দুইয়ের সমাবেশ রামদাস ও তাঁহার শিষ্য শিবাজীর কাম্য ছিল। রুদ্রসিংহের পিতা মোগলকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন; তিনি পিতার আরব্ধ কার্য্য পূর্ণ করিতে এবং তাঁহার নির্দিষ্ট পথে আরও অগ্রসর হইতে চাহিলেন।

স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ "বঙ্গাল মারিবলৈ" অর্থাৎ বাঙ্গালা-দেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে সেনা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের বুরঞ্জীর কথায়, মহারাজা আপনার দেশের অস্ত্র—তীর, ধনুক, বর্ষা, তরওয়াল, বন্দুক, গুলি বারুদ এবং নৌকা প্রভৃতি, ভাণ্ডারে বা অস্ত্রাগারে যত ছিল তাহার হিসাব কারলেন, এবং আরও অধিকাধিক রূপে করাইতে লাগিলেন। হাতী-ঘোড়া আরও সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, এবং দেশের লোকেদের বেশি করিয়া অস্ত্র ব্যবহার শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। এ ছাড়া, বাঙ্গালা দেশে আসামের কথা প্রচারের জন্য এবং বাঙ্গালার জনসাধারণের মনে আসাম-রাজের প্রতি প্রীতি-ভাব উৎপন্ন করাইবার জন্য, নানা শ্রেণীর লোককে, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, গুণী, গায়ন, কারিগর প্রভৃতি লোকেদের আহ্বান করিয়া আনিয়া, সকলকে "দ্রব্য সামগ্রী" দিয়া খুশী করিতে লাগিলেন। যে-সব প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বয়ং আসামে আসিতে পারেন নাই, প্রণামী স্বরূপ তাঁহাদের সোনা রূপা দিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে আসামের রাজা গুণিগণ-পরিপোষক বলিয়া চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়, এবং বহু ব্যক্তি বাঙ্গালা হইতে আসামে আসিতে থাকে।

আনন্দিরাম মেধি, বা বৈষ্ণব আনন্দিরাম, বাঙ্গালা দেশ হইতে রুদ্রদেবের সভায় আসিলেন। তিনি গায়ক ও গুণী ছিলেন, রাজাকে সংকীর্তন শুনাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ কাছ পরিয়া মুরলী ধরিয়া নৃত্য দেখাইলেন। রাজা খুশী হইয়া তাঁহাকে অর্থাদি দিয়া কাছে রাখিলেন।

ইতিমধ্যে, রাজা রুদ্রসিংহ তাঁহার পিতা স্বর্গীয় গদাধরসিংহের গয়াকৃত্য করিবার জন্য গয়ায় তর্কবাগীশ ভট্টচার্য্যকে পাঠাইয়াছিলেন। ফিরিবার কালে, ঢাকায় তাঁহার সহিত স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সুবংশ রায়ের সাক্ষাৎ হয়। তর্কবাগীশ পরে ঢাকায় সুবংশ রায়ের নিকট রাজাদেশে এই অনুরোধ জানাইবার জন্য রত্নকন্দলী কটকীকে পাঠান যে, সুবংশ রায় যেন আসামে

কতকগুলি ভালো গুণী গায়ক পাঠাইয়া দেন। সুবংশ রায় রত্নকন্দলীকে বলিলেন—"রুদ্রসিংহ মহারাজা কাছাড় ও জৈন্তিয়া রাজ্য জয় করিয়াছেন। ত্রিপুরার রাজা বড়ো রাজা; তিনি যদি এখন ত্রিপুরা-রাজের সহিত প্রীতি-সম্বন্ধ করেন, তাহা হইলে অনেক কার্য্য হয়।" রত্নকন্দলী এই কথা মহারাজের গোচরে নিবেদন করেন—সেই কথা মহারাজের মনে ছিল।

মহারাজা রুদ্রসিংহ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, আনন্দিরাম ত্রিপুরার দরবারে পরিচিত, ত্রিপুরার মহারাজও তাঁহাকে জানেন। তখন রুদ্রসিংহের কথা-মতো স্থির হইল যে, অহম-রাজের অন্যতম প্রধান-মন্ত্রীর প্রেরিত দুই জন প্রতিনিধি বা দূত সঙ্গে করিয়া আনন্দিরাম ত্রিপুরায় যাইবেন, এবং দুই রাজার মধ্যে যাহাতে মিত্রতা ঘটে, তাহার চেষ্টা আনন্দিরাম এবং তাঁহার সঙ্গের রাজকীয় দূতদ্বয় করিবেন। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দিরামের সহিত রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস ত্রিপুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন মহারাজ রত্নমাণিক্য (রাজ্যকাল, ১৬৯৮-১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ)। ত্রিপুরায় পঁহুছিয়া দূতদ্বয় বাঙ্গালা দেশের দিকে আগমনের কারণ প্রথমটায় এই রূপ দিলেন যে, আসামের অন্যতম প্রধান মন্ত্রী সুরথসিংহ বড়-বড়ুয়ার নির্দেশে তাঁহারা গঙ্গাজল আনিতে আসিয়াছেন। আনন্দিরাম মেধির ব্যবস্থায় মহারাজ রত্নমাণিক্যের সহিত দূতদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইল। ইহাদের সহিত আলাপ করিয়া ত্রিপুরা-রাজেরও স্বাধীন হিন্দু রাজা আসাম-রাজের সহিত সৌহার্দ্দ্য করিবার ইচ্ছা হইল; এবং তিনি রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের সঙ্গে আপনার দুইজন উকীল বা দূতকে আসামে পাঠাইবেন, এইরূপ স্থির হইল। এই দূত দুইজনের হাতে তিনি রুদ্রসিংহদেবের নামে পত্র দিলেন, বড়-বড়ুয়াকেও পত্র দিলেন। এই দুই পত্র-ই সংস্কৃতে লিখিত হইল, যেরূপ হিন্দুরাজ্যে রীতি ছিল। উভয়কে যথাযোগ্য স্বর্ণালংকার, অস্ত্র, মূল্যবান্ বস্ত্র প্রভৃতি উপঢৌকনও দিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের দূত রূপে রামেশ্বর ন্যায়ালংকার ভট্টাচার্য্য ও উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, ইঁহারা আসাম যাত্রা করিলেন। কাছাড় হইয়া ইঁহারা চারি জনে রুদ্রসিংহের দরবারে উপস্থিত হইলেন—আনন্দিরাম মেধি আর গেলেন না। ইঁহাদের সহিত ত্রিপুরা-রাজ দশজন অনুচর দেন, তন্মধ্যে একজন বৈদ্য, দুইজন নাপিত। সমারোহের সহিত পূর্ণ দরবারে আসাম-রাজ ত্রিপুরা-রাজের দূতদের স্বাগত করিলেন (জুলাই ১৭১১)।

এইরূপে দুই রাজার মধ্যে দূত মারফৎ সংযোগ স্থাপিত হইল। রুদ্রসিংহ তাহার পরে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও উদয়নারায়ণ বিশ্বাসের হাতে ত্রিপুরা-রাজের পত্রের উত্তর দিলেন, উপযুক্ত উপঢৌকনাদিও দিলেন। রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস-ও সঙ্গে গেলেন—তাঁহাদের হাতে ত্রিপুরা-রাজের জন্য রুদ্রসিংহ একখানি 'রহস্য পত্র' দিলেন। প্রকাশ্য পত্র যাহা ত্রিপুরার দূতদের হাতে দেওয়া হইল, তাহা ছিল সংস্কৃতে; ব্যক্তিগত এই রহস্য-পত্র বাঙ্গালা ভাষায় ছিল। সুরথসিংহ বড়-বড়ুয়াও ত্রিপুরার মহারাজকে পৃথক্ পত্র দিলেন, তাহাও বাঙ্গালা ভাষায়। ত্রিপুরার দূতেরা আসামের রাজধানী শিবসাগরের নিকট অবস্থিত রঙ্গপুর নগরে দুর্গোৎসব দেখিবার জন্য রহিয়া গেলেন। পরে আসাম-রাজ ও বড়-বড়ুয়ার নিকট হইতে উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়া সকলে ত্রিপুরায় যাত্রা করিলেন (১৭১১ নভেম্বর)।

রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের সঙ্গে এবার ৩৪ জন পাইক অনুচর চলিল। কতক স্থলপথে, কতক নৌকায়, কতক ঘোড়ায় করিয়া, তাঁহারা ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে পঁহুছিলেন, ১৭১২ সালের মার্চ মাসের শেষে। এপ্রিলের মাঝামাঝি রত্নমাণিক্য মহারাজের সহিত ইঁহাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। তিন দিন পরে রুদ্রসিংহের রহস্য-পত্র ত্রিপুরার মহারাজকে দেওয়া হইল। ত্রিপুরা-রাজ ও তাঁহার দেওয়ান এবং দূত উদয়নারায়ণ ভিন্ন ত্রিপুরার আর কেহ সেখানে ছিল না। দেওয়ান আগ্রহের সহিত মোগল ও অসমিয়ার মধ্যে যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন।

রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস ত্রিপুরার যথাসম্ভব পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। আসাম হইতে ত্রিপুরা যাইবার পথ, পথে যে-যে জাতির লোক বাস করে, দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কী কী জিনিস পাওয়া যায়, হাট কোথায়-কোথায় হয়, হাটে আনীত দ্রব্যাদি, কোথাকার লোকে হাটে বিকিকিনি করিতে আসে, রাজধানী উদয়পুরের খুঁটিনাটি বর্ণনা, রাজার প্রাসাদ ও রাজ-দরবারের রীতি-নীতি আদব কায়দা, ত্রিপুরার পূর্ব ইতিহাস, তাঁহাদের অবস্থান-কালে ত্রিপুরার ঘটনাবলী,—এ-সব কথা অতি অনাড়ম্বর সারল্যের সহিত লেখকদ্বয় বিবৃত করিয়াছেন। রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস তাঁহাদের বইতে দুই রাজার মধ্যে প্রেরিত প্রত্যেক পত্রের অনুলিপি দিয়াছেন, কী কী উপঢৌকন রাজদ্বয় পরস্পরকে পাঠাইয়াছিলেন এবং বড়-বড়ুয়া ও ত্রিপুরা-রাজের মধ্যেও যে-সমস্ত উপহারের আদান-প্রদান হইয়াছিল, তাহারও পূর্ণ তালিকা

দিয়াছেন। এমন কি, দ্বিতীয় বার রাজ্যে প্রবেশ করিবার পরে, ত্রিপুরা-দরবার হইতে ত্রিপুরার অতিথি হিসাবে তাঁহারা খাদ্যের জন্য ও অন্য বাবতে যে সিধা পাইতেন তাহার বিবরণও দিয়াছেন; যেমন সম্মাননীয় অতিথিদের জন্য ও পাইক ও ভৃত্যদের জন্য মাস-মাস মাথা পিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে ভালো আতপ চাউল ও সাধারণ চাউল, মুগের দা'ল ও কলাইয়ের দা'ল, শাকশবজী, ঘৃত, তৈল, লবণ, মশলা, পাইকদের জন্য হাঁস ও খাসী, নিয়মিত মাটির হাঁড়ি ও অন্য পাত্র, জ্বালানী কাঠ, পূজার ফুল-পত্রাদি, সমস্ত-ই ত্রিপুরা সরকার হইতে প্রদত্ত হইত। ত্রিপুরার রাজা ও প্রধান রাজপুরুষগণ দরবার প্রভৃতিতে কী কী পোষাক ও অলংকার পরিয়া আসিতেন, তাহার বর্ণনা করিতেও ভুলেন নাই। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিপুরা ও আসামের রাজাদের—ও প্রজাদের—জাঁক-জমকের ও সংস্কৃতির এমন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা আর কোথাও মিলিবে না। এইজন্য রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের এই বই অমূল্য।

দ্বিতীয় বার ত্রিপুরায় অবস্থান-কালে, রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসকে বাধ্য হইয়া ত্রিপুরার একটি রাজবিপ্লবের মধ্যে পড়িতে হয়। রত্নমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যুবরাজ ঘনশ্যাম কতকগুলি পারিবারিক কারণে রাজার প্রতি বিরূপ হন। স্বয়ং রাজা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায়, দুইজন বিদেশী মুসলমান (মোগল)-এর সাহায্য লইয়া, তিনি রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন ও বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহার পরে হঠাৎ সরলবিশ্বাসী এবং অসহায় রত্নমাণিক্যকে নিজ বশে আনিয়া, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজে তৎস্থানে রাজা হইয়া বসিলেন। মন্ত্রী ও সেনাদলের কেহ-কেহ ঘনশ্যামের পক্ষে ছিলেন, এবং রত্নমাণিক্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হইলেও সাধারণ প্রজা ছিল নিরপেক্ষ; সুতরাং ঘনশ্যামের রাজা হইয়া বসা সহজ হইল। ঘনশ্যাম রাজা হইয়া মহেন্দ্রমাণিক্য নাম গ্রহণ করিলেন, এবং রত্নমাণিক্যকে কিছুকাল বন্দী করিয়া রাখিবার পরে তাঁহার হত্যা-সাধন করাইলেন। এই ঘরোয়া রাজবংশীয় বিপ্লবে কতকগুলি প্রাণ গেল, তন্মধ্যে রত্নমাণিক্যের শ্যালক একজন, এবং রত্নমাণিক্যের ও ঘনশ্যামের ভগিনীপতি একজন। ইঁহাদের পত্নীরা স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইলেন। এই-সমস্ত ঘটনা যথাযথ নিরপেক্ষ-ভাবে রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস তাঁহাদের ত্রিপুরা-বুরঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হিসাবে ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

ঘনশ্যাম বা মহেন্দ্রমাণিক্য আসামের দূতদ্বয়কে নূতন করিয়া যথারীতি আপ্যায়িত করিলেন, এবং আসাম-রাজের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত পত্র দিলেন, বড়-বড়ুয়া সুরথসিংহকেও পত্র দিলেন। এবার নিজ উকীল রূপে অরিভীম-নারায়ণ নামে ত্রিপুরা-জাতীয় এক রাজপুরুষকে রত্নকন্দলী ও অর্জুন-দাসের সঙ্গে আসামে পাঠাইলেন; আসামের দূতদ্বয়কে যথাযোগ্য পুরস্কারও দিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ত্রিপুরা হইতে এই দ্বিতীয় পত্র মহারাজ রুদ্রসিংহের হস্তগত হইল।

এই পত্রের উত্তরে, ১৭১৪ সালের এপ্রিল মাসে রুদ্রসিংহ ও বড়-বড়ুয়া কর্তৃক মহেন্দ্রমাণিক্যকে লিখিত সংস্কৃত পত্র লইয়া অরিভীম-নারায়ণ, রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। রত্নকন্দলী ও তাঁহার সাথীর ত্রিপুরার দরবারে এই তৃতীয় দৌত্য। ১৭১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপুরায় পৌঁছিয়া তাঁহারা শুনিলেন, ইতিমধ্যে মহেন্দ্রমাণিক্যের গ্রহণী রোগে মৃত্যু হইয়াছে, নূতন রাজা হইয়াছেন রত্নমাণিক্যের আর এক ভ্রাতা দুর্জয়সিংহ; ইনি মহারাজ ধর্মমাণিক্য (দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য) নাম গ্রহণ করেন। মে মাসের মাঝামাঝি ধর্মমাণিক্য ইঁহাদের দরবারে আহ্বান করিলেন, এবং মে মাসের শেষে সাধারণ-ভাবে আসাম-রাজের সহিত সংস্কৃত পত্রে মৈত্রী ভাব প্রকাশ করিয়া, উপঢৌকন-সহ রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসকে বিদায় দিলেন। ত্রিপুরা হইতে আসামে এবার আর দূত পাঠানো হইল না।

অসমিয়া দূত দুইজন ১৭১৫ সালের আগস্ট মাসে আসামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশ আক্রমণের জন্য রণসজ্জা করিতে-করিতে ১৭১৪ সালের আগস্ট মাসে—রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের আসাম প্রত্যাবর্তনের এক-বৎসর পূর্বে—রুদ্রসিংহ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র স্বর্গদেব শিবসিংহ তখন আসামের রাজা হইয়াছেন। পিতার মতো ভাবুক ও কর্মী তিনি ছিলেন না। ত্রিপুরা ও আসাম উভয় দেশের দুই রাজার উৎসাহের অভাবে, স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের কল্পনা আর কার্য্যে পরিণত হইল না—তাঁহার উচ্চাশার ও কামনার উপর যবনিকা পড়িয়া গেল।

রুদ্রসিংহের কামনা ও আশা এই ভাবে তাঁহার এই দুই বিশ্বস্ত দূত তাঁহাদের রচিত বুরঞ্জীতে প্রকাশ করিয়াছেন: "রুদ্রসিংহ মহারাজ দেবতা, জয়ন্তা ও কাছাড় এই দুই দেশ দখল করিয়া, পরে বাঙ্গালা দেশ দখল করিবার উদ্যম করিলেন। তাহার পরে সেই দেশের অন্তর্গত (মিথিলা-সংলগ্ন

নেপাল-দেশের অংশ) মৌরঙ্গের রাজা, বন-বিষ্ণুপুরের রাজা, নদীয়ার রাজা, বেহারের (সম্ভবতঃ কোচ-বিহারের) রাজা, বর্ধমানের কীর্তিচন্দ্র জমিদার, বড়নগরের উদয়নারায়ণ জমিদার, এই সকলের নিকটে (আসামের অন্যতম প্রধান কর্মচারী) বড়-ফুকনের নামে লোক পাঠাইয়া, তাঁহাদেরও লোক আনাইয়া, বড়-ফুকন-ই যেন মহারাজকে জানাইতেছেন এইভাবে তাঁহাদের লোককে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া, সেই সকল রাজা ও জমিদারের জন্য উপঢৌকন দিয়া ও তাঁহাদিগকে প্রীতিপূর্বক পত্র দিয়া, আমাদের লোক সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এই রূপে মনুষ্য গতায়াত করাইয়া তাহাদিগকে বশ করিয়া লইয়া, পরে তাঁহাদিগকে কহিয়া পাঠাইলেন—'আমরা হিন্দুধর্মস্থ রাজাসকল বিদ্যমান থাকিতে, যবনে ধর্ম নষ্ট করে। এই কারণে, সকলে এক-বাক্য হইয়া যবনকে নিগ্রহ করিয়া ধর্ম রক্ষা করিলে, যাহা হইতে পারে, তাহা আপনারা জ্ঞাত আছেন।' এইরূপে সকলেরই নিকট লোক পাঠাইয়া জানাইলেন। তাঁহারাও অনুমোদন করিলেন।"

ত্রিপুরা-রাজ ধর্মমাণিক্যকে যে 'রহস্য-পত্র' দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ লিখা ছিল—"সমাচার এই, জন-ঘোষ এমন প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে, মোগলের বৈপরীত্য-চেষ্টাতে বেদোক্ত ধর্ম রক্ষা পায় না। এই কারণ তৎ-প্রতিকারার্থ ব্যাপার করিতে যদি তোমার মনে ভাল বাসে, তবে তোমার সহিত যে যে বড় লোকের হার্দতা আছে, তাঁহাদের সহিত সমালোচনা করিয়া যথাবৃত্ত সামর্থ্য শক্তি আমার কাছে বিশেষিয়া লিখিবে। সমস্ত লোক ঈশ্বরের অধীন ; তথাপি যেমতে আপন দেশেতে অন্যের পরাভব ব্যতিরেকে সচ্ছন্দে রাজচেষ্টা করিতে পাই, তথা যথা-ইষ্ট ব্যবহারেতে অন্য সাপেক্ষ না হয়, তাহার প্রতি সর্বথা যত্ন করিতে সমুচিত হয়।"

A word to the wise—এই ভাবে অল্প কথায় মহারাজ রুদ্রসিংহ নিজ অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন। বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মোগলের বিরুদ্ধে লড়িবার পূর্বে তিনি বাঙ্গালার ও পূর্ব-ভারতের তাবৎ স্বাধীন ও অ-স্বাধীন হিন্দুরাজার সাহায্য চাহিয়াছিলেন, একটি হিন্দু confederacy বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। যেভাবে ত্রিপুরার সঙ্গে এই চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহার পরিচয় রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের "ত্রিপুরা বুরঞ্জী" ("ত্রিপুরা দেশের কথার লেখা। শ্রীশ্রীরুদ্রসিংহ মহারাজা-দেবে ত্রিপুরা দেশের রাজা রত্নমাণিক্য সহিত প্রীতিপূর্বক কটকী [=দূত] গতাগত করা কথা : শক

১৬৪৬") পুস্তকে পাইতেছি। অন্যান্য স্থানে প্রেরিত দূতগণের অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় নাই—হয়-তো সে কথা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অনপেক্ষিত নাতি-দীর্ঘ গ্রন্থ হইতে, পূর্ব-ভারতের হিন্দু সংস্কৃতি-সংরক্ষক একজন উৎসাহী ও বিজয়ী রাজার দৃষ্টি-ভঙ্গীর ও কর্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় পাইতেছি; এবং এই রাজাকে আমরা "পূর্ব-ভারতের শিবাজী" আখ্যা দিয়া তাঁহার গৌরবে পূর্ব-ভারতের হিন্দু আমরা আমাদের গৌরবান্বিত মনে করিতে পারি ॥

শারদীয় "হিন্দুস্থান"
বঙ্গাব্দ ১৩৫৩
[স্বল্প পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত]

ঋগ্‌বেদ

সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধে ভারতের প্রবীণ রাজনীতিক নেতা শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজগোপালাচার্য্য বলিয়াছেন যে, Sanskrit is the symbol of our seniority among the nations of the world—পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে আমাদের প্রাবীণ্যের বা শ্রেষ্ঠতার প্রতীক হইতেছে সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এবং ভারতের ধর্মচিন্তার ও সভ্যতার উৎস-স্বরূপ হইতেছে 'ঋগ্‌বেদ'।

প্রাচীনত্বে, এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মর্য্যাদায়, পৃথিবীর পাঁচ-ছয়খানি গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্‌বেদ সর্বপ্রাচীন। মানবজাতির ইতিহাসে, ঋগ্‌বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে মিসর, মেসোপোতামিয়া (ইরাক—সুমের ও আক্কাদ) ও এশিয়া-মাইনর এবং সিরিয়া দেশের নানা জাতির মানুষ, ভারতবর্ষে আর্য্য সভ্যতার পত্তন, গঠন ও বিকাশের বহু পূর্বে, সভ্য জীবন-ধারা গড়িয়া তুলিয়াছিল, নিজ-নিজ ধর্ম ও ধর্মীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং সেই জীবন-ধারা ও ধর্মের প্রকাশক কতকগুলি বিশেষ লক্ষণীয় সাহিত্য-সর্জনাও তাহাদের দ্বারা ঘটিয়াছিল। কাল-ক্রমে ঐ-সমস্ত দেশে, নানা বিদেশী বিজেতার প্রভাবে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে পরিবর্তন আসিয়া যায়, ভাষায় বিপর্য্যয় আসিয়া পড়ে, এবং বহু ক্ষেত্রে জাতির মানুষ বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়; ভাষা লোপ পায় অথবা আমূল পরিবর্তিত হয়, এবং ভাষার প্রাচীন লিপির জ্ঞানও লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু বিগত উনবিংশ শতকে ও এই বিংশ শতকে, প্রায় দেড় শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপের নানা দেশের ঐতিহাসিক, প্রত্নবিৎ, বাকৃতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের চেষ্টার ফলে, পাথরে, মাটির ফলকে, ধাতু-ফলকে, পাপিরস্ কাগজে বা চামড়ার কাগজে উৎকীর্ণ বা মুদ্রিত অথবা লিখিত এই-সমস্ত বিলুপ্ত সুপ্রাচীন সাহিত্যের পাঠোদ্ধার হয়, এবং মানবের ইতিহাসের প্রাচীন যুগের অনেক অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত, গ্রীক, হিব্রু, চীনা প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় উপলব্ধ এবং জন-সমাজে পঠিত ও

সুপরিচিত সাহিত্যের প্রতিস্পর্ধী কতকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব বিরাট্ প্রাচীন সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার ঘটে। এই-সমস্ত লুপ্ত সুপ্রাচীন সাহিত্যিক রচনার পুনরাবিষ্কারের ফলে জানা যায় যে, সর্বজন-মান্য ধর্মগ্রন্থের পদে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর প্রাচীনতম কতকগুলি গ্রন্থকে আর সর্ব-প্রাচীন বলা যায় না—তাহাদের চেয়ে আরও পুরানো গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের ঋগ্‌বেদ ও অন্য বেদ, প্রাচীন গ্রীসের Homer হোমের-রচিত মহাকাব্যদ্বয় *Iliad* ইলিয়াদ ও *Odyssey* ওডিসি, প্রাচীন ঈরানের *Avesta* অবেস্তা, চীনের *Shi-King* শী-কিঙ্ (বা *Shih-Ching* শ্ঃ-চিঙ্), *Shu-King* শূ-কিঙ্ ও *I-King* ঈ-কিঙ্, যিহুদীদের প্রাচীন গ্রন্থ *Thorah* থোরাহ্ (হিব্রু ধর্ম-পুস্তকের প্রাচীনতম অংশ) প্রভৃতি গ্রন্থের পিছনে, আরও প্রাচীন কতকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় ও অন্যবিধ গ্রন্থ এখন পাওয়া গেলেও, এবং বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত-মহলে সেগুলির পঠন-পাঠন ও আলোচনা রীতিমতো-ভাবে আরম্ভ হইয়া গেলেও, প্রাচীন পুস্তকগুলির (ঋগ্‌বেদ, হোমের, শী-কিঙ্, থোরাহ্ প্রভৃতির) প্রতিষ্ঠা কমে নাই—গত আড়াই তিন হাজার বছর ধরিয়া সেগুলির পঠন-পাঠন ও চর্চা আজিকার দিনেও অব্যাহত আছে। প্রাচীন মিসরীয়, প্রাচীন মেসোপোতামিয়ার সুমেরীয় ও আক্কাদীয় (বাবিলনীয় ও অসুরীয়) ভাষায় রচিত সাহিত্য, সিরিয়া দেশের কতকগুলি শেমীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি, এশিয়া-মাইনরের প্রাচীন কানিশীয় বা হিত্তী ভাষায় রচিত গ্রন্থ—এগুলির চর্চা মূল ভাষায় ও লিপিতে আরম্ভ হইলেও, পণ্ডিতগণের মধ্যে-ই তাহা সীমাবদ্ধ; এবং সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন চীনা ও হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় সাহিত্যের মতো আধুনিক মানব-জীবনে সেগুলির কার্য্যকরতা নাই—যদিও বহুশঃ এগুলি এ-তাবৎ আমাদের নিকটে সর্ব-প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত ঋগ্‌বেদ অপেক্ষা কয়েক শত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে যে, ঋগ্‌বেদকে সাধারণ ভারতীয় হিন্দু আমরা তো পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া জানি; তাহা হইলে তাহার বয়স কত—রচনা-কাল ও সংকলন-কাল কত পূর্বেকার? ভারতের (এবং ভারতের মতো অন্য সমস্ত দেশের) প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই কয়েকটি মৌলিক কথার যৌক্তিকতা আমাদের প্রথমেই মানিয়া লইতে হইবে—এই নিম্ন-লিখিত প্রতিজ্ঞাগুলি স্বীকার করিতে হইবে, সেগুলির বিরুদ্ধে গেলে চলিবে না। সেই প্রতিজ্ঞাগুলি হইতেছে এই—

এক—ভারতের ইতিহাস, ভারতের আর্য্য, আর্য্যেতর এবং মিশ্র আর্য্যানার্য্য জাতির মানুষের ইতিহাস, পৃথিবীর এবং সমগ্র বিশ্বমানবের ইতিহাসেরই অংশ-মাত্র; বাহিরের পৃথিবীকে বাদ দিয়া ভারতের ইতিহাসকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া ধরা চলে না। জগতে মানব-জাতির প্রগতির সহিত সংযোগ রাখিয়া, তাহার সহিত তাল রাখিয়া, যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতের ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে। অতএব প্রাচীন ভারতের ইতিকথা আলোচনা করিতে গেলে, ঋগ্‌বেদের রচনার ও সংকলনের কাল নির্ধারণ করিতে গেলে, ভারতের সহিত সংযুক্ত ভারতের বাহিরের কথাকে অন্যতম আধার রূপে দেখিতে হয়। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও প্রণিধান করিতে হয় যে, সর্বদেশে সর্বমানুষের ইতিহাসে, বিভিন্ন জাতির মানুষের ভাষায়, রক্তে ও সংস্কৃতিতে মিশ্রণ এক অতি সাধারণ ব্যাপার—ভারতেও ইহার ব্যত্যয় হয় নাই।

দুই—ভারতের মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে, এবং মুখ্যতঃ জাতি-মিশ্রণের ফলে, ভারতীয় চিন্তা-ধারায় ও জীবন-রীতিতে, বিচারে ও আচারে, কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আসিয়া যায় (এইরূপ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর সকল জাতির মানুষের মধ্যে পাওয়া যাইবে)। কিন্তু তথাপি বলিতে হয়, সাধারণ মানবিক প্রকৃতিতে ভারতীয় মানব, বিশ্বমানবের বাহিরে নহে; ভারতের মানবের প্রতি (অন্যদেশীয় মানবের প্রতিও যেমন) অদৃশ্য বিশ্ব-শক্তির কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই। এই হেতু, প্রাচীন ভারতীয় মানব, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সাহিত্য বিধির বিধানে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব-প্রাচীন, একক এবং অদ্বিতীয়,—তুলনাত্মক দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা বলা চলে না, যদিও নানা বিষয়ে তাহার উৎকর্ষ এবং বিশ্বজনগ্রাহিতা অবশ্যই স্বীকর্তব্য। প্রায় তাবৎ জাতি ও ধর্মের মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ দৌর্বল্য আছে—তাহার নিজ-নিজ জাতি (ও ভাষা) এবং ধর্মকে ঈশ্বরানুগৃহীত এবং ভগবানের-ই বিধানে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে—কি ইংরেজ আর কি ব্রাহ্মণ, কি মুসলমান বা যিহুদী আর কি জাপানী, কি শ্বেতকায় ইউরোপীয় আর কি পীতকায় চীনা। কিন্তু গীতায় ঈশ্বর-বাণী বলিয়া প্রচারিত এই মহাবাক্যকে সকলেরই শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হয় —সদ্ভাব-প্রণোদিত কোনও ব্যক্তি এই উক্তির বিরুদ্ধে চলিতে পারিবেন না— 'সমোঽহং সর্বভূতেষু, ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি, ন প্রিয়ঃ।' The Chosen People of God; *Herrenvolk* বা প্রভু-জাতি; ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত ব্রাহ্মণ;

God's noblest handiwork, the English Gentleman; সূর্য্যদেবী Ama-terasu-Ohomi-Kami আমা-তেরাস্থ-ওহোমি-কামির বংশধর জাপানী মানুষ;—ইহারাই মানবজাতির সেরা; আবার কোনও বিশেষ ধর্মের মানুষ-ই ঈশ্বরের খাস তালুকের প্রজা;—সুযুক্তি-মূলক চিন্তায় এ ধরনের বিশ্বাসের কোনও স্থান নাই—Theological Bias অর্থাৎ কোনও বিশিষ্ট দৈববাদ-জাত ঝোঁক না থাকিলে, সরল কথা আমরা সহজ-ভাবেই লইতে পারি।

তিন—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহাসিক বিচার, এই দুইটি হইতেছে বিভিন্ন পর্য্যায়ের বস্তু; মূলে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যেমন বিরোধ নাই, তেমনি এই দুইটির মধ্যে বিরোধ নাই। তথাপি, অন্ধবিশ্বাস-প্রণোদিত একের সঙ্গে অপরের মিশ্রণে, আধ্যাত্মিকতা ও ইতিহাস উভয়-ই ক্ষুন্ন হয়। এই কারণে, মানবীয় ভাষায় রচিত কোনও রচনা-সম্পুটের আলোচনা করিতে গেলে, উহাকে মানব-চিত্তের ও মানব-সংস্কৃতির প্রকাশক Human Sciences বা 'মানবী বিদ্যা' অথবা 'মানবিকী'র অংশ বলিয়া-ই ধরিতে হয়। যেমন বাহ্য বিশ্ব-প্রপঞ্চ, পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূতময় Physical World বা এই ভৌতিক জগৎ, Physical Sciences অর্থাৎ 'ভৌতিকী'-বিদ্যার আলোচ্য। প্রতিভার দিব্য দীপ্তি থাকিলে, ভৌতিকী বা মানবিকীকে যদি ঈশ্বরীয়, অতিপ্রাকৃতিক, অতিমানব, বা অপৌরুষেয় বলি, তাহাতে শ্রদ্ধা ও আস্থা এবং ধর্মবোধ তৃপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিতর্ক-মূলক বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক বিচার ও আলোচনার পথ তাহাতে অনেকটা রুদ্ধ হইয়া যায়।

এই তিনটি বিষয় মনে রাখিলে, ঋগ্‌বেদকে (অথবা পৃথিবীর অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থকে) অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিয়াও, মানবের কল্পনা ও চিন্তার এক সুপ্রাচীন এবং মহনীয় প্রকাশভূমি রূপে আমরা ইহার (এবং ইহার পর্য্যায়ের অন্য রচনার) পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারি; দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ হইলেও, নিরবধি কাল ধরিয়া বিপুলা পৃথিবীর তাবৎ মানব-সন্তানের পক্ষে ইহার অন্তর্নিহিত কতকগুলি গভীর অনুভূতি, উপলব্ধি ও মৌলিক বিচারশৈলীর উপযোগিতা আমরা শুভ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সহজেই স্বীকার করিতে পারি।

সমগ্র বিশ্বজগতে নরাকার বানর-শ্রেণীর দ্বিপদ পশু হইতে আদিম মানবের উদ্ভব হইল। তদনন্তর লক্ষ-লক্ষ বৎসর পরে আদিম মানব, পশু অপেক্ষা

উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হইল। ক্রমে খাদ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ও আত্মরক্ষার তাগিদে আদিম মানব-পশু দলবদ্ধ হইয়া বাসের সুবিধা আবিষ্কার করিল, অগ্নি ব্যবহার করিতে শিখিল, কুশল দুই হাতের সাহায্যে পাথর ভাঙ্গিয়া বা ঘষিয়া ক্ষেপণাস্ত্র ও কর্তনাস্ত্র তৈয়ার করিতে জানিল, পাহাড়ের গুহায় বা মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া বাস করিবার পথ আবিষ্কার করিল, কাঠ-পাতার ঘর বাঁধিতে, গাছের ডাল দিয়া ভেলা বানাইতে ও গাছের গুঁড়ির ভিতরটুকু কাটিয়া তাহা হইতে নৌকা করিতে শিখিল। এইভাবে শতাব্দীর পরে শতাব্দী, সহস্রাব্দীর পরে সহস্রাব্দী অতিবাহিত হইল। অবশেষে মানুষ যখন সমাজ-বদ্ধ জীবনের মোটামুটি পত্তন করিতে সমর্থ হইল, পশু ও মৎস্য শিকার ও ফলমূল আহরণ দ্বারা কেবল খাদ্য-সংগ্রহের পদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়া, গোমেষাদি পশুপালন ও নদীমাতৃক দেশে যব-ব্রীহি-গোধূমাদি শস্যের চাষ দ্বারা খাদ্য-উৎপাদনের স্তরে গিয়া পঁহুছিল, তখন সে সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। বৈদিক, প্রাচীন ঈরানীয়, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন শেমীয় সভ্যতা ইহার বহু পরেকার ব্যাপার। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যার আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, মানুষের মধ্যে প্রথম সভ্য জীবনের উন্মেষ ঘটিয়াছিল এখন হইতে অনধিক ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে। তখনও মানব তাহার বন্য ও আদিম অবস্থার পরিবেশের মধ্যেই ছিল। ইমারত বাড়িঘর প্রস্তুত করা, প্রস্তর ও ব্রঞ্জ বা কাংস্যের অস্ত্রের সাহায্যে চাষ-বাস করা, যুদ্ধ করা, ধর্ম সম্বন্ধে বিচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা—এ-সব আরও পরেকার কথা। কৃষির ও পশুপালনের সাহায্যে অন্নের সংস্থান দ্বারা সভ্য অর্থাৎ সুগঠিত সমাজে বদ্ধ গ্রাম- ও নগর-বাসী মানুষের প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বেকার ৪০০০।৫০০০ বৎসরের ওদিকে যায় না। মিসরে নীল-নদের উপত্যকা এবং মেসোপোতামিয়ার ফুরাৎ ও দিজ্‌লহ্‌ অর্থাৎ এউফ্রাতেস্‌ ও তিগ্রিস্‌ নদীর অন্তর্বেদি, এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু দ্বারা বিধৌত ভূখণ্ডে—বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার নগর-মন্দির এবং রাজা-পুরোহিত চাষী-শিল্পী বণিক্‌-সৈনিক প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া যে মানব-সভ্যতার আদি পত্তন হয়, তাহার সর্ব-প্রথম যুগের ক্ষেত্র ছিল আফ্রিকা ও এশিয়ার এই তিনটি নদীমাতৃক দেশ। ইহা এখন হইতে ৫০০০ বছরের অনধিক কালের কথা। পরে ঐ তিন নদীমাতৃক দেশ হইতে,

'সভ্যতা' বলিতে যাহা বুঝি তাহা প্রসার লাভ করে; এবং যখন মিসর, মেসোপোতামিয়া, সিরিয়া, এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি Near Fast বা 'অন্তিক-প্রাচ্য' ভূখণ্ডের মানব, সভ্যতার পথে অনেকটা আগুয়াইয়াছে, তখন উত্তর-কালে ভারতে উপনিবিষ্ট আদি-আর্য্য জাতির পূর্ব-পুরুষ ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেরা (এবং ইন্দো-ইউরোপীয়গণের প্রাচীনতর পূর্বজ ইন্দো-হিত্তীগণ) অধ-যাযাবর অবস্থায় রুষ-দেশে উরাল পর্বতের দক্ষিণ অঞ্চলে ইউরেশিয়ার শাদ্বল সমতল ক্ষেত্রে বাস করিত। 'সভ্যতা' বলিতে তাহারা নিজেরা তখনও কিছু-ই গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, বরঞ্চ মেসোপোতামিয়ার লোকেদের নিকট হইতে গো-পালন, অজ-পালন, তাম্র-নির্মিত অস্ত্র এবং সভ্যতার আর কিছু-কিছু অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০।৪০০০ বৎসরের দিক্‌কার কথা। ইহার বহু পরে, যখন এই যাযাবর ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেরা, দক্ষিণে কৌকাসস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া, উত্তর-ইরাকে পঁহুছিল, তথায় তাহারা খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে উপনিবিষ্ট হইয়া বাস করিতে লাগিল, ঐ অঞ্চলে 'আর্য্য'-নাম লইল, এবং তদনন্তর ঈরান-দেশ হইয়া ভারতবর্ষে পঞ্চনদ প্রদেশে প্রথম পদার্পণ করিল—তাহা হইতেছে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-র পরেকার কথা। এই সময়েই প্রাগ্‌বৈদিক আর্য্য সভ্যতার পত্তন হয়, এবং ঋগ্‌বেদে সংগৃহীত সূক্ত বা স্তোত্র অথবা কবিতা রচনার রীতি অধিকাধিক-ভাবে প্রবর্তিত হয়।

বৈদিক সাহিত্যকে—ঋগ্‌বেদকে—অনেকে এক অসম্ভব প্রাচীন যুগে লইয়া যাইতে চাহেন। কেহ-কেহ ইহাকে ভূতাত্ত্বিকগণ দ্বারা নির্ধারিত Pliocene 'বহু-নবীন' ও Miocene 'অল্প-নবীন' যুগের গ্রন্থ বলেন—যে যুগ এখন হইতে কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বেকার, তখন পূর্ণ মানবের উদ্ভব-ই হয় নাই। ৫০,০০০, ৪০,০০০, ৩০,০০০, ২৫,০০০ বৎসরের কথাও কেহ-কেহ বলিয়াছেন। এইরূপ অসম্ভব কল্পনা, মানব-ইতিহাসের আলোচনার ক্ষেত্রের বহির্ভূত। দুই-পাঁচজন কল্পনা করেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৪০০০ বৎসর, বৈদিক যুগ ও সাহিত্যের কাল,—জর্‌মান অধ্যাপক Hermann Jacobi হের্‌মান য়াকোবি এই মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ঋগ্‌বেদের সময় খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ বর্ষ ধরা হইয়া থাকে। মহাভারতের কাহিনী এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঐতিহাসিক আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত;—কিন্তু আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পিছনে

ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই ;—ইহা-ই হইতেছে আধুনিক কালের ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার অভিমত। মহাভারত-কাহিনীর অন্যতম প্রধান পাত্র, এবং আদি মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস, একদিকে যেমন প্রাচীন আর্য্য-ভাষী জনগণের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহাসিক কাহিনী, জগদুৎপত্তি, দেবতা রাজা ও ঋষিদের চরিত্র, বীর-গাথা, রম্য-কাহিনী প্রভৃতি সংগ্রহ করেন ও সেগুলিকে 'পুরাণ' গ্রন্থাবলির অন্তর্ভুক্ত করেন ; তেমনি অন্যদিকে তাঁহার-ই চেষ্টায় আর্য্য-ভাষী ঋষি পুরোহিত বিজ্ঞজন জ্ঞানী ও তপস্বীদের মধ্যে নিবদ্ধ এবং দেবার্চনায় ব্যবহৃত নানা স্তব-স্তোত্র ও অন্য প্রাচীন কবিতা গান প্রভৃতিও সংগৃহীত করেন, এবং সেগুলিকে 'বেদ' নামে তিন (বা চার) মুখ্য রচনা-সম্পুট বা গ্রন্থে বিভক্ত করেন—ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ (এবং অথর্ববেদ)। এবং এই হেতু ঋষি পরাশর ও দাস-রাজকন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নাম হয় 'বেদ-ব্যাস', অর্থাৎ বেদের যিনি সংগ্রথন করেন। সুতরাং ভারতের সর্বজন-গৃহীত প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে, বেদ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়, মহাভারতের যুদ্ধের কালে, মহাভারতের পাত্রপাত্রীদের সময়ে।

এ দেশে একটি ধারণা প্রচলিত—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩১০১ বর্ষে কলিযুগের আরম্ভ হয়, দ্বাপরের শেষে। ওদিকে আবার প্রাচীন ধারণা অনুসারে দ্বাপর যুগের অন্তভাগে, কলির পূর্বেই, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ ঘটে। সুতরাং এই মতে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩১০০ বা ৩২০০, মহাভারত-ঘটনার তথা বেদ-ব্যাস ঋষির এবং ঋগ্‌বেদাদির সংকলনের কাল। কিন্তু এই বিষয়ে বিচার-কালে আমাদের পূর্বে উল্লিখিত প্রথম প্রতিজ্ঞাটি মনে রাখিতে হইবে। পৃথিবীর ইতিহাসের পটভূমিকায় আর্য্য-জাতির কোনও শাখার পক্ষে এত প্রাচীন তারিখ গ্রহণযোগ্য নহে।

সূক্ষ্ম আলোচনায় না গিয়া, বেদের রচনা-কাল ও সংকলন-কাল সম্বন্ধে যে মত, ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যুক্তিতর্ক-অনুসারী বলিয়া মনে করি, তাহা-ই সংক্ষেপে এখানে বলিতেছি। নৃতত্ত্ব, বাকৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, বিশ্বেতিহাস—এই-সমস্ত আধুনিক বিদ্যা বা বিজ্ঞানের অনুমোদিত এই মতবাদ। ইংরেজ ভারতবিদ্যাবিদ্‌ F. E. Pargiter এফ. ঈ. পার্জিটর, কেবল পুরাণ-সমূহে লিপিবদ্ধ প্রাচীন ভারতের রাজবংশ ও রাজাদের তালিকা অবলম্বন করিয়া, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও

উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির মধ্যে নিহিত এই রাজাদের সম্বন্ধে উল্লেখ এবং প্রাচীন গুরু-পরম্পরা প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, এই নিষ্কর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন যে, মহাভারতের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সময় হইতেছে খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৯৫০—অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের মধ্যভাগে। ওদিকে ভারতীয় গবেষক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, পুরাণের বংশ-পরম্পরাকে অনৈতিহাসিক ও বহুশঃ পুরাণ-সংগ্রাহকদের স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া, কেবল অর্বাচীন বৈদিক শাস্ত্রে (ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে) রাজবংশ ও রাজা ঋষি ও ঋষি-পরম্পরার উল্লেখকে-ই মুখ্যতঃ আশ্রয় করিয়া, এই এক-ই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের ব্যাপার। পরস্পর-বিরোধী দুইটি বিচারের সমাধান এক-ই সিদ্ধান্তে মিলিত হইয়াছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস ও কৃষ্ণ বাসুদেব বাষ্ণেয়, এই দুই মহাপুরুষের জীবৎকাল রূপে পার্জিটর ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রস্তাবিত খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের মধ্য-ভাগ, জৈন ঐতিহ্য-দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। L. D. Barnett এল্. ডি. বার্নেট দেখাইয়াছেন যে, জৈন ইতিকথা অনুসারে চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী (বুদ্ধদেবের সমসাময়িক, খ্রীঃ-পূঃ ৫০০) ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের ২০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হন, এবং পার্শ্বনাথের প্রায় ২০০।২৫০ বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ প্রায় ৯৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে) জীবিত ছিলেন দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথ। জৈন-মতে ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-মতে ইনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র। ভাগবত পুরাণে ইঁহার বিশেষ উল্লেখ আছে, এবং ইঁহার উল্লেখ-প্রসঙ্গে জৈন-দর্শনের ‘কেবলী’ শব্দের ব্যবহার আছে। শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভারতের কাল যে দশম খ্রীষ্ট-পূর্ব শতকের মধ্যভাগে, তাহা জৈন আচার্য্যগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমির কালনির্ণয় দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে।

ঋগ্‌বেদের কাল সম্বন্ধে এই যে স্থাপনা করা হইয়াছে, বাক্‌তত্ত্ব বা তুলনাত্মক-ভাষা-তত্ত্ব এবং প্রত্নতত্ত্বের দ্বারাও তাহা সমর্থিত হয়। ঈরানের প্রাচীন আর্য্য ভাষা দুইটি মুখ্য বিভাষায় পাওয়া যায়—(১) অবেস্তার ভাষা, (২) প্রাচীন পারসীক ভাষা। এই দুইটিকেই বৈদিক সংস্কৃতের আপন সহোদরা বলা যায়, এই দুইটি ভাষাতে উপলব্ধ রচনা ও বৈদিক ভাষায় প্রাপ্ত রচনার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অবেস্তার প্রাচীনতম অংশ হইতেছে

ঋষি জরথুশ্‌ত্র অর্থাৎ জরদুষ্ট্রের রচিত 'গাথা' অংশ—ইহার রচনাকাল খ্রীঃ-পূঃ ৬০০-র দিকে; এবং প্রাচীন পারসীকের নিদর্শন ঈরানের Achaemenian বা হখামনীষীয় সম্রাটদের উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায়, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫৫০ হইতে এই লিপিসমূহ উৎকীর্ণ হয়। ঋগ্‌বেদের ভাষা এবং প্রাচীন পারসীক ও অবেস্তা ভাষার মধ্যে মাত্র ৩।৪ শত বৎসরের ব্যবধান থাকিতে পারে—তাহার অধিক নহে। ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বেদের সংকলন-কাল, এবং ৬০০-৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে অবেস্তার গাথা অংশ ও প্রাচীন পারসীক লেখের কাল,—ইহাতে ভাষার দিক্ হইতে বেশ সামঞ্জস্য হয়। বেদকে ২০০০-৪০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে লইয়া গেলে, এ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। সুতরাং বাক্‌তত্ত্বের হিসাবে ঋগ্‌বেদ—শেষপর্ব ১০০০-৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ, অবেস্তার প্রাচীন অংশ ৬০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ—বেশ মিল খায়।

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন যদি খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের কোনও সময়ে ঋগ্‌বেদাদি বেদ সংকলন দ্বারা 'বেদ-ব্যাস' আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সময়কে বেদ-সংহিতা সাহিত্যের *terminus ad quem* অর্থাৎ 'উত্তর-সীমা' বা 'অন্ত্য বা শেষ অবধি' বলা যাইতে পারে। যদিও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতক বেদ-ব্যাসের সময়ের পরেও বেদ-সংহিতা ছিল open book, বা 'খোলা পুস্তক', অর্থাৎ ইহাতে 'খিল' বা পরিশিষ্ট-রূপে ও অন্যভাবে কিছু-কিছু পরবর্তী রচনা সংযোজনার দ্বার অবারিত ছিল, বেদ-সাহিত্য এখনকার মতো closed book বা পূর্ণ ও সংবদ্ধ রুদ্ধদ্বার পুস্তক হয় নাই। বেদের অন্তিম অবধি দশম খ্রীষ্ট-পূর্ব শতক হইলে, *terminus a quo* অর্থাৎ 'প্রারম্ভিক অবধি' অর্থাৎ বেদ-রচনার আরম্ভকাল কত পূর্বের? ঋগ্‌বেদের ১০১৮টি সূক্ত, তদ্রূপ অথর্ববেদের ৭৩০টি সূক্ত, সবগুলিই এক পুরুষে বা এক-ই কালে রচিত হয় নাই। অন্ততঃ কয়েক শত বৎসরে ৮।১০ পুরুষ ধরিয়া বেদের মধ্যে সংগৃহীত সূক্তগুলি রচিত হইয়া আসিতেছিল, পরে সেগুলি একত্র গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয়, এইরূপ অনুমানের পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। পৃথিবীর অন্য দেশে, এবং ভারতবর্ষে-ও, একটি জাতির মধ্যে প্রচলিত কবিতা, স্তোত্র, গান, পদ, ছড়া প্রভৃতি এই ভাবে-ই একাধিক যুগের সাহিত্য-সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া থাকে।

ঋগ্‌বেদে ও অন্য বেদ-সংহিতায় যে ভাষা পাই, তাহার পাণিনি-প্রোক্ত প্রাচীন নাম হইতেছে 'ছান্দস', এবং সাধারণতঃ আমরা এই ভাষাকে 'বৈদিক সংস্কৃত' বলিয়া থাকি। ইহা আমাদের সাধারণ সংস্কৃত—'লৌকিক সংস্কৃত' হইতে বহু বিষয়ে পৃথক্। ইহার ব্যাকরণ লৌকিক সংস্কৃতের অপেক্ষা পূর্ণতর, এবং ইহার সাধারণ শব্দাবলী বহুশঃ প্রচলিত সংস্কৃতের শব্দাবলীর সহিত মিলে না। ইহা হইতেছে সংস্কৃতের আদি বা প্রাথমিক ভারতীয় রূপ। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কর্তৃক খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকে যখন বেদ প্রথম সংকলিত হয়, ইহা মুখ্যতঃ সেই সময়ের প্রচলিত ও জনসাধারণের পক্ষে বোধগম্য ভাষাই ছিল। তবে সংকলনের সময়ের পূর্বে—এমন-কি বহু পূর্বে—ঋগ্‌বেদের বহু সূক্ত রচিত হওয়ার সম্ভাবনা বিচার করিলে, সেই-সমস্ত প্রাচীন সূক্তের ভাষা অনেক স্থলে হয়-তো বেদ-ব্যাসের যুগে-ও সকলের বোধগম্য ছিল না। বাঙ্গালা বৈষ্ণব মহাজনপদের সংগ্রহে যেমন। আদি চণ্ডীদাস কবি এখন হইতে খুব সম্ভব ৫৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার রচিত বলিয়া আমাদের মধ্যে এখন পঠিত ও গীত প্রায় তাবৎ পদ, ব্যাকরণে ও শব্দাবলীতে আমাদের আধুনিক বাঙ্গালার মতোই লাগিবে। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিচার ও গবেষণার সাহায্য লইয়া চণ্ডীদাসের ভাষার আলোচনা করিলে, এবং প্রাচীন পুঁথির পাঠের খুঁটিনাটি বিচার করিয়া চণ্ডীদাসের সময়ের ভাষার প্রকৃতি উদ্ধার করিয়া, বস্তুটিকে দেখিলে, অধুনা-প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকে লব্ধ বা গায়কের মুখে শ্রুত চণ্ডীদাসের সেই সহজবোধ্য আধুনিক বাঙ্গালার ঢঙ্গের পদ একটু অন্য ধরনের লাগিবে, ক্বচিৎ বা বোধগম্যই হইবে না। ঋগ্‌বেদের কোনও সূক্ত যদি খ্রীষ্ট-পূর্ব ১২০০ বা ১৩০০ বা ১৪০০-র দিকে রচিত হইয়া থাকে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৯৫০-এর দিকে প্রচলিত ভাষার সহিত তাহা অভিন্ন হইতে পারে না। তাহা কিছুটা পৃথক্ নিশ্চয়-ই ছিল। আধুনিক তুলনাত্মক বাক্‌তত্ত্বের সাহায্যে সেই পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে দুইটি ছত্র দিয়া, কি-ভাবে ভাষার বিবর্তন হয় তাহা দেখাইবার প্রয়াস অন্যত্র করিয়াছি। প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া, নিম্নে ভাষা-সরণি ধরিয়া বঙ্গভাষার সেই বিকাশ-পথ এক্ষেত্রে পুনরায় প্রদর্শিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের রচিত ছত্র দুইটি এই—

'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে যেন মনে হয়—চিনি উহারে।'

এই ছত্র দুইটি -আধুনিক কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় লিখিত হইলেও, ইহার দুইটি শব্দ হইতেছে সাহিত্যিক, একেবারে কথ্য ভাষার নহে—'তরী', এটি সংস্কৃত হইতে গৃহীত তৎসম শব্দ, এবং 'উহারে', ইহা মধ্য-যুগের পুরাতন বাঙ্গালার রূপ, কলিকাতার ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ 'ওকে', অন্যত্র ইহার প্রতিরূপ 'ওরে'। 'তরী'র স্থলে নৌকা-অর্থে এখনকার প্রচলিত রূপ 'না'-শব্দ (নৌ—নাব—নাও—না), ও 'উহারে'-স্থলে 'ওরে'-শব্দ বসাইয়া, ছত্র দুইটিকে এইভাবে সম্পূর্ণ-রূপে আধুনিক মৌখিক বাঙ্গালা ভাষায় পরিবর্তিত করা যায়—

আধুনিক বাঙ্গালা (খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৫) :

গান্ গেয়ে না বেয়ে কে আসে [=আশে] পারে ;
দেখে যেন [=জ্যানো] মনে হয়, চিনি ওরে ॥

পর-পর ছত্র দুইটির প্রাচীনতর রূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালা বা গৌড়ীয় ভাষা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ) :

গান্ গায়্যা (গাইহ্যা) নাও বায়্যা (বাইহ্যা) কে
আশ্যে (আইশে) পারে ;
দেখ্যা (দেইখ্যা) জেন্অ (জেন্হ, জেহেন) মনে
হোএ, চিনী (চিন্হী, চিন্হীয়ে) ওআরে (ওহারে) ॥

প্রাচীন গৌড়ীয় (আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ) :

গাণ গাহিআ নাৱ বাহিআ কে আইশই পারহি ;
দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই,
চিণ্হিঅই ওহারহি ॥

মাগধী-অপভ্রংশ (আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ) :

গাণঁ গাহিঅ নাৱঁ বাহিঅ কই (কি) আরিশই
পারহি (পালহি) ;
দেক্খিঅ জইহণঁ (জইশণঁ) মণহি হোই,
চিণ্হিঅই ওহঅরহি (ওহঅলহি) ॥

মাগধী-প্রাকৃত (আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ) :

গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নাৱং ৱাহিঅ (ৱাহিত্তা)
কগে (কএ বা কে) আৱিশদি পালধি (পালে) ;
দেক্খিঅ (দেক্খিত্তা) যাদিশণং মণধি হোদি (ভোদি),
চিণ্হিঅদি অমুশ্শ-কলধি (=অমুশ্শ-কদে) ॥

আদি-যুগের প্রাচ্য-প্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) :

গানং গাথেত্বা নারং রাহেত্বা ককে (কে) আরিশতি
পালধি (পালে) ;
দেক্‌খিত্বা য়াদিশং (য়াদিশনং) মনধি (মনশি)
হোতি (ভোতি), চিণ্‌হিয়তি অমুশ্‌শ-কলধি (বা
কতে) ॥

মৌখিক বৈদিকের রূপ-ভেদ (আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ পূঃ) :

গানং গাথয়িত্বা নারং রাহয়িত্বা ককঃ (=কঃ)
আরিশতি পালধি বা পারধি (=পারে) ;
দৃক্ষিত্বা (=দৃষ্ট্বা) যাদৃশম্‌ মনোধি (মনসি) ভবতি,
চিহ্ন্যতে অমুষ্য-কলধি বা করধি (=কতে)
(=অসৌ অস্মাভির্‌ চিহ্ন্যতে, যদ্বা জ্ঞায়তে) ॥

ঋগ্‌বেদের ভাষা ও তাহার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাদের জানা চাই। এতদিন পর্য্যন্ত, কি ভারতের বাহিরে আর কি ভারতে, আধুনিক-মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে ঋগ্‌বেদের ভাষা 'বৈদিক সংস্কৃত' পৃথিবীর তাবৎ 'আর্য্য' অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হোমেরের কাব্যগুলির ভাষা ৮৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের ওদিকের নহে। প্রাচীন লাতীন ভাষা ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের এদিককার। অবেস্তা ও প্রাচীন পারসীকের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জর্‌মানিক ভাষা গথিক, কেল্‌টিক ভাষা প্রাচীন-আইরিশ, বাল্টিক ভাষা লিথুআনীয়, প্রাচীন-স্লাব ভাষা, তোখারীয়, আর্মেনীয়, আল্‌বানীয়—এ-সব ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন খ্রীষ্টোত্তর যুগের। সুতরাং খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০—১২০০-এর বৈদিক, আর্য্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের মধ্যে, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সম্মান পাইত। কিন্তু কতকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে এই প্রাচীনতার গৌরব আর টিঁকে না। প্রথম, ১৯০৩ সালে মেসোপোতামিয়াতে Mitanni মিতান্নি আর্য্য ভাষা আবিষ্কৃত হইল—এই ভাষা প্রাগ্‌-বৈদিক, ইহার চেহারা দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়। তারপরে ১৯১৭ সালে এশিয়া মাইনরে Kanisian কানিশীয় বা Hittite হিত্তী ভাষা বাহির হইল, পঠিত হইল। ইহাও বেদ-পূর্ব যুগের—খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০।১৪০০-র দিকের। এবং সর্বশেষ, সম্প্রতি গত দশ বৎসরের মধ্যে দুইজন ইংরেজ গ্রীকবিদ্যাবিৎ প্রত্নতাত্ত্বিক Michael

Ventris মাইকেল ভেন্ট্রিস্ ও John Chadwick জন চ্যাড্উইক, প্রাচীন গ্রীসে প্রাপ্ত অজ্ঞাত একটি বর্ণমালায় উৎকীর্ণ কতকগুলি লেখ, যাহার পাঠোদ্ধার কেহ-ই এতাবৎ করিতে পারেন নাই, সেগুলির যথাযথ পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এবং তাঁহারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এই-সকল লেখের ভাষা হইতেছে এক অতি প্রাচীন ধরনের গ্রীক, হোমেরের কাব্যের ভাষা হইতেও বহু প্রাচীন; এবং এই পাঠের ফলে, এই লেখগুলিকে অবলম্বন করিয়া গ্রীক ভাষার নিদর্শন ৮৫০ খ্রীষ্ট-পূর্ব হইতে ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে নীত হইল। এবং গতিকে এখন এই সুপ্রাচীন গ্রীককেই বৈদিক অপেক্ষা প্রাচীনতর ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে এই প্রকারের অনপেক্ষিত ব্যাপার আমাদের সমক্ষে এখন উদ্ঘাটিত হইতেছে।

ইহার পূর্বে, ঋগ্বেদের আগে, ভাষার যে-যে অবস্থা বা স্তর ছিল, সেই প্রাক্-বৈদিক অবস্থা বা স্তরগুলিকেও আমরা প্রাচীন ঈরানীয়, গ্রীক, লাতীন, কেল্টিক, বাল্টিক, স্লাব, এবং জরমানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠিত করিতে পারি।

এইভাবে, ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক্—'অগ্নিমীডে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥' যখন ঋগ্বেদ-গ্রন্থে মহর্ষি বেদ-ব্যাস কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তাহার ভাষার চেহারা যাহা ছিল, প্রচলিত পাঠে তাহার অনেকটাই রক্ষিত হইয়া আছে। তবে বৈদিক কালের মতো উচ্চারণ আমরা করি না, আমাদের পক্ষে করা সাধারণতঃ সম্ভবপরও নহে। নীচে রোমান লিপিতে, এখনকার প্রচলিত উচ্চারণ, এবং বৈদিক যুগের উচ্চারণ দেখাইবার প্রয়াস করা যাইতেছে—

agnim īḷē (=iḍē) purōhitaṁ /
yajñasya dēvam ṛtvijam /
hōtāraṁ ratna-dhātamam //

বৈদিক যুগের উচ্চারণ কতকগুলি বিষয়ে আজকালকার সংস্কৃত উচ্চারণের তুলনায় পৃথক্ ছিল। হ্রস্ব-'অ' ছিল, বিবৃত-'অ'= 'আ'-এর মতো; অর্থাৎ আজ-কালকার হিন্দীর মতো সংবৃত-'অ', অথবা বাঙ্গালা উড়িয়া অসমিয়ার মতো বর্তুল-'অ' নহে; চ-বর্গের উচ্চারণ ছিল 'ক্য, গ্য'-র মতো; ত-বর্গ ছিল দন্তমূলীয়, ঠিক দন্ত্য নহে—ইংরেজি জর্মান জাপানি অসমিয়া প্রভৃতি ভাষার *t*, *d*-র মতো,—Italic ছাঁদের *t*, *d* লিখিয়া এই দন্তমূলীয় উচ্চারণ

নির্দেশ করা যাইতেছে ; 'এ, ও'-র উচ্চারণ ছিল হ্রস্ব সন্ধ্যক্ষর 'অই, অউ' ; 'ঐ, ঔ'-এর উচ্চারণ ছিল দীর্ঘ সন্ধ্যক্ষর 'আই, আউ'। তদনুসারে, বৈদিক ধরনে পাঠ হইবে—

agnim īḷai purauhitaṁ (বা puraudhitaṁ) /
yag'ñasya *d*aiwam ṛtwig'am /
hau*t*āraṁ ra*t*na-*d*hā*t*amam //

৯৫০-এর দিকে সংগৃহীত এই ঋকের দ্রষ্টা বা রচয়িতা ঋষি মধুচ্ছন্দাঃ যদি খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৩০০ বা ১৪০০-র মানুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার সময়ের ভাষায় (তুলনাত্মক বাক্‌তত্ত্বের দ্বারা যাহার পুনর্গঠন সম্ভবপর হইয়াছে) ঋক্‌টি কতকটা এই ধরণের ছিল বলিয়া অনুমিত হয়—

agnim iz*d*ai purаz*d*hi*t*aṁ /
yaz'ñasya *d*aiwam ṛtwig'am /
z'hau*t*āraṁ ra*t*na-*d*hā*t*amam //

বেদ-ব্যাসের দ্বারা উপলব্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের রূপটি, যথা :—

তৎ সবিতুর্ বরেণ্যম্,
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্র চোদয়াৎ ॥

tat savitur varēṇyam /
bhargō dēvasya dhīmahi /
dhiyō yō naḥ pra cōdayāt //

ইহার বৈদিক উচ্চারণ কতকটা এইরকমের ছিল—

***t*at sawitur warainiam /**
bhargau *d*aiwasya *d*hīma(*d*)hi /
***d*hiyau yau naḥ pra k'au*d*ayāt //**

এই গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা বা রচয়িতা বিশ্বামিত্র ঋষি ১৪০০ বা ১৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মানুষ হইলে, ইহার মূল রূপটি এই ধরনের ছিল বলিয়া অনুমিত হয়—

***t*at sawitṛz warainiam /**
bhargaz *d*aiwasya *d*hīmadhi/
***d*hiyaz yaz nas prá k'au*d*ayāt //**

মানুষের ভাষা অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রগুলিকে, অতি সহজ ভাবেই এবং সার্থক ভাবে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের বিষয়ীভূত

করা চলে। মূল কথা হইতেছে, আমাদিগকে অপৌরুষেয়তা-বাদের উর্ধ্বে উঠিয়া, অন্য সমস্ত ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থের মতো ঋগ্‌বেদকে-ও মানুষের রচনা বলিয়া বিচার করিতে হইবে—সে রচনার মধ্যে যতই সত্য, শক্তি, সৌন্দর্য্য, আধ্যাত্মিকতা, বিশ্বাতিগতা থাকুক না কেন।

ঋগ্‌বেদকে কি চক্ষে দেখিব? বহু পুর্বে, বাঙ্গালা ১২৮৪ সনে (ইংরেজি ১৮৭৭ সালে) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শাস্ত্রী-মহাশয়ের মতো প্রাচীন-পন্থী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ বিষয়ে যে আশ্চর্য্য সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় ৮৮ বৎসর পুর্বে দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার এই প্রবন্ধের মূল্য বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক, এমন কি আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্ষেত্রে অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুরাণের ও ভক্তিবাদের পুষ্পপত্র-স্তূপের ভিতর হইতে মানব শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণ-চরিত্র' গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ) যে সার্থক চেষ্টা করেন, ইহা তাহারই সমশ্রেণিক। ('হরপ্রসাদ-রচনাবলী', দ্বিতীয় সম্ভার, ঈস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি, কলিকাতা ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৮৯-৩৯৮ দ্রষ্টব্য)। এই মূল্যবান্ প্রবন্ধ হইতে কতকটা অংশ বহুল-ভাবেই উদ্ধার করিয়া দিতেছি।—

> বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে ভয়ভক্তি-সম্বলিত কেমন একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। বেদ যে পড়িল, সে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ—যে বেদ ব্যাখ্যা করিল, সে শঙ্কর বা নারায়ণের অবতার। বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়কেই পবিত্র করিয়া পড়িতে হইবে। যে বেদ পড়িল, সে মন্ত্রবলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন, অমনি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টির পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে মন্ত্র পড়িলাম, দিল্লীতে আমার শত্রু-নিপাত হইল। বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব মোচন বেদমন্ত্রে হয়, রোগী আরোগ্য হয়, নির্ধনের ধন হয়, লোকে মৃত্যুমুখ হইতে মন্ত্রবলে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কোন প্রমাণ দিতে হইলে 'বেদের বচন' বলিলেই আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি নাই। এইরূপ অজ্ঞলোকের সংস্কার, বেদ মোহিনীময়, উহা দ্বারা অসাধ্য-সাধন হয়, কিন্তু উহা দুর্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য।

সরস্বতীর বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে, পূর্বজন্মের বিশেষ পুণ্যবল না থাকিলে, বেদ কাহারও আয়ত্ত হইবার নহে।

কিন্তু বাস্তবিক বেদ কি জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান আদির সংগ্রহ মাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভরসা করি যাঁহারা কেবল সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মার প্রণীত, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন। প্যালগ্রেভ্‌স্ গোল্ডেন ট্রেজারী অব সংস্ এণ্ড্ লিরিক্‌স্ [Palgrave's *Golden Treasury of the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language* *] হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই। পূর্বোক্ত ইংরেজি গ্রন্থও ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কবিতা ও গানের সংগ্রহ মাত্র। অনেক ঋষি-প্রণীত সূক্ত বেদে গ্রথিত আছে। যদি গোল্ডেন ট্রেজারীর সহিত তুলনা করিতে কষ্টবোধ হয়, স্কান্দিনেভীয় 'সাগা' সংগ্রহের সহিত ঠিক তুলনা হইবে। আজি লডব্রক ভূগর্ভস্থ কারাগৃহে শক্রপুরী-মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার এক সাগা মৃত্যুগীত বহিল; কালি মার্টিন যুদ্ধে জয়ী হইল, আর এক সাগা হইল। এইরূপ সাগা† একত্র সংগ্রহ করিলে যাহা হয়, বেদও প্রায় সেইরূপ; কিন্তু সাগা-সংগ্রহ হইতে বেদের আদর-গত এত তারতম্য কেন? গীত-সংগ্রহ গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্মের উপর এত আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত মাথা-ব্যথা কেন?

প্রধান কারণ, বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় সময়-তালিকাকারদিগের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষীয় সময়-তালিকাকারগণ-কৃত সময়-নির্দেশ ভ্রমাত্মক। আমরা যাহাকে বহু বৎসরের পুরাণ বলি, তাঁহারা উহাকে ১৫০০ বৎসরের বলিতে চান। আমরা বেদ-সংগ্রহকে

* প্রথম প্রকাশিত, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

†স্কান্দিনেভীয় Saga 'সাগা'কে বেদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না—সাগা-গ্রন্থগুলি গদ্যে নিবদ্ধ ইতিবৃত্ত বা পুরাণ-কথা মাত্র। শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবতঃ স্কান্দিনেভীয় Edda 'এদ্দা' গ্রন্থের কথা ভাবিতেছেন—এই Edda সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৪৯৭৭ বৎসরের পুরাণ বলিতে চাই; উঁহারা বলেন, যীশু খ্রীষ্টের পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদ সংগ্রহ হয়। তাহাই স্বীকার, তথাপি বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ। বাইবেল উহা হইতে নূতন। যদি-ই তুরানীয় বা অন্য জাতীয় অন্য কোন প্রাচীনতম গ্রন্থ থাকে, তবে তাহা অপেক্ষাও আর্য্যজাতির বেদ যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর এক কথা এই যে, যে কালে বেদ রচনা হয়, সেকালের কথা জানিতে হইলে আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই, অথচ মানব-জাতির বাল্যাবস্থার ভাব কি ছিল জানিবার জন্য লোকের বড়ই ঔৎসুক্য। সুতরাং বেদ ভাল করিয়া পড়া আবশ্যক। মনে করুন, ৩০০০ বৎসর পরে ইংরেজদিগের সকল পুস্তক নষ্ট হইয়া গেল, কেবল গোল্ডেন ট্রেজারী রহিল। তখন গোল্ডেন ট্রেজারীর-ও এইরূপ মান হইবার সম্ভাবনা, কারণ, উহা ভিন্ন ইংরেজ জাতির চিন্তাশক্তি, কবিত্বশক্তি, সমাজ-প্রণালী ইত্যাদি জানিবার আর উপায় থাকিল না।

ইতিহাস-লেখক ও প্রত্নতত্ত্ব-ব্যবসায়িগণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেদের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য মাত্র দেখিবেন। কিন্তু যিনি কবি, তিনি দেখিবেন, বেদের তুল্য কাব্য জগতে আর নাই। বেদ হোমরের একখানি মহাকাব্য মত নহে, কিন্তু বেদের এক একটি সূক্ত এক একখানি মহাকাব্য। মানব-জাতির তখন শৈশব-কাল; বাহ্যজগতে এখন তাহাদিগের যেরূপ অসীম আধিপত্য জন্মিয়াছে, তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। তখন অগ্নি বায়ু মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বাত্যা সকলেই দেবতা। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি নহে, অগ্নি-ই দেবতা। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সম্বন্ধে সংস্কার জন্মিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন। শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন, সকলই উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। কবির চক্ষে দেখিতেন। অথচ হোমরের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনায় যে জ্ঞান, যে পরিশ্রম, অন্তর্জগতের উপর যে আধিপত্য প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কেবল হৃদয়ের গভীর ভাব ভয় ভক্তি স্নেহ আশঙ্কা আশা ভরসা ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাঁহারা কিরূপে করিয়াছেন?

সে ভাব প্রকাশে চাতুরী নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই। কোন ভাব ভয় কি ভক্তি মনে উদয় মাত্রেই তাহা সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়াছে, আর অমনি তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সে বাক্য সরল, প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্; ভাবও সরল প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্; অলংকারের দোষ, পরিচ্ছেদের ভয় নাই, সুরুচি কুরুচি চিন্তা নাই, আর পাঁচজনকে ভুলাইবার জন্য ভাব প্রকাশের চাতুরী নাই। তাঁহাদের ভাষা ও ভাব এক, এবং একরূপ মহত্ত্বসম্পন্ন। বেদের সূক্ত অধ্যয়নকালে হৃদয়ের সম্প্রসারণ হয়, প্রকাণ্ড সুন্দর ও নূতন পদার্থ পর্য্যালোচনায় কল্পনার আমোদ, কল্পনার বিকাশ ও কল্পনার উৎকর্ষ হয়। সেকালে তাঁহারা যাহাই দেখিতেন, তাহাই তাঁহাদের কাছে প্রকাণ্ড, তাহাই সুন্দর ও তাহাই নূতন। আমরা আজি হিমালয় পর্বত দেখিয়া যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া আনন্দিত হই, তাঁহারা সামান্য পবতমালা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে আনন্দিত হইতেন। সময়ে সময়ে সামাজিক বন্ধন ভয়ে আমরা মনের ভাব ফুটিয়া বলিতে পাই না, তাঁহারা সেইভাবে শতগুণে অধিকতর গভীর ও সহজ ভাষায় বলিতেন। যে বিস্ময় কবি-হৃদয়ের সর্বব্যাপী ভাব, তাঁহারা সেই বিস্ময়ময় ছিলেন, তাহাতেই কবি ছিলেন; আধুনিক কবিরা তাঁহাদের তুলনায় নীরস বিষয়ী লোক।

বেদের ধর্মগ্রন্থত্ব সম্বন্ধেই অধিক আদর, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা এইজন্য বেদ পড়েন। যে হিন্দুরা এতকাল যে বেদকে ধর্মপুস্তক বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে, সে বেদ কি? লক্ষ লক্ষ লোক যে গ্রন্থকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সে গ্রন্থ কি? আমাদের এখন দেখান চাই যে, কতকগুলি গান ও কবিতা কিরূপে ধর্মগ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে হইলে 'সেকেলে লোক নির্বোধ ছিল' বলিয়া চুপ করিয়া থাকা নির্বোধের কার্য্য। বাস্তবিক, উহাতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি গূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। যাঁহারা ঐ গান লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা কোন স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে, লেখকেরা ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। তুমি কবি, আমি অকবি, দুইজনেই একত্র থাকি, একত্র বাস করি। তুমি কল্পনা-বলে জগৎ-সংসার কত সুন্দর দেখ; আমি অকবি, মাটীকে মাটীই দেখি, আকাশকে আকাশই দেখি। তোমায় আমায়

এই প্রভেদ। আমরা জানি যে, আমাদের দুইজনেরই মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র। কিন্তু সেকালের লোক তাহা জানিত না। কবি যখন গান করিতেন, অন্য অবস্থায় তাঁহার অন্তরের যেমন ভাব থাকে, তখন তাহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্বেলিত হইতে দেখিতেন। কেন হইল? যেমন সর্বত্র কবিরা দেবতা দেখিতেন, এখানেও সেইরূপ দেবতা দেখিলেন; বলিলেন, দেবতা আমায় প্রণোদন করিয়াছেন। অন্য লোকেও দেখিল, আমরা যাহা পারি না, এ পারে কেন,—অবশ্য এ দেবতা সহায় পাইয়াছে।

এই যে মনের চঞ্চলতা, ইহাকেই সাহেবেরা inspiration বলেন। পরে কবির নাম লোপ হইতে লাগিল, কবি যে দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন, সেই দেবতাই বেদ-রচক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দেবতাই রচক, কবি কেবল দেখিলেন মাত্র। এই জন্য মাধবাচার্য্য লিখিলেন, যিনি মন্ত্র দেখিলেন, তিনিই ঋষি। ঋষ্ ধাতুর অর্থ, দর্শন। এই জন্যই কালিদাসের 'মন্ত্রকৃতাং' লেখা দেখিয়া ভবভূতি যেন চটিয়াই লিখিলেন, 'মন্ত্রকৃতাং' নহে, 'মন্ত্রদৃশাং'। ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান মত দাঁড়াইল, দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই; উহা সত্যময়, ধর্মময়, জ্ঞানময়। এইরূপে কতকগুলি গান ধর্মপুস্তক-রূপে পরিণত হইল।

উপরে উদ্ধৃত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বেদ-সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টি-ভঙ্গী, ইহা হইতেছে আধুনিক বিচারশীল মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গী, এবং ইহা-ই ছিল বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদের প্রথম অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্তের দৃষ্টি-ভঙ্গী। ইহাতে বিশ্ব-সাহিত্যে বেদের যথার্থ স্থান কি প্রকারের, তাহার বিচার আছে, এবং বেদ-সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীলতা-ও আছে। একটি সমগ্র প্রাচীন জাতির মানুষের বহু পুরুষ ধরিয়া সাহিত্যিক বা কবিত্বময় আত্মপ্রকাশ, এই হিসাবে বেদের সহিত তুলিত হইতে পারে এমন কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কোনও দেশে, বিশেষ কোনও কালে, সেই দেশের জনসমাজে নিবদ্ধ, সাধারণ্যে প্রচলিত স্তোত্র, গীতি-কবিতা, গাথা প্রভৃতির সংগ্রহ বলিয়া বেদকে অভিহিত করায়, আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন-পন্থী পণ্ডিত

ব্যাপারটি বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহারা কোনও কোনও স্থলে আক্ষেপের সহিত কটূক্তি করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য বেদানুশীলক পণ্ডিতগণ বেদের অপৌরুষেয়তা ও ইহার পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা ধরিতে না পারিয়া, বেদকে 'চাষার গান' বলিয়া, অবহেলার সহিত উল্লিখিত করিয়াছেন। যাঁহারা বেদকে 'মানবী বিদ্যা' বলিতে দ্বিধা করেন না, এমন আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতদেরও প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা সীমিত ভাষা-নিবদ্ধ রচনা-সম্পুট বলিয়া, কৃষিজীবী আর্য্য জাতির সাহিত্য বলিলে বেদের কোনও নিন্দা বা অমর্য্যাদা করা হয় না।

বেদের—বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদের—বিশ্লেষাত্মক আলোচনা—ইহার সূচী-নির্ঘণ্ট—এই প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভবপর হইবে না। এ বিষয়ে অন্য পুস্তক ইংরেজি ও বাঙ্গালায় যথেষ্ট মিলিবে। (সহজলভ্য একখানি বাঙ্গালা পুস্তকের উল্লেখ করা যায়—শ্রী'অনির্বাণ'-রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা', কলিকাতা গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত।) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঋগ্‌বেদ-কে কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক বলিয়া 'পল্‌গ্রেভস্‌ গোল্ডেন ট্রেজারি অব সংস্‌ এণ্ড লিরিক্‌স্‌' নামে বিখ্যাত ইংরেজি কবিতা-সংগ্রহের সহিত তুলিত করিয়াছেন। উভয়-ই এক পর্য্যায়ের পুস্তক; তবে ঋগ্‌বেদ হইতেছে হিমালয়, আর ঋগ্‌বেদের সমক্ষে 'গোল্ডেন ট্রেজারি' হইতেছে সামান্য একটি 'ডুংরি' বা ছোটো পাহাড় মাত্র। উভয় গ্রন্থের জাতি এক, আকার-প্রকার পৃথক্‌। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন যুগে উদ্ভূত, ঋগ্‌বেদের অনুরূপ কয়েকটি প্রধান কবিতা-সংগ্রহের গ্রন্থের উল্লেখ ধরা যাইতেছে।—

(১) *Shi-King* 'শী-কিঙ' বা *Shih-Ching* 'শ্রুঃ-চিঙ', প্রাচীন চীনের লোক-কবিতা-সংগ্রহ, মনীষী Confucius কনফুশিয়স্‌ বা K'ung Fu-Tse খুঙ্‌ ফূ-ৎসে কর্তৃক খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ ৫০০-এর দিকে সংকলিত। কবিতাগুলির সংখ্যা ৩০৫ বা ৩১১। সামাজিক, রাজনীতিক, পারিবারিক, ও ব্যক্তিগত জীবনের কবিতা—ধর্ম ও দেবতা বিষয়ক কবিতা অতি অল্প, সংখ্যায় নগণ্য। কম্যুনিস্ট যুগ পর্য্যন্ত চীন-দেশে এই গ্রন্থ অন্যতম ধর্মগ্রন্থ এবং রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মূল্যায়ন অনুসরণ করিয়া, শ্রেষ্ঠ লোক-গীতি ও লোক-জীবনের পুস্তক বলিয়া এই বই নূতন-ভাবে সমাদর লাভ করিতেছে।

(২) Old Testament বা হিব্রু ধর্মগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র সংগ্রহ *Sepher Tehellim* 'সেফের্ তেহেল্লীম্' বা স্তবগ্রন্থ অথবা *Tehellim* বা 'স্তব', যাহার ইংরেজি নাম *Book of Psalms* বা *Psalms*। ইহা প্রাচীন হিব্রু ভাষায় রচিত প্রার্থনা-গীতির সংগ্রহ, রাজা David দাবীদ বা দাউদ-এর রচিত স্তব ও প্রার্থনাই অধিক। সমগ্র গীতির সংখ্যা মাত্র ১৫০। ধর্মানুষ্ঠানে য়িহূদীদের মধ্যে মূল হিব্রু পঠিত হয়। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ইহার পাঠ ও চর্চা ধর্মানুষ্ঠানের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার সঙ্গে, হিব্রু ভাষায় রচিত *Shi'r Shi'rim* 'শি'র্ শি'রীম্' অর্থাৎ 'গানের গান', ইংরেজিতে *Song of Songs* নামে সুপরিচিত আর একখানি ক্ষুদ্র প্রেমগীতি-সংগ্রহকেও ধরিতে হয়। ঈশ্বর ও মানবাত্মার প্রেম ও মিলন বিষয়ক রূপক বলিয়া এই গীতগুলিকে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মীয় মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

(৩) খ্রীষ্টাব্দ ১২০০-র কাছাকাছি ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম কোণে Is-land বা Iceland আইসলাণ্ড দ্বীপে Saemund স্যামুণ্ড নামে একজন খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইসলাণ্ডের স্কান্দিনেভীয় জনগণের মধ্যে তাহাদের Skald বা ঋষি অথবা ভাট ও চারণ জাতীয় কবিদের মুখে-মুখে প্রচলিত, দেবতা ও বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত গাথা ও কবিতার সংকলন করেন। এগুলি যেন পৌরাণিক গাথা, ঋগ্‌বেদের আখ্যান-কবিতার ধরনে রচিত। ভাষা প্রাচীন স্কান্দিনেভীয়; ভারতের আর্য্যগণের জ্ঞাতি জরমানিক জাতির মধ্যে প্রচলিত বৈদিক ধর্মের সমশ্রেণিক ধর্মের কবিতা ও পদের নাতিবৃহৎ সংগ্রহ। এই ক্ষুদ্র বইখানির নাম Edda 'এদ্দা' অর্থাৎ 'পিতামহী'। এই বইয়ে জগৎসৃষ্টি, প্রলয়-কালের মহাযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের গাথাও আছে। আমাদের ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদের পাশে রাখিবার মতো পুস্তক—আকারে ক্ষুদ্র হইলেও।

(৪) জাপানের Man'yoshiu 'মান্য়োশিউ' (অর্থাৎ 'অযুত-পত্র-সঞ্চয়ন') নামে বিরাট্ কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক। ইহা খ্রীষ্টীয় ৩৪৭ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় ৭৬৪ পর্য্যন্ত প্রাচীন জাপানী জীবন-যাত্রা, যুদ্ধ, প্রেম, প্রকৃতি-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন কবির রচিত প্রায় ৪৫০০ কবিতার সংগ্রহ। ইহাকে এক হিসাবে জাপানের ঋগ্‌বেদ বলা যায়। তবে কাব্যরসে অপূর্ব হইলেও, এই গ্রন্থের ধর্মীয় কোনও মূল্য বা প্রয়োগ নাই।

(৫) দক্ষিণ-ভারতের Nayanmar 'নয়ন্‌মার্‌' বা শৈব ভক্তগণের প্রার্থনা- ও আত্মনিবেদন-বিষয়ক তমিল্‌ পদ ও কবিতার সংগ্রহ *Tevāram* তেৱারম্‌' বা 'দেৱারম্‌'। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে নম্‌পি-অণ্টার্‌-নম্‌পি নামে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংকলিত। ইহা তমিল্‌ শৈব সম্প্রদায়ের কাছে বেদ ও উপনিষদের মতো সম্মানিত, এবং ধর্মানুষ্ঠানে গীত, পঠিত ও আলোচিত হয়।

(৬) আঠারো জন তমিল্‌ Āzhvār 'আড়্‌ৱার্‌' বা বৈষ্ণব ভক্তগণের পদ-সংগ্রহ *Nāl-āyirap-Pirapantam* 'নাল্‌-আয়িরপ্‌-পিরপন্তম্‌' অর্থাৎ 'চতুঃ-সহস্র-প্রবন্ধ' পুস্তক। (ইহার একটি অংশ, প্রায় এক-সহস্র-পদময় 'সহস্র-গীতি', আড়্‌ৱার্‌ শঠকোপ- বা নম্মাড়্‌বার্‌-বিরচিত 'তিরু-বায়্‌-মোড়ি' অর্থাৎ শ্রীমুখবাণী' খণ্ড, বঙ্গাক্ষরে মূল তমিল্‌ ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস কর্তৃক খড়দহ শ্রীবলরাম ধর্মসোপান 'উজ্জীবন' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ*)। শ্রী-সম্প্রদায়ের তমিল্‌ বৈষ্ণবগণের নিকট এই সংগ্রহ-গ্রন্থ 'দ্রাবিড় বেদান্ত' বলিয়া সম্মানিত, এবং ইহার পদ, 'তেৱারম্‌'-এর পদের মতো মন্দিরে ও অন্যত্র গীত হয়, পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। 'তেৱারম্‌'-এর কবিতা বা পদ যখন সংকলিত হয়, ঠিক সেই সময়েই, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে, শ্রীনাথমুনি কর্তৃক এই তমিল্‌-বৈষ্ণব-পদ-সংহিতা গ্রথিত হয়।

(৭) শিখ 'আদি-গ্রন্থ', বা 'গুরু-গ্রন্থ', বা 'গ্রন্থ-সাহিব'। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম শিখ গুরু অর্জুন, গুরু শ্রীনানক হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পূর্বের গুরুগণের রচিত পদ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ সংকলিত করেন। তাঁহার সময়ে পাঞ্জাবে প্রচলিত সন্ত কবীরদাসের ও অন্য কয়েকজন সুপরিচিত ভক্ত কবির বহু পদ-ও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন। পরে গুরু তেগ বাহাদুরের সময় পর্য্যন্ত ইহাতে অন্য শিখ গুরুগণের পদও গৃহীত হয়। এই পুস্তক হইতেছে শিখ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ; সমস্ত শিখ গুরুদ্বারায় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইহার পদসমূহ গীত, পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ইহার ভাষা পাঞ্জাবী-মিশ্র প্রাচীন হিন্দী (ব্রজভাষা, দিল্লী অঞ্চলের ভাষা, অপভ্রংশ ইত্যাদি)। এই বইকে 'মধ্যযুগের পাঞ্জাবের ঋগ্‌বেদ' বলা চলে। ইহার পদসংখ্যা ৩৩৮৪।

(৮) বাঙ্গালা বৈষ্ণব মহাজনগণের পদ-সংগ্রহ। চৈতন্যদেবের তিরো-ধানের পরে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গঠিত হইল, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠানের

* এতৎসম্পর্কে এই প্রবন্ধ-সংগ্রহে সংকলিত পরবর্তী নিবন্ধ 'শঠকোপ-কৃত সহস্র-গীতি' দ্রষ্টব্য।

অন্যতম অঙ্গ হিসাবে জয়দেব কবি (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ) হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণ-লীলা এবং চৈতন্য-জীবনী অবলম্বন করিয়া যে-সমস্ত পদ বা গান লিখিতেন, সেগুলি লইয়া 'কীর্তন' গান করার পদ্ধতি আসিয়া গেল। এইরূপ গানের (মহাজন-পদের) কতকগুলি সংগ্রহ খ্রীষ্টীয় ১৬৬০-এর পর হইতে বঙ্গদেশে প্রস্তুত হইতে থাকে। বৈষ্ণব অলংকার ও রসশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, বিভিন্ন পর্যায়ে পদগুলিকে এই-সব সংগ্রহে সাজানো হইত—যথা, 'পুর্বরাগ, অভিসার, বিরহ, মান, খণ্ডিতা, মিলন' প্রভৃতি। এইরূপ প্রাচীন সংগ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইতেছে 'পদকল্পতরু', ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবদাস এই সংগ্রহ প্রস্তুত করেন, ১৭০ জন কবির রচিত ৩১০১-টি পদ ইহাতে আছে। ইহাকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজন-পদের ঋগ্‌বেদ-সংহিতা' বলা যায়। (কিছুকাল হইল, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের সম্পাদনায় এইরূপ গৌড়-বঙ্গীয় বৈষ্ণব মহাজনপদের পুর্ণতম সংগ্রহ, টীকা-টিপ্পনী সহ, দুই শতের অধিক কবির রচিত ৩৭৫৬-পদময় বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—কলিকাতা 'সাহিত্য সংসদ্', খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬১।)

(৯) ফিন্‌লাণ্ড দেশের, তুর্কী-ভাষার জ্ঞাতি ফিন্-ভাষায়, Elias Loenrott এলিয়াস ল্যোন্‌রোট্ নামে একজন পণ্ডিত, খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকে, ফিন্-জাতির জনগণের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন বীরগাথা সংগ্রহ করিয়া যেমন সেই গাথাগুলিকে মিলাইয়া, অবশেষে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২২,৭৯৩-ছত্রে নিবদ্ধ *Kalevala* 'কালেভালা' নাম দিয়া এক অভিনব জাতীয় মহাকাব্যের সংকলন করেন, তেমনি তিনি ফিন্-জাতির লোকগীতি এবং কবিতার সংগ্রহও করেন। Kantele 'কান্তেলে' বলিয়া একরকম তারের যন্ত্র (বীণা) বাজাইয়া এই-সব গান গায়ক কবিরা গাহিত, এই জন্য এই সংগ্রহ-গ্রন্থের তিনি নাম দেন *Kanteletar* 'কান্তেলেতার' অর্থাৎ 'বীণাবাদক'। ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত এই বইখানিকে ফিন্-ভাষার ঋগ্‌বেদ-পর্যায়ের বই বলা যায়।

(১০) সোভিয়েৎ রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত Estonia এস্তোনিয়া-দেশের পণ্ডিত Friedrich Reinhold Kreutzwald ফ্রীদ্‌রিখ্‌ রাইন্‌হোল্ট্‌ ক্রয়ট্‌স্‌ভাল্ট্‌ ফিন্‌দের জ্ঞাতি এস্ত্-জাতির মধ্যে প্রচলিত বীরগাথা সংগ্রহ করিয়া, সেগুলির আধারে ১৯,০০০-ছত্রময় এক মহাকাব্য *Kalevipoeg* 'কালেভিপোয়েগ্' ১৮৬১ সালের দিকে প্রকাশিত করেন। এই কাব্য ফিন-ভাষার *Kalevala* 'কালেভালা'র অনুরূপ। পরে আর একজন লোক-যান- ও লোকসাহিত্য-বিৎ

এস্ত্‌ পণ্ডিত Pastor Jakob Hurt পাদ্রি য়াকোব হুর্ত্‌, বিস্তর পৌরাণিক কথা, নানা উপাখ্যান এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গান ছড়া প্রভৃতির সংগ্রহ করেন (১৮৭৫-১৮৮৬)। প্রায় ২০,০০০ গানের এই সংগ্রহ *Vaana Kannel* 'ভানা কান্নেল্‌' অর্থাৎ 'প্রাচীন বীণা' নামে প্রকাশিত হয়। ইহা ফিন-জাতির 'কাস্তেলেতার'-এর মতো বই, এবং ইহাকে 'এস্ত্‌-ভাষার ঋগ্‌বেদ-সংহিতা' বলা যায়।

(১১) বাল্টিক সাগরের তীরের দেশে, সোভিয়েট-রাষ্ট্রসংঘ-ভুক্ত Lithuania লিথুআনিয়া ও Latvia লাট্‌ভিয়া গণতন্ত্রদ্বয়ের অধিবাসী লিথুআনীয় ও লাট্‌ভীয় জাতির লোকেরা, ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর Balt 'বল্‌ৎ' বা 'বাল্ট' শাখার (*ভট-শাখার) অন্তর্ভুক্ত—ভারতের আর্য্যজাতির জ্ঞাতি এই Balt বাল্ট জাতি। খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকের প্রারম্ভ হইতে ইহাদের খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা করা হয়, আক্রমণকারী পোল ও জর্‌মানদের দ্বারায়। নামতঃ খ্রীষ্টান হইবার পরেও, ইহারা নিজেদের প্রাচীন ধর্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। এই ধর্ম আদিম বৈদিক ধর্মের পর্য্যায়ের। এই দুই জাতির মধ্যে, ইহাদের প্রাচীন ধর্মের সহিত সংপৃক্ত সহস্র সহস্র গাথা, গান বা সূক্ত সেদিন পর্য্যন্ত লিথুআনীয় ও লাট্‌ভীয় ভাষায় প্রচলিত ছিল। এগুলির বিরাট্‌ সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, পণ্ডিতদের দ্বারা আলোচিত হইতেছে, জনসাধারণ এখনও এই-সব গান গাহিয়া থাকে। এইরূপ গানকে বাল্টিক ভাষায় daina 'দাইনা' বলে, শব্দটি বৈদিক সংস্কৃতের ভাষা-অর্থে 'ধেনা' শব্দের বাল্টিক প্রতিরূপ বলিয়া মনে হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে Liudvikas Reza ল্যুদ্‌ভিকাস্‌ রেজা ৮২টি লিথুআনিয়ান 'দাইনা'র একটি সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত করেন ; পরে এখন লিথুআনীয় ভাষা ও সাহিত্য পরিষৎ প্রায় ৬০০০ গানের সংগ্রহ বাহির করিতেছেন। লাট্‌ভিয়ান ভাষায় Krishjanis Barons ক্রিশিয়ানিস্‌ বারোন্‌স্‌ সহকর্মীদের সহায়তায় পাঠভেদ-সহ সাত লাখের উপর 'দাইনা' সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন (১৮৮৬-১৯২৩)। এই লাট্‌ভীয় গানগুলি বেশির ভাগ-ই চার ছত্রের ক্ষুদ্র রচনা। বারোন্‌স্‌-এর বৃহৎ সংগ্রহ Latviu Daina 'লাৎভিউ দাইনা', ও লিথুআনীয় দাইনা-সংগ্রহ, এই দুইটিকে মিলিত-ভাবে Veda-sambita Baltica 'বাল্‌তিকী (বা *ভটিকী) বেদ-সংহিতা' এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ বিভিন্ন দেশে নানা ভাষায় লোক-গীতির ও লোক-গাথার এবং ধর্ম-গীতের সংগ্রহ আছে, সেগুলি ঋগ্‌বেদকে মনে করাইয়া দেয়। মেক্সিকোর

প্রাচীন Aztec আস্তেক জাতির প্রাচীন ধর্মের দেবতাদের সম্বন্ধে গান, দেবকথাময়, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাময় গান, স্পেনীয় ও আমেরিকান পণ্ডিতেরা সংগ্রহ করিয়া কিছু কিছু প্রকাশিত করিয়াছেন। আফ্রিকার নানা জাতির নিজস্ব ধর্মসংগীতেরও সংগ্রহ হইয়াছে ও হইতেছে। পলিনেসীয় জাতির অতি সুন্দর নানা সংগীত, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ হইতে সংগৃহীত, অনূদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এই-সব ধর্মসংগীতের সংগ্রহ ঋগ্‌বেদের সমজাতিক। এমন কি, আধুনিক কালে ইংরেজদের Church of England 'চ্যর্চ অব ইংলাণ্ড'-এর ও অন্য খ্রীষ্টান ধর্মগোষ্ঠীর গির্জায় গীত খ্রীষ্টান প্রার্থনা-সংগীতের ও উপাসনা-পদের সংগ্রহ, বাঙ্গালা দেশের সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের 'ব্রহ্ম-সংগীত' সংগ্রহ, ঋগ্‌বেদেরই সমশ্রেণীর গ্রন্থ। ঋগ্‌বেদের আগে প্রাচীন সুমেরীয় ভাষায় এবং প্রাচীন আক্কাদীয় বা আসিরিয়ো-বাবিল ভাষায়, প্রাচীন মিসরী ভাষায়, ও অন্যান্য অধুনা-লুপ্ত কতকগুলি ভাষায়, এই ধরনের জীবন-গীতি ও দেবতার স্তব এবং প্রার্থনা-স্তোত্র পাওয়া গিয়াছে, সে কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা এখন সেই-সবের চর্চা করিতেছেন।

ঋগ্‌বেদের ১০১৮টি সূক্তের মধ্যে বেশির ভাগ-ই মানুষের জীবন লইয়া। আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বা বিচারের সূক্ত সংখ্যায় ৫০টির বেশি হইরে না। তবে এখানে ওখানে সেখানে ঋগ্‌বেদের মধ্যে গভীর ভাবের—দার্শনিক চিন্তার ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ঋক্ বা শ্লোক যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের মধ্যে (এবং অন্য বেদেরও মধ্যে) বিক্ষিপ্ত এই সমস্ত মহাবাক্য, মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আধিমানসিক প্রসন্নতার পক্ষে এক অপূর্ব শক্তিপুর্ণ সাধন-রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ঋগ্‌বেদ ও অন্য বেদের মধ্যে নিহিত এইরূপ মহাবাক্য, যেগুলিকে গায়ত্রী মন্ত্রের মতো 'শ্রুতি-শিরস্‌' বলা যায়, বহুশঃ সংগৃহীত হইয়া টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। মানবের গভীরতম জীবনে ও অনুভূতিতে এইরূপ উদ্ধৃতি কতটা কার্য্যকর হইতে পারে, তৎ-সম্বন্ধে অনুভবশীল পাঠক নিজের অভিজ্ঞতা হইতে মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ডক্টর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অতি সুন্দর বৈদিক সূক্তি-সংকলন ও তাহার ব্যাখ্যা-মূলক অনুবাদ পুস্তক *The Call of the Vedas*-এর উল্লেখ করা যায় (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০, 'ভারতীয় বিদ্যা ভবন', বোম্বাই)। বেদ-সংহিতার শাশ্বত আধ্যাত্মিক আবেদনের প্রেরণাস্থল

এই-সব সূক্তির চমৎকার সংগ্রহ এইরূপ পুস্তকে পাওয়া যাইবে। এইরূপ সূক্তি বা মহাবাক্য, এবং কাব্যরসে ভরপুর ও রমন্যাসে পূর্ণ কতকগুলি অন্য সূক্ত অথবা ঋক্, ঋগ্‌বেদের তথা ভারতীয় সাহিত্যের এক প্রথম ও প্রধান গৌরবের বস্তু। ইন্দ্রের ও অন্য দেবতার সম্বন্ধে সূক্ত ও ঋক্‌গুলি গভীর-ভাব-দ্যোতক। উষাদেবীর সম্বন্ধে যে মনোহর ঋক্‌গুলি ঋগ্‌বেদের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে, কবিত্বরসে সেগুলি অপূর্ব, পৃথিবীর সাহিত্যে সেরূপ সৌন্দর্য্যময় কবিতা সুদুর্লভ। এতদ্ভিন্ন, পুরূরবা-উর্বশীর কথোপকথনাত্মক অপূর্ব-সুন্দর প্রেম-গাথা ঋগ্‌বেদেই আছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে 'জীবন-দেবতা'র কল্পনা দেখা যায়, যাহার প্রকাশ হয় তাঁহার যৌবনকালের এবং বার্ধক্যেরও কতকগুলি সুন্দর ও মনোহর কবিতায়—'চিত্রা', 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র কতকগুলি কবিতা—'চিত্রা', 'সিন্ধুপারে', 'উর্বশী', 'বিজয়িনী', 'মানসী' প্রভৃতি যে কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম—সেগুলির এক প্রধান উৎসমূল ঋগ্‌বেদের এই পুরূরবা-উর্বশী সূক্ত।

ঋগ্‌বেদের সাহিত্যিক রমন্যাস-বিষয়ক, ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক এবং আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিচার বহু পুস্তকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন বিভাগ (দশ মণ্ডল, এবং প্রতি মণ্ডলে সম্পূর্ণ কতকগুলি করিয়া সূক্ত ; আবার আট অষ্টকেও বিভাগ আছে), প্রতি সূক্তের সূচী বা প্রতিপাদ্য বিষয়, ঋগ্‌বেদের সূক্তের দেবতা ও রচক (বা 'দ্রষ্টা') ঋষি এবং ছন্দ. প্রভৃতির আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম, তাহা অন্যত্র মিলিবে। ঋগ্‌ ও অন্য বেদ-সংহিতার অন্তর্নিহিত বিষয়-বস্তুর আলোচনার জন্য, এই বেদ-সংহিতা ও বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় উপযোগী কয়েকখানি প্রামাণিক বই আছে, সেগুলি হইতে আবশ্যক তথ্য মিলিবে। এ বিষয়ে যত পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা লইয়া বেশ বড়ো একটি গ্রন্থ-সংগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক কালে জরমান ভাষাতেই বোধ হয় বেদ-সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক মৌলিক আলোচনা হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যুগে 'আর্য্য'-জাতির (বা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির) প্রাচীনতম পুস্তক বলিয়া, 'আর্য্য'-ভাষী সুপণ্ডিত জরমান জাতির মানুষ ঋগ্‌বেদ লইয়া মাতিয়া গিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যের প্রভাবে, এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের প্রভাবেও, জরমানিতে, ১০০-১২৫ বৎসর পূর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নূতন 'রোমান্টিক আন্দোলন'

অর্থাৎ রমন্যাসনিষ্ঠ ভাববিলাস দেখা দিয়াছিল, যাহার স্থায়ী প্রভাব তখনকার দিনের ও তৎপরবর্তী কালের জরমান ও ইউরোপীয় সাহিত্যে বিদ্যমান।

ঋগ্‌বেদের ও অন্য বেদের চর্চা গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতেই, এখন হইতে ২৫০০ বৎসর পূর্ব হইতেই, ঋগ্‌বেদের পণ্ডিতোচিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। যাস্কের নিরুক্ত ও নিঘণ্টু, 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলি, 'প্রাতিশাখ্য' গ্রন্থগুলি, পাণিনির ব্যাকরণ, প্রাচীন ভারতে বেদের আলোচনার প্রথম ফল। পণ্ডিত লোকে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ, সমস্ত বেদ-সংহিতা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, যজ্ঞাদি ধর্মীয় কার্য্যে বেদের সূক্ত ও ঋক্ প্রয়োগ করিতেন, পঠন ও পাঠন করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন। গুরুপরম্পরায় বেদপাঠ—বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা ও বেদের ব্যাখ্যা আলোচনা করা—তিন হাজার বছর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মধ্য-যুগে বেদের বড়ো-বড়ো টীকা রচিত হইয়াছে। এই-সব টীকা বা ভাষ্যের মধ্যে, দক্ষিণ-ভারতের নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের স্থাপয়িতা (১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) বুক্করায়ের সভাপণ্ডিত সায়ণাচার্য্যের টীকা বা ভাষ্যে, সমগ্র ঋগ্‌বেদের প্রাচীন পরম্পরার পূর্ণ ব্যাখ্যা সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রালোচনার পরম্পরা অনুসারে এক বিরাট্ এবং অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এই মহাগ্রন্থ। কিন্তু সাধারণতঃ প্রাচীন যুগের অবসানের পরেই, অর্থাৎ বিগত দুই হাজার বছর ধরিয়া, বেদ মুখ্যতঃ পুজার বেদির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। জনসাধারণের কাছে বেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল পুজার বস্তু, প্রাণের উপলব্ধির বস্তু নহে। অবশ্য বেদের অন্তর্নিহিত গভীরতম দর্শন, 'বেদের অন্ত' বা শেষ কথা—ইংরেজি প্রতিরূপে, 'বেদস্য অন্ত'=Wit's end—ভারতের 'বেদান্ত' মত, চিরকাল ধরিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও কর্মের আধার হইয়া আছে।

ইউরোপের পণ্ডিতেরা এদেশে আসিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে বেদের খবর পাইলেন, বেদ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন, দক্ষিণ-ভারতে *Ezourvedam* অর্থাৎ যজুর্বেদের নকলে নূতন এক কৃত্রিম বেদ-গ্রন্থের অবতারণা তাঁহারা করিলেন, ফরাসী ভাষায় এই নকল বেদের 'অনুবাদ' ও মুদ্রণও হইল। কিন্তু ভগবদ্গীতা, শকুন্তলা, মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ ও সংস্করণ বাহির হইবার পরে, তাঁহারা বেদ লইয়া পড়িলেন। ১৭৮৪ সালে Sir Charles Wilkins স্যর চার্লস্ উইল্‌কিন্স্ সরাসরি সংস্কৃত হইতে গীতার

ইংরেজি অনুবাদ কলিকাতায় প্রকাশিত করিলেন। ১৭৮৯ সালে Sir William Jones স্তর উইলিয়াম্‌ জোন্স্‌, কলিকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌'-এর ইংরেজি অনুবাদ Sacontala বাহির করিয়া দিলেন—স্বল্পকালের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ রসরচনা ইউরোপের চিত্তকে জয় করিয়া ফেলিল। জরমান কবি, পণ্ডিত ও দার্শনিক Johan Wolfgang von Goethe যোহান ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌ ফন্‌ গ্যোটে ইহার ভাবশুদ্ধ প্রশস্তি করিলেন তাঁহার সুবিখ্যাত জরমান কবিতায়। ১৭৯২ সালে কালিদাসের 'ঋতুসংহার' বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইল। জোন্স্‌-কৃত মনু-সংহিতার ইংরেজি অনুবাদও বাহির হইল। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র মাধ্যমে ভারতের মহাগ্রন্থ মহাভারতের অতি সুন্দর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ নাগরাক্ষরে কলিকাতায় প্রকাশিত হইল। এইভাবে জগতে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনার যুগ আসিয়া দেখা দিল। ১৮৩৮ সালে জরমান পণ্ডিত F. Rosen রোজেন লাতীন অনুবাদের সহিত এক ঋগ্‌বেদ-সূক্ত-সংগ্রহ প্রকাশ করেন, নাগরী অক্ষরে, জরমানি হইতে। ঋগ্‌বেদ সম্বন্ধে ইহা-ই প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তক। ১৮৪৯-১৮৭৪, এই কয় বৎসরে জরমান পণ্ডিত Friedrich Max Mueller ফ্রীদ্‌রিখ্‌ মাক্স ম্যূলর ('ভট্ট মোক্ষ-মূলর') তাঁহার অবিনশ্বর কীর্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করেন—ছয়টি বিরাট্‌ খণ্ডে অতি সুন্দর নাগরী হরফে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য-সহ সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদ। ১৮৬২-৬৩ এই কয় বৎসরে আর একজন জরমান পণ্ডিত Theodor Aufrecht তেওদোর্‌ আউফ্‌রেখ্‌ৎ রোমান লিপিতে মূল ঋগ্‌বেদ প্রকাশিত করেন (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ঋগ্‌বেদের অনুবাদ-কার্য্য বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় আরম্ভ হইল। ইংরেজিতে, Horace Hayman Wilson হরেস হেম্যান উইলসন ছয় খণ্ডে (১৮৫০ হইতে ১৮৮৮ সালের মধ্যে), Ralph T. H. Griffiths রাল্‌ফ্‌ গ্রিফিথ্‌স্‌ (দুই খণ্ডে, ১৮৮১-১৮৯২ সালে); জরমানের Alfred Ludwig আলফ্রেড্‌ লুড্‌ভিক্‌ (ছয় খণ্ডে, ১৮৭৬-১৮৮৮), Hermann Grassmann হেরমান্‌ গ্রাস্‌মান্‌ (কাব্যময় অনুবাদ, ১৮৭৬-১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ), এবং Karl Friedrich Geldner কার্ল ফ্রীডরিখ গেল্‌ডনার্‌ (প্রথম খণ্ড, Leipzig লাইপ্‌ৎসিক্‌ ১৯২৩, পরবর্তী খণ্ডসমূহ আমেরিকার Harvard হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়

চার খণ্ডে ১৯৫১-১৯৫৭ সালে; ইহা-ই হইতেছে ঋগ্‌বেদের আধুনিকতম পূর্ণ অনুবাদ); ফরাসীতে, S. A. Langlosis লঁগ্লোআ (চার খণ্ডে, ১৮৫১)। ইউরোপীয় নানা ভাষায় আংশিক ভাবে ঋগ্‌বেদ বহুশঃ অনূদিত হইয়াছে। জাপানের বৌদ্ধশাস্ত্র, চীনা ও সংস্কৃতের বিরাট্ পণ্ডিত Junjiro Takakusu জুন্‌জিরো তাকাকুসু (মৃত্যু ১৯৪৫) জাপানী ভাষায় ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রকাশিত করেন।

বাঙ্গালা ভাষায় এই মহাগ্রন্থের অনুবাদ সর্বপ্রথম আরম্ভ করেন রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "কাশীর এক পণ্ডিতের সাহায্যে ঋগ্বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।...১৭৬৯ শকের ১লা ফাল্গুন [১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ] তারিখের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ঋগ্বেদ সংহিতা দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ...১৭৯৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে [১৮৭১ খ্রীঃ অঃ] প্রথম মণ্ডলের ষোড়শ অনুবাকের তৃতীয় সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্ পর্য্যন্ত [প্রথম মণ্ডলের ১০৮টি সূক্ত প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গেল।" (দ্রষ্টব্য "ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাদ", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', শক ১৯৩৯ [খ্রীঃ অঃ ১৯১৭], ভাদ্র, পৃঃ ১১৫-১৮)। "...পরে কয়েক বৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এই কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর বঙ্গভাষার এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার আর কোনও চেষ্টা হয় নাই।" (রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত ঋগ্‌বেদ-সংহিতার অনুবাদের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। 'বেদপ্রকাশিকা' নামে প্রকাশিত (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ), রমানাথ সরস্বতী-কৃত সটীক আংশিক অনুবাদ উপলক্ষ্য করিয়াই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রে "বেদ ও বেদব্যাখ্যা"-শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন (এই প্রবন্ধটি হইতে কিছু অংশ পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে)। রমানাথ সরস্বতীর পরে এই অনুবাদ-কার্য্যে উদ্যোগী হন রমেশচন্দ্র দত্ত। সমগ্র ঋগ্‌বেদ-সংহিতার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ (১৮৮৫-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) মহানুভব রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কৃতিত্বের ও কীর্তির জয়স্তম্ভ-স্বরূপ। রমেশচন্দ্র একদিকে ভারতীয় পরম্পরায় সায়ণাচার্য্য ও অন্য দিকে মাক্স-ম্যূলর প্রমুখ ইউরোপীয় বেদবিৎ পণ্ডিত, এই উভয় শ্রেণীর বিদ্বদ্বর্গের অনুসরণ করিয়া, বহু মূল্যবান্ টীকা-টিপ্পনীর দ্বারা তাঁহার এই অনুবাদ

অলংকৃত করেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষাতে নহে, বস্তুতঃ আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে, এই বঙ্গানুবাদ-ই হইতেছে ঋগ্‌বেদ-সংহিতার প্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ ইংরেজি ১৯০৯ সালে, রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে, এই অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রস্তুত তৃতীয় সংস্করণে (১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) রমেশচন্দ্রের মূল্যবান্ টীকা-টিপ্পনীগুলি সংরক্ষিত হইলে ভালো হইত, গ্রন্থের মূল্য ও উপযোগিতা তাহাতে অনেক বাড়িয়া যাইত। বোধ হয় গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহা করা হয় নাই। এই-সব টীকা-টিপ্পনী পৃথক্ এক খণ্ডে প্রকাশিত হইবার যোগ্য।

রমেশচন্দ্রের অনুবাদ সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহার উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

> …রমেশচন্দ্রের এই কীর্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।… কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশবাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইঁহার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিবে না। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, ‘বিবিধ’ খণ্ড, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭, পৃঃ ২৪৯, পাদটীকা)

এই তৃতীয় সংস্করণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে (পুস্তকের) “বর্তমান পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম বিশ্বসমাদৃত মহাগ্রন্থ, বঙ্গভাষী জনগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক তথা আধিভৌতিক সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন, ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রকাশ ঋগ্‌বেদ ও মহাভারতের মধ্যে অন্যতর ও প্রাচীনতর, আবার বহু বৎসর পরে বাঙ্গালী তাহার মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে নূতন করিয়া পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিল। ইতিপূর্বে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ঋগ্‌বেদের (ও অন্য বেদের) মূল ও সটীক আংশিক বাঙ্গালা অনুবাদ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করেন (হাওড়া ১৯১৯ হইতে)। কিন্তু বেদ বুঝিবার পক্ষে এই অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনীর বিশেষ কোনও মূল্য নাই।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাতেই ঋগ্‌বেদের পূর্ণ অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ

সরস্বতী ঋগ্‌বেদ ও অন্য সমস্ত বৈদিক সাহিত্য হিন্দীতে প্রকাশিত করিবার সংকল্প করেন, এবং তাঁহার 'ঋগ্‌বেদ ভাষ্য-ভূমিকা' তিনি সংস্কৃতে লিখিয়া যান। বেদকে আর্য্য-সমাজের মতবাদের ও ধর্মবিষয়ক পুনর্জাগৃতির মুখ্য আধার বলিয়া দয়ানন্দ স্বামী উহার প্রচার করিতে আগ্রহশীল হন। কিন্তু বেদ-ব্যাখ্যায় তাঁহার যে দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল, যাহা আর্য্য-সমাজের পণ্ডিত, পরিচালক ও প্রচারকদের দৃষ্টি-ভঙ্গী, তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতান্তরের অবকাশ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পূর্বে উল্লিখিত তাঁহার 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' প্রবন্ধে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। মহর্ষি দয়াদন্দ সরস্বতী কর্তৃক অনুসৃত বেদ-পর্য্যালোচনার রীতি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা-ও লক্ষণীয়। তাঁহার বক্তব্য এই—

> দয়ানন্দ সরস্বতী এক জন এক্ষণকার লোক, তিনি সমাজ সংস্কারক, তিনি হিন্দুসমাজ 'ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চান'। তিনি যদি বলেন, তোমরা এই এই ভাবে এই এই কার্য্য কর, এই কর্ম করিও না,—কে তাঁহার কথা শুনিবে? এই জন্য তিনি বেদের শরণ লইয়াছেন। বেদ গান মাত্র; উহাতে তাৎকালিক সমাজের রীতিনীতি কতক কতক জানা যায় বটে, কিন্তু সব জানা যায় না। তিনি বলেন, বৈদিককালে জাতি-ভেদ ছিল না, স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহা কিছু ইয়োরোপ হইতে আনিতে চান, তিনি বলেন, সে সবই বেদে আছে। বিশেষ তিনি বলেন, বেদ একেশ্বরবাদী। শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ একেশ্বরবাদী বলিয়া গিয়াছেন; দয়ানন্দ তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক সাহসী; তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। তিনি অগ্নি শব্দের অর্থ ঈশ্বর বলেন। অগ্রে নীয়তে—এই ব্যুৎপত্তিতে সায়ণ অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন করিয়াছেন, দয়ানন্দ সেই ব্যুৎপত্তিতেই উহার অর্থ ঈশ্বর করিতে চান। তাঁহার মতে, ধান্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর; ধা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, যিনি ধারণ করেন, তিনিই ধান্য। ঈশ্বর পৃথিবী ধারণ করেন, অতএব ঈশ্বর ধান্য। তাঁহার মত এই—সায়ণাচার্য্য ভ্রান্ত। মহাভারতের পূর্বে যে টীকা লিখিত হয়, সেই টীকা সেই প্রমাণ। নিগম নিরুক্তাদি সেই টীকা। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সায়ণ নিজের মত কোথাও

দেন নাই, সর্বত্র নিগম নিরুক্তের কথায় চলিয়াছেন। তথাপি দয়ানন্দ তাঁহাকে ঠেলিলেন। দরকার এমনই জিনিস।

বেদের সময়ের লোক অতি সরল ও সোজা ছিল। তাহাদের মনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করা অতি দুরূহ। যদি অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমরা একবার আমাদিগকে বৈদিক জগতে কল্পনাবলে লইয়া যাইতে পারি, আমরা বেদ অনেক ভাল বুঝিব। তৎকালীন লোকের কার্য্যকলাপ রাজনীতি প্রভৃতির মধ্যে অনেক প্রবেশ করিতে পারিব, তাহাদের কথা অনেক বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই জগতের প্রবেশ বড় সহজ কথা নহে। প্রাচীন জগতের অনেক কথা জানিতে হইবে, প্রাচীন লোকের মন কেমন ছিল সেইটী বিশেষ জানা চাহি—শুদ্ধ ভারতবর্ষ নহে, যেখানে যেখানে আর্য্যজাতি, সেই সেই খানেই প্রাচীন জগতের ইতিহাস জানা চাহি। [হরপ্রসাদ-রচনাবলী, দ্বিতীয় সম্ভার, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৩৯৬-৩৯৭।]

যাহা হউক, দয়ানন্দ স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে হিন্দীতে ঋগ্‌বেদের দুইটি অনুবাদ বাহির হয়—প্রথম, অজমের বৈদিক মন্ত্রালয় হইতে নয় ভাগে প্রকাশিত (খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৪-১৯১৩); এবং দ্বিতীয়, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত (পরে ইহার পুনর্মুদ্রণ হয়)। এতদ্ভিন্ন, সনাতন অর্থাৎ আর্য্যসমাজ-বিরোধী প্রাচীন-পন্থী ব্রাহ্মণ মতানুসারে আরও দুইটি হিন্দী অনুবাদ বাহির হয়, প্রয়াগ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত রামগোবিন্দ ত্রিবেদী বেদান্তশাস্ত্রীর অনুবাদ (১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ), এবং মথুরা গায়ত্রী তপোভূমি হইতে প্রকাশিত শ্রীরামশর্মা আচার্য্য-কৃত অনুবাদ (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। আর্য্য-সমাজের বিচার অনুসারে ঋগ্‌বেদের একটি পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদও বাহির হয়, দুর্গাপ্রসাদ-কৃত, লাহোর ১৯১২-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও ঋগ্‌বেদের সম্পূর্ণ অনুবাদ পরে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখ করিতে হয়—তেলুগু (বেল্লারি হইতে ১৯১৩-১৯১৫ সালে প্রকাশিত, ক. চ. রাউ কৃত অনুবাদ); কানাড়ী (ত. র. স. বেঙ্কটকৃষ্ণয়্য-কৃত অনুবাদ, বঙ্গলুর, ১৯১৩-১৯১৫); মারাঠীতে দুইটি অনুবাদ বাহির হইয়াছে—(১) সিদ্ধেশ্বর শাস্ত্রী চিত্রাব-কৃত, পুনা, ১৯২৮, এবং (২) কোল্‌হটকর- ও পটবর্ধন-কৃত অনুবাদ, পুনা, ১৯৪২; গুজরাটী, ঘোড়-কৃত অনুবাদ, খম্বাত বা কাম্বে নগরী, ১৯২০। মালয়ালী

ভাষায় দুইটি অনুবাদ হইয়াছে—(১) প. ক. নম্বুদিরি (কোল্লম্ বা কুইলন, ১৯২৫), এবং (২) কেরলের বিখ্যাত মালয়ালী কবি বল্লতোল নারায়ণ মেনোন্-কৃত কবিতাময় অনুবাদ।

আশা করা যায়, রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদের এই নবীন সংস্করণ দ্বারা এখন বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গভাষী পাঠকের পক্ষে ভারতের সংস্কৃতির ও ধর্মের মূল উৎস আলোচনা করিবার সুযোগ আবার আসিয়াছে। এই জনহিতকর এবং শিক্ষা- ও সংস্কৃতি-মূলক কার্য্যের জন্য শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিয়া আমার এই অক্ষম ঋগ্‌বেদ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিতেছি॥

রবীন্দ্র-জন্মতিথি
বৈশাখ, শকাব্দ ১৮৮৫
মে ৯, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৩

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমণি চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত ঋগ্‌বেদ বঙ্গানুবাদের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা-রূপে লিখিত, ও 'জ্ঞান-ভারতী', কলিকাতা হইতে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এখানে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপে পুনর্মুদ্রিত।

শঠকোপ-কৃত "সহস্র-গীতি"

(নম্মাড়্বার্-তিরু-বায়্-মোড়ি)

ভারতের ভক্তিধর্ম

ভারতে ভক্তিবাদের উদ্ভব, প্রচার ও বিকাশের সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত আছে—

উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তি র্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
অন্ধ্রদেশে ক্বচিৎ ক্বচিদ্—গূর্জরে বিলয়ং নীতা॥

শ্লোকটির বিভিন্ন পাঠান্তর আছে;—তবে মোটামুটি এই শ্লোকের বক্তব্য হইতেছে যে, ভক্তিবাদের উদ্ভব ও প্রাথমিক বিকাশ দক্ষিণ-ভারতে হইয়াছিল—'দ্রাবিড়' অর্থাৎ তমিল্*-মালয়ালম্-ভাষীদের মধ্যে, তদনন্তর 'কর্ণাটক' বা কানাড়ী-ভাষীদের মধ্যে, ও কিছু-কিছু 'অন্ধ্র' বা তেলুগুদের মধ্যে; এবং শেষে উত্তরাঞ্চলে প্রসারের সময়ে, ভক্তিবাদের বিশুদ্ধির হানি ও বিকৃতি এবং বিনাশ ঘটিয়াছিল, উত্তর-ভারতের গুজরাটী প্রভৃতি আর্য্য-ভাষী জনগণের মধ্যে। ভক্তিধর্মের এইরূপ ইতিহাস, শ্লোকটিতে যাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা সর্বথা মানিয়া লইতে পারা যায় না। দক্ষিণাপথের মতো উত্তরাপথেও ভক্তিধর্মের প্রসার ও বিকাশের কথা বিশেষভাবে গৌরবময়; একথা বলা চলে না যে, আর্য্য-ভাষী জনগণের মধ্যে, দক্ষিণ-ভারত হইতে আগত ভক্তিবাদ গৃহীত হয় নাই, বা গৃহীত হইলেও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তবে এ-কথাও ঠিক যে, ভক্তির পথে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা, সাহিত্যে বিধৃত প্রমাণ বিচার করিলে, সর্বপ্রথমে দক্ষিণ-ভারতেই ব্যাপক-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে; এবং ভক্তিধর্মের এক বিশিষ্ট ও মহিমময় সাধক-পরম্পরা প্রথমেই তমিল্-ভাষী (সংকুচিত অর্থে

* এই শব্দটির মূল ভাষায় বানান হইতেছে 'তমিল্'—অন্ত্য 'ল্'-ধ্বনি সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য—'তা-মি-ল' নহে। Tamizh, Tamil, Tamil প্রভৃতি বানানে ইহার রোমান প্রতিবর্ণ করা হয়। Tamil, ইংরেজিতে প্রচলিত এই সাধারণ বানান ধরিয়া এবং বাঙ্গালার বাহিরে অ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব-আ-কারের মতো হয় বলিয়া, আমরা সাধারণতঃ 'তামিল' রূপেই এই নামটি লিখিয়া থাকি। উপস্থিত ক্ষেত্রে লেখকের রুচি-মতো দুইটি বানান-ই মান্য—'তমিল্', 'তামিল'; এবং উপরন্ত 'তমিড়্' এই বানানকেও মান্যতা দিতে হয়।

'দ্রমিড়' বা 'দ্রাবিড়' জাতীয়) জনগণের মধ্যে দেখা দেয়। তমিল্-ভাষায় রচিত কতকগুলি অমূল্য কাব্যময় ভক্তিগ্রন্থকে, প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় ভক্তিধর্মের অন্যতম আকর-শাস্ত্র বা আধার-গ্রন্থ বলা যায়।

তমিল্-ভাষায় ভক্তি-সাহিত্যের পত্তন

প্রাচীন তমিলে ভক্তিধর্মকে লইয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তাহা একদিকে শিব ও অন্যদিকে বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইয়াছে। ভক্তি-রসাপ্লুত আত্মনিবেদনময় এই অপূর্ব প্রাচীন তমিল্ গ্রন্থরাজি, একদিকে যেমন তমিল্ সাহিত্যের, ও সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম গৌরবের বস্তু, তেমনি অন্য দিকে বিশ্বের ধর্মানুভূতিময় ভাবুকতার জন্য ও ঈশ্বরে প্রগাঢ় আস্থার জন্য জগতে অতুলনীয়। কী করিয়া এই ভক্তিস্রোতের বন্যা আসিয়া দ্রাবিড়ে বৈষ্ণব ও শৈব উভয় সম্প্রদায়ের তমিল্-সাধকদের ভাসাইয়া লইল, এবং তমিলে অপূর্ব কবিত্ব-মণ্ডিত ও ভাবশুদ্ধিময় ভক্তিকাব্য সৃষ্টি করিল, তাহার কারণ এখনও অজ্ঞাত। তবে মনে হয়, খ্রীষ্ট-জন্মের পরেকার প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধে পল্লব-বংশীয় রাজারা ইহার সমধিক পুষ্টিতে সহায়তা করেন। পল্লব রাজগণ বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদের সময়ে নব-জাগরিত পুরাণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম, তাহার বিষ্ণু ও শ্রী, এবং শিব ও উমা প্রভৃতি দেবতাদের অবদান লইয়া, দক্ষিণ-ভারতে কর্ণাট, অন্ধ্র ও দ্রমিড় অর্থাৎ কানাড়ী, তেলুগু ও তমিল্দের মধ্যে নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-ভারত হইতে বহু ব্রাহ্মণবংশ দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া দ্রাবিড়-ভাষীদের মধ্যে উপনিবিষ্ট হন, তাঁহাদের প্রচারিত বৈদান্তিক দর্শনের সঙ্গে পৌরাণিক দেবতাবাদ ও পূজানুষ্ঠানাদি, পল্লব রাজাদের আগ্রহে তমিল্ প্রভৃতি দেশেরা লোকেরা নূতন উৎসাহে গ্রহণ করিতে থাকে। সম্ভবতঃ ইহার পূর্বে, বৌদ্ধ ও জৈন মতের শুষ্ক নীতিনিষ্ঠতা ও ধর্মীয় বিচারের কাঠিন্য ধর্মজীবনে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল, লোকে তাহাতে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পাইতেছিল না। মানব-জীবনকে নূতন জীবনধারায় অভিষিক্ত করিতে পারে এমন বেদান্তাশ্রিত পৌরাণিক ধর্ম, এবং তদুপরি ভাস্কর্যে ও দেবায়তনে এই ধর্মের এক অপরূপ মূর্তিগ্রহণ—যেমন, মহাবলিপুরম্-এ ও অন্যত্র স্থাপিত পল্লব ও চোড় যুগের ভাস্কর্যে ও দেবায়তন-সমূহে—তমিল্ দেশের জনগণের প্রাণে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিল। দ্রাবিড় জাতির

শিল্পি-প্রাণের গোপন কোণে ধর্ম-সম্বন্ধে যে mysticism বা রহস্যবোধ সুপ্ত ছিল, তাহা যেন নূতন করিয়া প্রাণ পাইল। উপরন্তু কতকগুলি বৈষ্ণব ও শৈব সাধকের আবির্ভাবে, ও লোক-সমক্ষে তাঁহাদের উপদেশ ও জীবনবেদ প্রকাশের ফলে, সর্বত্র যেন একটা নূতন প্রাণ-স্পন্দন দেখা দিল। দিব্যোন্মাদ-যুক্ত তমিল্ বৈষ্ণব আড়্বার্ এবং শৈব নয়ন্মার্গণের রচিত পদ ও গাথা এই প্রাণস্পন্দনের অবিনশ্বর সাহিত্যিক রূপ—বিশ্বজন 'যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

প্রসঙ্গতঃ এ-কথারও উল্লেখ করিতে হয় যে, কতকগুলি খ্রীষ্টান লেখকের মতে দ্রাবিড় দেশে তমিল্দের মধ্যে এই ভক্তিধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রভাবে। দক্ষিণ-ভারতে ও অন্যত্র একটি প্রাচীন খ্রীষ্টান ইতিকথা প্রচলিত আছে যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে যীশু-খ্রীষ্টের এক সাক্ষাৎ শিষ্য কতকগুলি অনুচর লইয়া রোমান ও যিহুদিদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, এবং এখনকার মাদ্রাজের নিকটে প্রথম খ্রীষ্টান বসতি ও ধর্মকেন্দ্রের স্থাপন হয়। উত্তর কালে আবার সম্ভবতঃ ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে সিরিয়া হইতে সিরিয়া দেশের খ্রীষ্টানগণ আসে, এবং কেরলের রাজাদের অনেকে এই সিরিয়ান খ্রীষ্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে খ্রীষ্টান ধর্মমতের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিবার পক্ষে এই অনুমানের পিছনে তেমন যুক্তি নাই। যীশুর জীবনকে অবলম্বন করিয়া চারিখানি জীবনী-পুস্তক, যীশুর শিষ্যদের ক্রিয়াকলাপ, সন্ত পাউলের পত্রময় উপদেশাবলী, তথা রূপকচ্ছলে রচিত Apocalypsis বা Revelation অর্থাৎ 'প্রকাশ'-গ্রন্থ—এগুলির মধ্যে ঈশ্বরে গভীর আস্থা ও আত্মনিবেদনের কথা থাকিলেও, তাহা ভারতের ধর্মসাধনার ধারায় এমন নূতন বস্তু ছিল না যে আগত-মাত্রেই তাহার প্রভাব ভারতীয় জনগণের জীবনে পড়িবে। শৈব, বৈষ্ণব ও সৌগত ভাগবত ধর্ম, এবং গীতোক্ত ভক্তিবাদ, খ্রীষ্ট-জন্মের বহু পূর্বেই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তক্ষশিলায় গ্রীক রাজা অন্তলিকিত (আন্তিআল্কিদাস্ Antialkidas)-এর রাজদূত হেলিওদোর Heliodoros, যিনি মালবদেশের রাজা ভাগভদ্র ত্রাতার সভায় আসিয়াছিলেন, একটি শিলাস্তম্ভ-লেখে 'ভাগবত' বা বিষ্ণুভক্ত বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন, এবং তিনি একটি বিষ্ণুমন্দিরের সংশ্লিষ্ট গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'প্রপন্না ভক্তি' ভারতের প্রাচীন শিক্ষা, খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের শিক্ষা। সুতরাং

ভক্তিধর্মের সিরিয়া বা পালেস্তীন হইতে ভারতে আসিবার কথা স্বীকার করিবার পক্ষে কোনও যুক্তিযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এইভাবে পুনরুজ্জীবিত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অবলম্বন করিয়া, ভক্তিবাদ আসিয়া দক্ষিণে তমিল্‌দের জয় করিয়া লইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তমিল্‌-দেশে এই ভক্তিবাদ, শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ধারায় প্রবাহিত হয়। সগুণ ঈশ্বর, মানবাকারে দৃষ্ট ঈশ্বর—মানবের তাবৎ শ্রেষ্ঠ গুণের ও শক্তির আধ্যাত্মিক জগতে উন্নয়ন করিয়া, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কালে নানা দেশে নানা জনের মধ্যে যে-সমস্ত দেবতার রূপ ধ্যান করা হইয়াছে, যে-সমস্ত দেব-কল্পনা মানুষের অনন্ত আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করিয়াছে, তন্মধ্যে, শিব ও বিষ্ণুর ধ্যানের ও রূপের মতো বিশ্বম্ভর, বিশ্বপ্রপঞ্চের অতিগামী ও ইহার মধ্যে নিলীন, ও সঙ্গে-সঙ্গে ব্যক্তিত্বশালী ও কবিত্বময়, মানবের শাশ্বত আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা কেবল যাহাতেই পাওয়া যায়, এমন ধারণা আর কোথাও মিলে না। বেদান্ত-দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে গ্রথিত হইয়া দার্শনিক বিচারে বিষ্ণু ও শিবের স্থান বহু ঊর্ধ্বে উন্নীত হইয়াছে। দক্ষিণ তথা সমগ্র ভারতে জ্ঞান-মূলক শিব-কেন্দ্রিক বেদান্তের চরম বিকাশ হইয়াছে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মতে, ভক্তিময় বিষ্ণু-কেন্দ্রিক বেদান্ত তেমনি পূর্ণ হইয়াছে শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত মতে। এতদ্ভিন্ন, কাশ্মীরের ত্রিক শৈব মত, তমিল্‌-দেশের শৈব-সিদ্ধান্ত মত, পূর্ব-ভারতের শাক্তগণের স্ফোটবাদ, প্রাচীন পাশুপত মত, বৈষ্ণব নিম্বার্ক মত প্রভৃতি আছে। সেইরূপ বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণের বিশিষ্টাদ্বৈত মত, গুজরাটের পুষ্টিমার্গ, বাঙ্গালার বা গৌড়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ, আসামের এক-শরণিয়া ধর্ম প্রভৃতি আছে। শতকের পরে শতক ধরিয়া, এইভাবে শিবকেন্দ্রিক ও বিষ্ণুকেন্দ্রিক বেদান্ত ভারতের চিত্ত ও হৃদয়কে উর্বর ও সরস করিয়া রাখিয়াছে। ইহা লক্ষণীয় যে, উপনিষদ্ ও গীতোক্ত বেদান্ত-দর্শনের যে দুই প্রধান বিরাট্ এবং নিখিল ভারতব্যাপী প্রকাশ দেখা যায়—শাঙ্কর-বেদান্ত ও রামানুজ-বেদান্ত, সে দুইটির উদ্ভব ঘটে ভক্তিবাদের উৎস-স্বরূপ দ্রাবিড় দেশে—দ্রমিড়-কেরলের হৃদয় ও মস্তিষ্ক হইতে।

'নয়ন্মার্' বা শিবভক্তগণ—তমিল্‌ শিবভক্তি-বিষয়ক পদসংগ্রহ

তমিল্‌-ভাষায় শৈব-ভক্তির আকর-গ্রন্থ হইতেছে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে নম্‌পি-অণ্ডার্‌-নম্‌পি নামে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক সংকলিত বৃহৎ

সংগ্রহ-গ্রন্থ 'পন্নিরু-তিরুমুরৈ'। এই পুস্তক একাদশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার মধ্যে প্রথম সাত খণ্ড 'তেরারম্' ('দেবতায় অর্পিত মালা') নামে পরিচিত। ইহাতে সম্বন্ধ ('চম্পন্তন্'), অপ্পর্, সুন্দর ('চুন্তরর্')—এই তিন জন শৈব ভক্তের রচিত পদ নিবদ্ধ আছে। অষ্টম খণ্ড 'তিরু-বাচকম্'-এ আছে ভক্ত মাণিক্ক-বাচকর্-এর রচিত ৫১টি কবিতা। এই চারজন—সম্বন্ধ, অপ্প, সুন্দর ও মাণিক্য-বাচক—ইঁহারা-ই মূল শৈব ভক্ত—শিবভক্তি-শাস্ত্রের মধ্যমণি ইঁহাদের রচিত। নবম খণ্ডে আছে অপর নয় জন শিবভক্তের পদ। দশম খণ্ডে যোগী তিরু-মূলর্, যিনি সুপ্রাচীন যুগে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার পদ। একাদশ খণ্ডে অন্য নানা শৈব ভক্তের রচিত পদ, এবং শিবলীলা-বর্ণনাত্মক কতকগুলি কবিতা আছে, নম্পি-অণ্টার্-নম্পি-র নিজেরও দশটি পদ আছে। এই একাদশ খণ্ডে 'তিরুমুরৈ'-এর সহিত সংশ্লিষ্ট পরবর্তী কালে চেক্কিড়ার্-রচিত শিবলীলা-বিষয়ক গ্রন্থ 'পেরিয়-পুরাণম্' ('মহাপুরাণ')-ও তমিল্-দেশে সুপরিচিত। এই একাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'তিরুমুরৈ' ছাড়া, পরবর্তী কালে 'চতুর্দশ সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র' বেদান্ত-সূত্রের আধারের উপরে রচিত হয়, এইগুলিও শৈব ভক্তি ও দর্শনের মৌলিক ও প্রামাণিক গ্রন্থ।

মাণিক্ক-বাচকর্-এর 'তিরু-বাচকম্' ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে পাঠ করিলেও অপূর্ব আধ্যাত্মিক আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। এইরূপ গ্রন্থ পাঠ-কালে দৈব-আরাধনার আনন্দ ও সুখ পাওয়া যায়, আমরা মহান্ ভক্ত-প্রাণের সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য সাযুজ্য লাভ করি। ভক্তি ও আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থকে (এবং অন্য তিন জন শিব-ভক্তদের গ্রন্থকে) তথা তমিল্ আড়্বার্ বা বিষ্ণু-ভক্তগণের রচনাকে, ভাবশুদ্ধিতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় রচনা বলা যায়। নয়ন্মার্ বা ভক্তগণের রচনাকে তমিল্ শৈবগণ উপনিষদের পর্য্যায়ের গ্রন্থ মনে করেন।

'আড়্বার্' বা বিষ্ণুভক্তগণ—বিষ্ণুভক্তি-বিষয়ক তমিল্ পদের সংগ্রহ

তমিল্-ভাষায় শৈব ভক্তগণের রচনার সঙ্গে-সঙ্গে, বৈষ্ণব ভক্ত আড়্বার্গণের পদ-সংগ্রহের উল্লেখ অপরিহার্য্য। তমিল্ বৈষ্ণবগণের পরম্পরায় আড়্বার্গণের আবির্ভাব হয় প্রাচীন যুগে। পরবর্তী শ্রীনাথমুনি বারো জন আড়্বারের পদ সংগ্রহ করেন। শ্রীনাথমুনি, আধুনিক তমিল্-সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মতে, 'তিরুমুরৈ' বা শৈব ভক্তিসাহিত্যের সংকলন-কর্তা

'নম্পি-অণ্টার্-নম্পি'-র সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু শ্রীসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি ইঁহার বহু পূর্বে আবির্ভূত হন। এই বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ 'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্' (বা 'প্রবন্ধম্') নামে সুপরিচিত। ইহা শৈব 'তিরুমুরৈ'-এর সম-পর্য্যায়-ভুক্ত।

আড়্বার্দের সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য প্রথম বিবরণ প্রকাশিত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বর্গত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ। বহুদিন ধরিয়া ইনি মাদ্রাজে ছিলেন, আড়্বার্দের সম্বন্ধে ইঁহার প্রবন্ধাবলী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বহু বৎসর অতীত হইল প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে, ১৩১৮ সালে ইঁহার দেহত্যাগের পরে, ১৩১৯ সালে ইঁহার রচিত উপাদেয় তথ্যপূর্ণ 'শ্রীরামানুজ-চরিত'-এর ভূমিকা রূপে এই আড়্বার্-কাহিনী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় (প্রথম সংস্করণ বাঙ্গালা ১৩১৯ সন; তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬ সন)। তদনন্তর আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস মহাশয় আড়্বার্দের সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করেন—ধারাবাহিক-ভাবে তাঁহার 'উজ্জীবন' পত্রিকায়, ও পরে পুস্তকাকারে ('আড়্বার্', শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ১৩৬৫ সাল)। এই অতি চমৎকার পুস্তকে আড়্বার্দের সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে, বহু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। সাধারণ পাঠকের আড়্বার্ ও 'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্' সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার, তাহা আচার্য্য শ্রীরামানুজদাস এই মূল্যবান্ গ্রন্থে পাণ্ডিত্য ও অধিকার-সহ প্রকাশ করিয়াছেন; এই বিষয়ে এই গ্রন্থের অধ্যয়ন অপরিহার্য্য। এই বারোজন আড়্বারের নাম হইতেছে—(১) পোয়্কৈ, (২) ভূদত্ত বা পুতত্তর্, (৩) পেয়্, (৪) তিরু-মড়িচৈয়র্, (৫) তিরুপ্পন্, (৬) তোণ্টরাটি-প্পোটি, (৭) তিরু-মঙ্কৈ, (৮) কুলশেখর, (৯) পেরিয়, (১০) আণ্টাল্, (১১) নম্মা বা শঠকোপ, এবং (১২) মধুরকবি। ইঁহারা সকলেই দিব্যোন্মাদ-যুক্ত ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের তমিল্ নাম ভিন্ন প্রত্যেকের একটি করিয়া সংস্কৃত নামও আছে—উভয় ভাষার নাম আচার্য্য রামানুজদাসের পুস্তকে পাওয়া যাইবে। 'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্' গ্রন্থে ইঁহাদের রচিত ৪০০০ পদ, নিম্নে প্রদত্ত কয়টি বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত দেখা যায়; যথা—

[১] **মুতলায়িরম্**—৯৪৭টি পদ—ইহার মধ্যে পেরিয়াড়্বার্, আণ্টাল্, কুলশেখর, তিরু-মড়িচৈয়র্, তোণ্টরাটিপ্পোটি, তিরুপ্পন্ এবং মধুরকবি —এই সাতজনের পদ আছে;

[২] **ইরণ্টাম্**—১১৩৪টি পদ—এই খণ্ড সম্পূর্ণভাবে তিরুমঙ্কৈ আড়্বার্ কর্তৃক রচিত ;

[৩] **মুন্'র়'ান্ (তিরু-বায়্-মোড়ি)**—১১০২টি পদ, সম্পূর্ণ-রূপে নম্মাড়্বার্ বা শঠকোপের রচিত পদ এগুলি ;

[৪] **ইয়র্পা**—৮১৭টি পদ, ইহাতে পোয়্কৈ, ভূদত্ত, পেয়্ এবং উপরন্তু তিরু-মড়িচৈয়র্, নম্মাড়্বার্ এবং তিরু-মঙ্কৈয়াড়্বার্-এর রচনা আছে।

'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্'—নম্মাড়্বার বা শঠকোপের 'তিরু-বায়্-মোড়ি' বা সহস্র-গীতি

প্রস্তুত 'সহস্র-গীতি' পুস্তকখানি হইতেছে 'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্'-এর চারি সহস্র পদের মধ্যে তৃতীয় খণ্ড 'তিরু-বায়্-মোড়ি'; এক সহস্রের কিঞ্চিদধিক হইলেও, ইহাকে শঠকোপ-রচিত 'সহস্র-গীতি' বলা হয়। সমস্ত-পদটির অর্থ—'শ্রী-মুখ-বাণী'; 'তিরু'=শ্রী, 'বায়্'=মুখ, এবং 'মোড়ি'=ভাষা, বচন, বাণী। বঙ্গাক্ষরে মূল তমিল্ পদ, প্রতি পদের অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দের বা বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদ, বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ এবং ভাবার্থ টীকা—এইগুলি লইয়া এই পুস্তক বাঙ্গালা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ভারতীয় সাহিত্যে একটি অনুপম গ্রন্থ হইয়াছে।

আড়্বার্গণের ভাবধারা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকারী আমি নহি। এ বিষয়ে আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস যাহা তাঁহার 'আড়্বার্' গ্রন্থে বিশদ করিয়া বলিয়াছেন, তাহা হইতে আড়্বার্ ভাব-ধারার সম্যক্ প্রণিধান হইবে। আড়্বার্-ভাবধারায় আচার্য্য শ্রীরামানুজদাস এই বিষয়গুলির বিচার করিয়াছেন—(ক) জ্ঞানাধিক (বা জ্ঞানাতীত) অবস্থা, (খ) প্রেমদশা, (গ) দাস্যভাব, (ঘ) সখ্যভাব, (ঙ) বাৎসল্যভাব, (চ) নায়িকাভাব—(চ-১) শ্রীদেবী, ভূমিদেবী ও নীলাদেবীর ভাব, (চ-২) সীতাদেবীর ভাব, (চ-৩) কৃষ্ণমহিষী এবং মথুরানাগরীগণের ভাব, (চ-৪) গোপীগণের ভাব, (চ-৫) আণ্টালের নায়িকা-ভাব, এবং (চ-৬) নায়িকা-ভাবের উপসংহার। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাব, যাহা বৈষ্ণব সাধনার পথ বা উপায় অথবা নির্দেশ স্বরূপ, এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে যাহার পরিচয় পাই, সে সমস্তই আড়্বার্গণের গীতির মধ্যে পরিপূর্ণ এবং বিশদ-ভাবে নিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণব সাধনায় মধুর-ভাবে সাধনা হইতেছে একটি বিশিষ্ট বস্তু, ইস্লামী

সূফী-সাধনা যাহার অনুরূপ। সেই মধুর-ভাবে সাধনাকে লইয়া যেমন বাঙ্গালায় বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী, হিন্দীতে সূরদাস প্রভৃতির পদ, সে-সমস্তের পূর্বচ্ছায়া আমরা আড়্বার্-গীতিতেই পাইতেছি। বঙ্গদেশ-সমেত সমগ্র ভারতের বৈষ্ণব মধুর-রসের আলোচনায় তমিল্ আড়্বার্-গীতিসমূহকে প্রাথমিক শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

স্ত্রী-আড়্বার্ আণ্টাল্ (আণ্ডাল্) বা গোদাদেবীর ৩০টি পদ 'তিরুপ্পাবৈ' বা 'শ্রীব্রত' হইতে গোপী-ভাবে প্রেমের পথে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষার ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ৩০টি পদের একাধিক ইংরেজি অনুবাদও হইয়াছে। তিরুপতি দেবস্থান হইতে অতি সুন্দর ৩০ খানির অধিক রঙ্গীন চিত্রে শোভিত তমিল্ ও তেলুগু অক্ষরে ইহার দুইটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে চিত্রময় টীকারূপে এই মহিলা আড়্বার্-প্রোক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সাধনার সার্থক ও মনোহর বর্ণনা দেখিতে পাই।

শ্রীরামানুজস্বামী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ব ধারা বা পরম্পরা এই আড়্বার্দের মধ্যে। ইঁহারা-ই শ্রীরামানুজস্বামীর দার্শনিক প্রকাশের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছিলেন। সেইজন্য শ্রীসম্প্রদায়ের আলোচনায় আড়্বার্দের জীবনী ও রচনাকে অন্যতম মুখ্য আধার বলিয়া ধরিতে হয়। শ্রীসম্প্রদায়ের মধ্যে দিব্যজ্ঞান এবং দিব্যানুভূতির দুইটি ধারা সমমূল্য বলিয়া বিবেচিত—(১) সংস্কৃত বা বেদ-বেদান্তের ধারা, এবং (২) তমিল্ আড়্বার্দের পদ-গীতির ধারা। উভয়-ই 'বেদান্ত'-পদবাচ্য—এই দুই বেদান্ত মতকে, সংস্কৃত এবং তমিল্—'উভয়-বেদান্ত' বলা হয়। ইহা হইতেই তমিল্ দেশে বৈষ্ণব সাধনায় 'নাল্-আয়িরপ্-প্রবন্ধম্'-এর মর্য্যাদা অনুমান করা যায়। এই পুস্তককে তমিল্ বৈষ্ণব ভক্তদের পদের 'বেদ-সংহিতা' বলা যাইতে পারে।

বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা এবং জ্ঞান ও সাহিত্যবোধের সহিত 'নাল্-আয়িরপ্-প্রবন্ধম্'-এর আক্ষরিক সংস্কৃত অনুবাদ ও সংস্কৃত টীকা শ্রীসম্প্রদায়ের ধর্মগুরুগণ করিয়া গিয়াছেন, এবং এই-ভাবে তমিল্-জগতের বাহিরে ইহার প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুর (১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গদেশে যেমন তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ 'পদামৃতসমুদ্র'-তেও তাঁহার স্বকৃত সংস্কৃত টীকা সংযোজিত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনপদের মান্যতা বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। বহু পূর্বে বাঙ্গালার বৌদ্ধ সহজ-যানের

চর্য্যাগীতির-ও এইরূপ সংস্কৃত টীকা রচিত হইয়াছিল। লোকভাষায় লোকোত্তর সাহিত্য রচিত হইলে, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে তাহার সমাদরের অভাব কখনও হয় নাই।

তমিল্-দেশের এবং তমিল্-দেশের বাহিরেকার শ্রীসম্প্রদায়-শাসিত বা -পরিচালিত মন্দিরে বেদ-মন্ত্রের মতো 'নাল্-আয়িরপ্-প্রবন্ধম্'-এর পদ নিত্য গীত ও পঠিত হয়। এই তমিল্ ভাষার গৌরব যে কতটা, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। 'সহস্র-গীতি' বা 'শ্রীমুখ-বাণী' গ্রন্থের প্রস্তুত সংস্করণে বাঙ্গালী পাঠককে, তমিল্ ভাষার ধ্বনি ও প্রকৃতি বুঝিতে, বিশেষ করিয়া আর্য্য-ভাষা সংস্কৃতের পাশে এই দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষার পার্থক্য বুঝিতে কতকটা সাহায্য করিবে।

দ্রাবিড় ভাষা—প্রাচীন তমিল্

সংস্কৃত এবং দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে —উচ্চারণ-ঘটিত, ব্যাকরণ-ঘটিত, এবং ধাতু-, প্রত্যয়- ও শব্দ-ঘটিত। আবার দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের ফলে কতকগুলি বিষয়ে সমতাও দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় একাক্ষর ধাতুতে, গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ নিয়ম অনুসারে কতকগুলি পরিবর্তন হয়, কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় ধাতু সর্বত্র অবিকৃত থাকে। সংস্কৃত ও দ্রাবিড় উভয় ভাষাতেই ধাতুর পরে প্রত্যয় বসে, কিন্তু সংস্কৃতে প্রত্যয়ের সংখ্যা ও কার্য্য দ্রাবিড়-প্রত্যয় হইতে অনেক অধিক, এবং সংস্কৃত ও দ্রাবিড় উভয় ভাষায় প্রত্যয়ের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। দ্রাবিড় প্রত্যয়গুলি মূলে পৃথক্ পৃথক্ ধাতু বা শব্দ, অন্য ধাতুর পরে আসিয়া সেগুলি প্রত্যয়ের কাজ করে। যেমন বাঙ্গালায় 'মানবেরা' ='মানব'+'-এরা'-প্রত্যয়, অন্যত্র এই প্রত্যয় '-এরা' নিরর্থক শব্দ, বাক্যে অব্যবহৃত—ইহা সংস্কৃতের অনুসারী; কিন্তু বাঙ্গালা বহুবচনে 'মানব-সকল' বা 'মানব-গণ', 'মানব' শব্দ+বহুত্ববাচক শব্দ 'সকল' বা 'গণ', এখানে এইরূপ সংযোজিত শব্দ প্রত্যয়ের কাজ করিতেছে বটে, কিন্তু মূলে এই দুইটি পৃথক্-সত্তা-বিশিষ্ট শব্দ। আদি সংস্কৃতে বা প্রবৈদিক ভাষায় এক সময়ে নাম বা সর্বনাম শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত কতকগুলি অব্যয় ছিল, সেগুলি ইংরেজির Prepositions-এর মতন, বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বে বসিত, বাক্যের মধ্যে স্বাধীন ভাবে অন্যত্রও বসিত। এই Preposition-ধর্মী অব্যয়গুলি পরে ক্রিয়ার

সহিত সংযুক্ত 'উপসর্গ' হইয়া দাঁড়ায়। দ্রাবিড় ভাষায় এই উপসর্গের পাট একেবারেই ছিল না ও নাই। দ্রাবিড়ে ক্রিয়ায় নঞ্-বাচক কাল-রূপ আছে, সংস্কৃতে তাহা অজ্ঞাত; যেমন—'কুল্বিকৃকিরে'ন্' '=আমি স্নান করি; 'কুল্বিত্তেন্' '=আমি স্নান করিয়াছি; 'কুল্বিপ্পেন্' '=আমি স্নান করিব; কিন্তু 'কুল্বিয়েন্' '=আমি স্নান করি না, করি নাই, বা করিব না। দ্রাবিড় ভাষার সাধারণ ধাতু ও শব্দ সংস্কৃত ভাষার ধাতু ও শব্দ হইতে একেবারে পৃথক্। এই-রূপ নানা মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও, ভারতে সুপ্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ফলে, যেমন একদিকে সংস্কৃত ভাষার সহস্র-সহস্র শব্দ দ্রাবিড় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে শত-শত দ্রাবিড় শব্দ-ও সংস্কৃতে গৃহীত এবং সংস্কৃতের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। তবে 'সহস্র-গীতি'র মতো তমিল্ পুস্তকের যে কোনও ছত্র সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে, এই দুই ভাষার মধ্যে যে একটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

'সহস্র-গীতি' গ্রন্থের প্রস্তুত সংস্করণের মূল্য ও উপযোগিতা

উত্তর-ভারতের লোকেদের মধ্যে তমিল্ অথবা অন্য দ্রাবিড় ভাষা চর্চার তাগিদ বা আগ্রহ নাই; এবং সংস্কৃতের সঙ্গে অন্য আর্য্য ভাষা (প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষা) দক্ষিণে বিশেষরূপে প্রচলিত হওয়ায়, উত্তর-ভারতের আমরা সাধারণতঃ ধরিয়া লই যে দক্ষিণ-ভারতের লোকেদের সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী না শিখিয়া উপায় নাই, আমাদের পক্ষে তমিল্ তেলুগু অনাবশ্যক। এইরূপ মনোভাব, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় সংহতির পক্ষে অনুকূল নহে। দক্ষিণ ও উত্তর, দ্রাবিড় ও আর্য্য, এই দুই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান-বিস্তার এবং সাহিত্যিক আদান-প্রদান যত হয়, ততই উভয়ের পক্ষে মঙ্গল। এ বিষয়ে দক্ষিণের লোকেদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। তাঁহারা বরাবরই সংস্কৃত শিখিয়া আসিয়াছেন। উপরন্তু এ কথা-ও ঠিক যে, ভারতে সংস্কৃত ভাষার গঠনে দ্রাবিড়-ভাষী দক্ষিণেরও হাত আছে; এবং সংস্কৃত নিখিল ভারতের সংস্কৃতিবাহিনী ভাষা, ইহা কেবল উত্তর-ভারতের নহে। তবে দক্ষিণের লোকেরা এখন হিন্দী শিখিতেছেন, এবং হিন্দীতে নানা তেলুগু, কানাড়ী, তমিল্, মালয়ালম্ বইয়ের অনুবাদও করিতেছেন; তেলুগু তমিল্ প্রভৃতি ভাষার বই নাগরী অক্ষরে ছাপা হওয়ায় উত্তর-ভারতের লোকের

পক্ষে পাঠের সুবিধা হইতেছে। দিল্লীর সরকারী সংস্থা 'সাহিত্য একাডেমী' (বা 'অকাদেমী') বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই পারস্পরিক অনুবাদের কাজ হাতে লইয়াছেন। কিন্তু এ-সমস্ত সত্বেও দ্রাবিড় ভাষার প্রচার বা চর্চা উত্তর-ভারতে তেমন অগ্রসর হইতেছে না।

এই অবস্থায়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস যে তমিল্-এর এই বিরাট্ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গ্রন্থখানি বঙ্গাক্ষরে মূল সহ অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিলেন, তজ্জন্য ভারতের Integration বা সংহতি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে সসম্মান সাধুবাদ দিবেন। বহু বৎসর পূর্বে, ১৩৪৪ সালে, স্বর্গত অধ্যাপক ডাক্তার নলিনীমোহন সান্যাল প্রাচীন তমিলের এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, মানুষের ধর্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে ত্রিবর্গ ধর্ম, অর্থ এবং কাম লইয়া রচিত অপূর্ব পুস্তক, কুর'ল্'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। তাহাতে মূল তমিল্ নাই এবং বাঙ্গালা অনুবাদটি ছিল ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ। 'সহস্র-গীতি' ('তিরু-বায়্-মোড়ি') বা 'নাল্-আয়িরপ্-প্রবন্ধম্'-এর পূরা ইংরেজি অনুবাদ বাহির হয় নাই। কেবল নানা সংগ্রহ-গ্রন্থে দুই-দশটা পদের অনুবাদ পাওয়া যায়, এবং আণ্টাল্-এর 'তিরুপ্পাবৈ' খণ্ডের ৩০টি শ্লোকের একাধিক ইংরেজি অনুবাদ-ও আছে। সোজা তমিল্ হইতে, অবশ্য সংস্কৃত অনুবাদের ও টীকার সহায়তা লইয়া, প্রত্যেক তমিল্ পদ বা বাক্যের আক্ষরিক বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়া, বঙ্গভাষী জনগণের সমক্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস এই মহাগ্রন্থের একটি পূরা খণ্ড, ইহার এক চতুর্থাংশ, ধরিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি বাঙ্গালা ও তমিলের মধ্যে মিলন-সূত্র বাঁধিয়া দিলেন, তাঁহার এই কাজের জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিব।

তমিল্ লিপির বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

তমিল্ বর্ণের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণ যাহা এই পুস্তকে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। আচার্য্য শ্রীরামানুজদাস তমিলের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, ইহা তাঁহার বঙ্গাক্ষরে অনুলিখন হইতে সুস্পষ্ট। তিনি বাঙ্গালা লিপিতে কোনও নূতন বর্ণের আমদানি করেন নাই, বিন্দু বা রেখা বা অন্য চিহ্ন দিয়া কোনও বাঙ্গালা বর্ণকে পরিবর্তিত করিয়া ব্যবহার করেন নাই। সেই জন্য তাঁহার প্রতিবর্ণীকরণে কতকগুলি

অসম্পূর্ণতা তিনি পরিহার করিতে পারেন নাই। তমিল্ ভাষায় এমন কতকগুলি ধ্বনি ও সেই ধ্বনির প্রকাশক বিশেষ বর্ণ আছে, যেগুলি সংস্কৃত ও সংস্কৃত-জাত আর্য্য ভাষায় অজ্ঞাত। তমিলের বর্ণমালা ও বানানের পদ্ধতি 'সঙ্গম্' সাহিত্যের যুগের অন্ত্য ভাগে—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে নির্ধারিত হইয়া যায়। ইহার পূর্বে ব্রাহ্মী লিপিতে প্রথম প্রাচীনতম তমিল্ লিখিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি, যেগুলির ভাষা প্রাচীন তমিল্ বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন, সেগুলির ভাষা সম্বন্ধে লিখন ও অর্থ উভয় দিকেই সন্তোষজনক পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। আজকাল যে তমিল্ লিপি প্রচলিত আছে, তাহা দক্ষিণ-ভারতে পল্লব-বংশীয় রাজাদের যুগে ব্যবহৃত সংস্কৃত লিপির একটি সংক্ষিপ্ত বা লঘু রূপ মাত্র। সংস্কৃতে প্রযুক্ত সকল বর্ণ তমিলের পক্ষে অনাবশ্যক বিধায়, সংস্কৃতের অনেকগুলি বর্ণ নূতন-গঠিত তমিল বর্ণমালায় গৃহীত হয় নাই। এখন হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্বেকার তমিলের উচ্চারণ ধরিয়া এই লিপি গঠিত বা গৃহীত হইয়াছিল। সেই উচ্চারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে লিপি, প্রাচীন বানান, মধ্য-যুগের ও আধুনিক কালের উচ্চারণ বিচার করিয়া এ বিষয়ে কতকগুলি নিষ্কর্ষে পঁহুছানো গিয়াছে।

প্রাচীন তমিল্-এর বর্ণমালা এইরূপ ছিল—

স্বরবর্ণ—**অ, আ**; **ই, ঈ**; উ, ঊ; হ্রস্ব **এ**, দীর্ঘ **এে** (**ে**); হ্রস্ব **ও**, দীর্ঘ **ওো** (**ে া**); **ঐ**, **ঔ**; [ঋ, ৠ, ঌ—এগুলি তমিলে নাই]

ব্যঞ্জনবর্ণ—স্পর্শবর্ণ—**ক, ঙ; চ, ঞ; ট, ণ; ত, ন; প, ম**; [ঘোষবৎ **গ, জ, ড, দ, ব** (বর্গীয় ব=b) এবং মহাপ্রাণ **খ ঘ, ছ ঝ, ঠ ঢ, থ ধ, ফ ভ** বর্ণ ও ধ্বনিগুলি তমিলে নাই; পরবর্তী কালে, 'সঙ্গম্' যুগের বহু পরে, শব্দের মধ্যে একবার মাত্র আসিলে, **ক চ ট ত প** ঘোষবৎ **গ জ ড দ ব** (=ব, **b**)' রূপে উচ্চারিত হইত; এবং **চ**-ও, **শ, স** রূপে উচ্চারিত হইত।]

অন্তঃস্থবর্ণ—**য** (=য়), **র, ল, ব** (=ব, =**w** বা **v**); [উষ্মবর্ণ 'শ ষ স হ' নাই]; বিসর্গ-স্থানীয় একটি বিশেষ বর্ণ আছে—**.·.**, নাম 'অয়্তম্';

দন্তমূলীয়—**ন', র'**; মূর্ধন্য—**ঝ** (=বৈদিক ळ), এবং **ড়** [শেষের এই বর্ণ বা ধ্বনি তমিলের নিজস্ব; সংস্কৃত অঘোষ মূর্ধন্য 'ষ'-এর ঘোষ-রূপ,

রোমান লিপিতে ইহাকে অনেক সময়ে zh রূপে লিখিত হয়; বহু পূর্বে মূর্ধন্য 'ষ'-এর ঘোষবৎ রূপ বলিয়া, আমি ইহাকে 'ষ' রূপে লিখিতে চাহিয়াছিলাম—এখন দেখিতেছি তাহা জটিল, এবং বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর হইবে; পরে আমি এই তমিল্ বর্ণকে বাঙ্গালায় (ইংরেজি zh-এর অনুকরণে) 'ঝ' রূপেও লিখিয়াছি। এখন মনে হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজ-দাস মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিন্দু-যুক্ত ড=ড় (=rzh, zh) ব্যবহার করাই সর্বথা সহজ এবং উপযোগী হইবে।—তবে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, এই ড় আমাদের বাঙ্গালার 'ড়' নহে, ইহা জিভ উলটাইয়া উচ্চারিত zh-এর ধ্বনি।]

রোমান লিপিতে এই রীতি অনুসারে তমিল্ বর্ণমালার প্রতিরূপ এই:

a ā ; i ī ; u ū ; e ē ; o ō ; ai, au ;

k, ṅ ; c, ñ ; ṭ, ṇ ; t, n ; p, m ; y, r, l, v ; n', r' ;

ḷ ; ẓ ; ḥ (=অয়্তম্)।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ 'এ'-কার এবং 'ও'-কার এবং দন্ত্য **ন** ও দন্তমূলীয় **ন'**, তথা দন্ত্য **র** এবং দন্তমূলীয় **র'**, এবং দন্ত্য **ল**, মূর্ধন্য **ল**—এগুলির মধ্যে বিদ্যমান যে পার্থক্যটুকু আছে তাহা রক্ষিত না হওয়াতে, এই পুস্তকে ব্যবহৃত Bengali Transliteration of Tamil, তমিলের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ, একটু অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা মারাত্মক অপরাধ নহে। তমিল্-ভাষায় একটু অধিকার হইলেই, বাঙ্গালী পাঠক সহজেই এই অসম্পূর্ণতা কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন।

আমার জ্ঞান-গোচর মতো, নূতন কোনও বর্ণ বাঙ্গালা লিপির মধ্যে না আনিয়া এবং কেবল একটি 'সূচক-চিহ্ন' ['] ব্যবহার করিয়া, আচার্য্য শ্রীরামানুজদাসের পদ্ধতিকে একটু-আধটু পরিবর্তিত করিয়া লইলেই চলিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইঁহার সংস্করণে প্রদত্ত আদিম এবং অন্তিম ইত্তুটি পদের প্রতিবর্ণী-করণ, এবং ঐ পদদ্বয়ের আমার প্রস্তাবিত প্রতিবর্ণীকরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

পৃঃ ১— উয়র্‌বর বুয়র্‌নল মুডৈয়ব নেবনন্,
মযর্‌বর, মদিনল, মরলিন নেবনবন্,
অয়র্‌বরু, মমরর্ক, লদিপদি, য়েবনবন্
তুয়ররু, সুড়ড়ড়ি, তুডুদেড়ন্ মননে।

ইহার পূর্ণতর প্রতিবর্ণ—

উয়র্‌বর’ বুয়র্‌নল মুটৈয়বন্‌’ এবন’বন্‌’,
ময়র্‌বর’ মতিনল মরুল্লান’ন্‌ এবন’বন্‌’ ;
অয়র্‌বরু’ মময়র্‌কল্ল’ তিপতিয়্‌-এবন’বন্‌’
তুয়ররু’ চুটরটি তোড়ুতেড়েন্‌’ মন’নে’ !

পৃঃ ৪৭২— স্থড়্‌ন্দকন্‌ রাড়্‌ন্দুয়রুন্‌ দমুডি বিল্‌পেরুম্‌ বাড়েয়ো !
স্থড়্‌ন্দদ নিরুপেরি য়পর নন্‌মলরস সোদীয়ো !
স্থড়্‌ন্দদ নিরুপেরি য়স্থড়ব্‌ ঞানবিন্‌ প্রমেয়ো !
স্থড়্‌ন্দদ নিরুপেরিয়-এন্ন বাবরস্‌ স্থড়্‌ন্দায়ে।

পূর্ণতর প্রতিবর্ণ—

চুড়্‌স্তু’কন্‌’ রাড়্‌স্তুয়র্‌ন্‌ তমুটি বিল্‌পেরুম্‌ পাড়েয়ো !
চুড়্‌স্তুত নি’র্‌’পেরি য়পর নন্‌’মলর্‌চ্‌ চোত্তীয়ো !
চুড়্‌স্তুত নি’র্‌’পেরি য়চুটর্‌ ঞান্‌’বিন পমেয়ো !
চুড়্‌স্তুত নি’র্‌’পেরি য়-এন্‌’ন’ বাবর’চ্‌ চুড়্‌স্তায়ে !

পূর্ণতর প্রতিবর্ণ ধরিয়া ইচ্ছামত তমিলের আধুনিক উচ্চারণ পাঠ করা যাইবে—যেমন **চ** স্থানে **শ** বা **স**, **ট** স্থানে (বাঙ্গালা ও হিন্দীর মতো) **ড়**, **ক** স্থানে **গ** বা **হ**, **প** স্থানে **ব** (b) বা র (v, w), **র্‌**’-**র**’ = **ত্ত্র** বা **ট্ট্র**, এবং **ন্‌**’-**ন্ন**’ বিকল্পে **ণ্ড্র** রূপে উচ্চারিত হয়, **ব** সর্বত্র w বা v ; এবং **ড়**-কে, মূর্ধন্য ষ-কারের ঘোষবৎ রূপ, zh বা rzh রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। ‘সহস্র-গীতি’ পুস্তকে ব্যবহৃত তমিলের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ **এ** এবং **ও** লইয়া একটু মুশ্‌কিলে পড়িতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা আক্ষরিক অনুবাদে মূল তমিল্‌ ছত্রগুলির মধ্যে অবস্থিত শব্দসমূহের সন্ধি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, অল্প জানিলেও ঠিক পাঠ বা বর্ণান্তরীকরণ ধরা তাদৃশ কষ্টকর হইবে না।

তমিল্‌ বানান, যাহা এখনও প্রচলিত আছে, তাহা দেড় হাজার বছরের পূর্বেকার প্রাচীন তমিলের উচ্চারণের পরিচায়ক। এই প্রাচীন বানান বজায় আছে, কিন্তু আধুনিক উচ্চারণ বহুশঃ একেবারে অন্য ধরনের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ তমিল্‌-ভাষী পণ্ডিত পর্য্যন্ত-ও এ বিষয়ে অবহিত নহেন—তাঁহারা মনে করেন যে আধুনিক উচ্চারণ-ই পূর্ণভাবে প্রাচীন তমিলেও প্রচলিত ছিল। উপরে প্রদত্ত ‘তিরু-বায়্‌-মোড়ি’-র দুইটি পদ, লিখিত তমিলের বানান ধরিয়া রোমান লিপিতে নিম্নে বর্ণান্তরিত করা হইল,—ইহা হইতে ৭০০ হইতে

১৫০০ বৎসর পূর্বেকার প্রাচীন তমিলের উচ্চারণ বুঝা যাইবে। এবং ইহার সঙ্গে-সঙ্গে, আধুনিক তমিলের উচ্চারণ-ও রোমান বর্ণমালার সাহায্যে দেখানো হইল। এই প্রতিবর্ণীকরণে, - (হাইফেন)-চিহ্ন দ্বারা সন্ধি-বিশ্লেষ করিয়া দেখানো হইতেছে।

(১) প্রথম পদ—'বর্ণান্তরীকরণ' দ্বারাই প্রাচীন তমিল উচ্চারণের প্রদর্শন ;—অনুরূপ পদ্ধতি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত সুবৃহৎ তমিল্ অভিধানে তমিল্ শব্দের রোমান প্রতিবর্ণীকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে।

uyarv-ar'a-v-uyar nalam-uṭaiyavan' evan' avan'
mayarv-ar'a mati-nalam aruḷān'an' evan' avan'
ayarv-ar'um-amar-ar'-kaḷ-atipati-y evan'-avan'
tuyar-ar'u cuṭar-aṭi tozut-ez-en' man'an'ē !

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাসকে অনুসরণ করিয়া, অন্বয়-মুখে এই পদটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে—

uyarvu-ar'a = uyarv-ar'a = অধিক-শূন্য ; **uyar** = বর্ধমান , **nalam-uṭaiy-avan'** = আনন্দবান্ , **evan' avan'** = যিনি, তিনি ; **mayarvu-ar'a = mayarv-ar'a** = অজ্ঞান-রহিত ; **mati-nalam** = জ্ঞান (মতি) ও আনন্দ ; **aruḷ-ān'an'** = কৃপা করিয়া দান করিয়াছে ; **evan' avan'** = যিনি, তিনি ; **ayarvu + ar'um** = বিস্মৃতি-শূন্য ; **amar-ar'-kaḷ** = অমর বা দেবতাগণ, দেবতাগণের, নিত্যসূরীগণের ; **atipati** = অধিপতি ; **-y-evan' avan'** = যিনি, তিনি ; **tuyar-ar'u** = দুঃখ-নিবর্তক ; **cuṭar-aṭi** = তেজঃপূর্ণ চরণ ; **tozutu ezu en' = tozut-ez-en' man'an-ē** = প্রণামপূর্বক উত্থিত হও, হে আমার মন !

শ্রীযুক্ত রামানুজদাসের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ—

নিরবধি পরিমাণ, তহিঁ পুনঃ বর্ধমান, অনন্ত আনন্দধাম যিনি।
অজ্ঞান তিমির নাশি' বিতরিয়া জ্ঞান-রাশি, মোরে কৈল ভক্তি-ধনে ধনী ॥
ভ্রান্তিহীন নিত্যসূরী, তাঁরাও অধীন যাঁরি, আদিদেব পুরুষ পরম।
জ্যোতির্ময় দুঃখহারী, বহি' পদ-যুগ তাঁরি, উজ্জীবন লভ মম মন ॥

আধুনিক উচ্চারণ—শব্দ-মধ্যস্থ t (= ত) সাধারণতঃ ð (ইংরেজি this, then-এর th-এর ধরনে), এবং k (= ক), γ (= ফারসীর 'ঘায়েন' অক্ষরের ধ্বনি) অথবা h (= হ) রূপে উচ্চারিত হয়।

uyarvar'a vuyarnala mudaiyavan' evan'avan'
mayarvar'a madinala (maδinala) marulān'an' evan'avan'
ayarvar'u mamarar'haladiwadiy evan'avan'
tuyarar'u śudaradi tozudezen' man'an'ē !

(২) দ্বিতীয় পদ—বর্ণান্তরীকরণ ও প্রাচীন উচ্চারণ :

cuẓnt-akan'r'-āẓntuyarnta mutiv-il peru-m-pāẓē-y-ō !
cuẓnt-atan'ir'-periya para nan'malarc cōtī-y-ō !
cuẓnt-atan'ir'periya cutar ñān'av-inpamē-y-ō !
cuẓnt-atan'ir'periy en'n' avā-v-ar'ac cūẓntāyē !

পদটির অন্বয়-মুখে ব্যাখ্যা—

akan'r'u+āẓntu+uyarn cuẓntu=(তুমি) অষ্ট দিক্ অধঃ এবং ঊর্ধ্ব সর্বত্র ব্যাপ্ত ; **mutlvu+ii-peru pāẓē-y-ō**=(তুমি) নাশ-রহিত মহাক্ষেত্রের (প্রকৃতি তত্ত্বের) আত্মস্বরূপ—অহো! **atan'il periya param**=তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ; **nal-malarc-cōtī-cuẓntu ō**=সমীচীন বিকস্বর জ্যোতির (আত্মবস্তুর) আত্মস্বরূপ (তুমি)—অহো! **atan'il periya**=তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ; **cutar ñāna-v-inpamē cuẓntu ō**= উজ্জ্বল জ্ঞান আনন্দে ব্যাপ্ত (তাহার আধারভূত)—অহো! **atan'il periya en' avā**=ততোঽধিক (তোমার প্রতি) আমার অভিনিবেশ ; **ar'ac cuẓntāyē cuẓutu**=তাহাকেও পরাভূত করিয়া তুমি আমার মধ্যে অন্তর্ভূ́ত হইয়াছে ; অর্থাৎ আমার সেই অভিনিবেশ হইতেও আমার প্রতি অতি মহান্ অভিনিবেশ লইয়া তুমি এখন আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস-কৃত বঙ্গানুবাদ—

ব্যাপিয়া র'য়েছো তুমি দিকে দিকে দশদিকে।
আর আছো নিত্য সদা ব্যাপ্ত করি' প্রকৃতিকে ॥
ব্যাপ্ত তুমি শ্রেষ্ঠতর, বিকস্বর আত্মা মাঝে।
ততোধিক উজ্জ্বল জ্ঞানানন্দ যথা রাজে ॥
আধার তাহার তুমি, নিত্য জ্ঞানানন্দময়।
আশ্রিতে ব্যামোহভরা—এই তব পরিচয় ॥
সেই মহা প্রেম ল'য়ে অন্তরে প'শেছো এসে।
এ দাসের ক্ষুদ্র প্রেম তুচ্ছ হ'ল তারি পাশে ॥
এত প্রেম আর্তি দিয়ে, আড়্বারে করি' ধনী।
ল'য়ে চলে নিত্যধামে পরম দয়াল স্বামী ॥

আধুনিক উচ্চারণ—

śuẓndahan' r'āẓnduyarn damuḍi vilperum pāẓēyō !
śuẓndada n'ir'peri yawara nan'malarc cōdīyō !
śuẓndada n'ir'peri yaśuḍar ñān'avin pamēyō !
śuẓndada n'ir'periy en'n'a vāvar'ac cūẓndāyē !

মূল তমিল্ থাকায় এইভাবে প্রস্তুত পুস্তকের মাধ্যমে তমিল্ ভাষার সহিত এবং ভারতের ভক্তিশাস্ত্রের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সম্পূর্ণ এক-চতুর্থাংশের সহিত বঙ্গভাষী পাঠক একটু সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

'সহস্র-গীতি'র ভাবধারা ও আধ্যাত্মিকতা

'নাল্-আয়িরপ্-প্রবন্ধম্' অথবা তাহার তৃতীয় খণ্ড নম্মাড়্বার্-শঠকোপ মুনির 'তিরু-বায়্-মোড়ি'র আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করা আমার যোগ্যতার ঊর্ধ্বে। আমি সে বিষয়ে অনধিকার-চর্চা করিতে বসিব না। আড়্বার্-গণ সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস মহাশয়ের 'আড়্বার্' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে আড়্বার্-ভাবধারার মুখ্য কথাগুলি জানিতে পারা যাইবে। আমাদের বাঙ্গালার বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলীর মতো এই বইয়ের বিভিন্ন পদ আস্বাদন করিবার জন্য, তাহার দার্শনিক বা ভক্তিশাস্ত্রানুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণ কাহারও কাছে মুখ্য বস্তু, আবার কাহারও কাছে তাহা গৌণ ব্যাপার মাত্র। অনুবাদক ও টীকাকার, গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও পদ-সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত। বাঙ্গালা বৈষ্ণবপদের তিনি একজন প্রথিতনামা গায়ক ও রসবেত্তাও বটেন। গৌড়-বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তার সহিত শ্রীসম্প্রদায়ের অনুরূপ বিষয়গুলির তুলনাত্মক আলোচনা তাঁহার ব্যাখ্যা, অনুবাদ ও বিচারকে যেন মণিকাঞ্চন-যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মূল তমিলে যাহা আছে, তাহা তাঁহার অন্বয়মুখে বাঙ্গালা অনুবাদে যথাযথ পাওয়া যাইবে। 'গাথা-সার' শীর্ষক ক্ষুদ্র টীকায় প্রত্যেক পদের আভ্যন্তর অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে, এবং অবশেষে উহার বাঙ্গালা কবিতাময় অনুবাদে, ভাষা জানিবার বা মূলের আক্ষরিক অনুবাদ পাঠ করিবার যাঁহাদের সময় বা আগ্রহ নাই, তাঁহারা, বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদের অনুসারী করিয়া দেওয়াতে, বাঙ্গালী মন লইয়া এই মহাগ্রন্থের রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। এক-একটি তমিল্ পদ এই বাঙ্গালা সংস্করণে চতুর্মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে—১। মূল পদটি, ২। অন্বয়মুখে আক্ষরিক বাঙ্গালা

অনুবাদ, ৩। গাথাসারে বক্তব্যের বিচার, এবং ৪। বাঙ্গালা কবিতায় ভাবপূর্ণ ভাষায় পদের প্রকাশ।

উপসংহার

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগ বিদ্যমান। একটি ভাষার একখানি মহাগ্রন্থের সানুবাদ ও সটীক সংস্করণ, অন্য একটি ভাষায় প্রকাশিত হইলে এই সাংস্কৃতিক যোগসূত্রকে আরও দৃঢ় করিতে সমর্থ হইবে। বাঙ্গালা-দেশ ও তমিল্-নাডের মধ্যে, ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণের মধ্যে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ যোগ বহু শতক ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে 'হরিনাম-মূর্তি' শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণ এই যোগকে ঘনীভূত করিতে সহায়তা করিয়াছিল। 'বেদান্তমূর্তি' স্বামী বিবেকানন্দকে তমিল্-ভাষী জনগণ ঠিক বাঙ্গালীরই মতন আপন জন করিয়া লইয়াছেন। বিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালী ও তমিল্ সন্ন্যাসীর দল, ভারতের অন্য প্রদেশের-ও সন্ন্যাসীদের সহিত মিলিত হইয়া, আধুনিক যুগে ভারতের আত্ম-চেতনাকে, তাহার হৃত অন্তরাত্মাকে ফিরাইয়া আনিয়া দিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামানুজদাস এই পুস্তক ও অনুরূপ অন্য পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার করিয়া আবার বাঙ্গালীর জীবনে ভারতের শাশ্বত বাণী ও কর্মপ্রচেষ্টাকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন। তাঁহার এই 'উজ্জীবন'-চেষ্টা সার্থক হউক, ও আমাদের অমৃতের সাধনার সহায়ক হউক। ইতি॥

১লা নভেম্বর ১৯৬৩।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস মহাশয় কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত তমিল্ 'সহস্র-গীতি' গ্রন্থের ভূমিকা রূপে প্রথম প্রকাশিত (বলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪-পরগণা, ১৯৬৩ সাল); এখানে কিছু-কিছু সংশোধন- ও সংযোজন-সহ পুনর্মুদ্রিত হইল।

ভারতে রোমক লিপি

ভারতের সমস্ত ভাষা রোমান অক্ষরে লিখিবার একটি প্রস্তাব বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই প্রস্তাবটি আপাত-দৃষ্টিতে এমনিই অনাবশ্যক ও জাতীয়তা-বিরোধী যে, আমাদের দেশে প্রায় সকলেই এই প্রস্তাব উত্থাপন-মাত্রেই তাহা জাতীয়তাবোধ-বর্জিত পাগলের প্রলাপ বলিয়া "পত্রপাঠ" বর্জন করিয়া বসেন, তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে চাহেন না। কিন্তু প্রস্তাবটি উঠিয়াছে; যদিও এখন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইহার পক্ষে, এবং দেশের জনসাধারণ ইহার সম্বন্ধে উদাসীন অথবা ইহার বিরোধী, তথাপি আমার মনে হয়, শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ধীরে-ধীরে, অতি ধীরে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে। তুর্কীদেশে আতা-তুর্ক কামাল পাশা রোমান হরফ চালাইয়াছেন, সকলেই তাহার তারিফ করিতেছে—সমগ্র আরবী কোরানও তুর্কীরা রোমান হরফে ছাপাইয়াছে; পারস্যেও রোমান হরফ গ্রহণের প্রস্তাব উঠিয়াছে, এবং ফারসী ভাষায় ইউরোপীয় স্বরলিপি ব্যবহৃত হয় বলিয়া ঐ স্বরলিপির সহিত যে-সব ফারসী গান প্রকাশিত হয়, বাধ্য হইয়া সেগুলি রোমান হরফেই লিখিত ও মুদ্রিত হইতেছে; কারণ ইউরোপীয় স্বরলিপির গতি বাম হইতে দক্ষিণে, এবং ফারসী লিপি চলে দক্ষিণ হইতে বামে। একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার বর্ণমালা বদলাইয়া যে রোমান অক্ষর গ্রহণ করা যায়, খবরের কাগজ যাঁহারা পড়েন তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। জিনিসটা বাহিরের জাতিদের সম্বন্ধে আর নূতন নয়। কিন্তু এখন ঘরে রোমান অক্ষর গ্রহণের কথা উঠিলে অনেকে সেটা বরদাস্ত করিতে পারেন না, ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টাও করেন না।

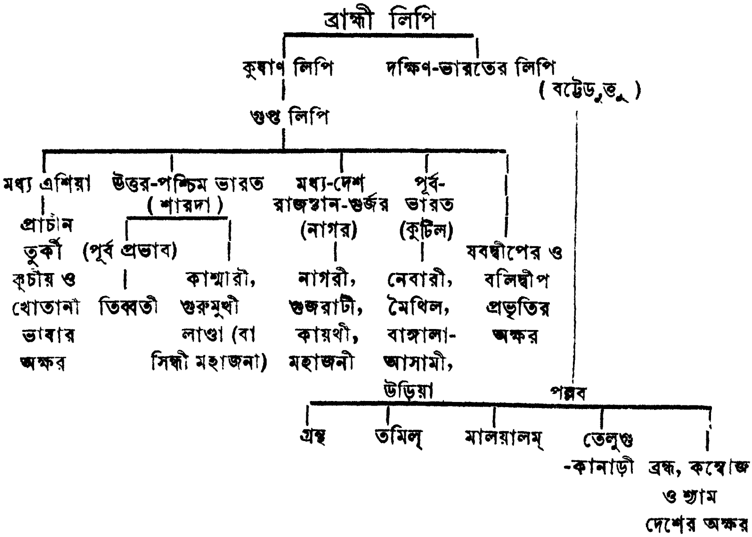
১৯৩৪ সালে কংগ্রেস-গৃহীত নেহরু কমিটির রিপোর্টের এই মন্তব্যটি একপ্রকার সর্বজনগৃহীত হইয়া গিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইবে 'হিন্দুস্থানী', এবং হিন্দুস্থানী দেবনাগরী অথবা আরবী (উর্দূ) হরফে লেখা হইবে। বিগত কলিকাতার কংগ্রেসে সর্বদল-সম্মেলনে একজন পশ্চিমা মুসলমান সদস্য একটি সংশোধক প্রস্তাব আনয়ন করেন যে, এই রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী, দেবনাগরী এবং আরবী উভয় প্রকার হরফেই লেখা হইবে। অর্থাৎ

আরবী হরফ লোকে পড়িতে পারুক বা না পারুক, যেখানে জাতীয় রাজনৈতিক দলের অথবা জাতীয় শাসনতন্ত্রের কোনও বিজ্ঞাপন, বিধি অথবা প্রস্তাব হিন্দুস্থানীতে প্রচারিত হইবে, সেখানে অধিকন্তু আরবী হরফেও তাহা প্রকাশিত হইবে। সর্বদল-সম্মেলনে এই সংশোধক প্রস্তাব নাকচ হইয়া যায়। তারপরে একজন সিন্ধী হিন্দু প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী কেবল রোমান লিপিতে লিখিত হইবে। একজন বাঙ্গালী হিন্দু প্রতিনিধি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, কিন্তু আর সকলেই বিপক্ষে থাকায় এই প্রস্তাবও নাকচ হইয়া যায়।

কিন্তু রোমক লিপি গ্রহণের কথাটা কংগ্রেসের মধ্যে এইভাবে ধামাচাপা পড়িয়া গেলেও, কংগ্রেসের বাহিরে দুই চারিজন করিয়া ব্যক্তি এই বিষয়ে অনুকূল মত পোষণ করিতেছেন। এই বৎসর (১৯৩৪ সালে) ফরিদপুরে বাঙ্গালা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপকদের একটি সম্মেলন হয়, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা লিখনের জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের প্রচলন অনুমোদন করিয়া একটি প্রস্তাব আসে। ৩২ জন সদস্য প্রস্তাবের বিপক্ষে ও ২৫ জন প্রস্তাবের পক্ষে থাকায়, তাহা পরিত্যক্ত হয়। আমার বিশ্বাস, এই ২৫ জনের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিবে। বঙ্গদেশের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সর্বজনসমাদৃত লেখক—একাধারে তিনি রস-রচয়িতা ও বৈজ্ঞানিক—তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার হাতে কামাল-পাশার মতো ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আইন করিয়া দেশে বাঙ্গালা ভাষায় তিনি রোমান অক্ষর প্রচলন করাইতেন। আবার এরকম বিরোধী লোকও আছেন, হাতে ক্ষমতা থাকিলে যাঁহারা রোমান লিপির সমর্থকদিগকে জেলে পাঠাইতেন।

ভারতে রোমান অক্ষর প্রচলন ব্যাপারটি এখন একটি জাতীয় সমস্যা বা কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত হয় নাই; কিন্তু যেরূপ হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অচিরে ইহা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে একটি প্রধান স্থান লইয়া বসিবে। বাঙ্গালা অক্ষরের বদলে আমাদের মাতৃভাষায় রোমান অক্ষর চালাইলে আমাদের লাভ ও লোকসান কী কী হইবে, এবং তাহা করা সম্ভব কিনা, ও করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত কিনা, তাহা আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত।

আমাদের ভারতীয় লিপি ও রোমান লিপির ইতিহাস তথা এই লিপির অন্তর্নিহিত প্রণালী বা পদ্ধতি একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। আধুনিক ভারতবর্ষে লিপিগুলির ইতিহাস মোটামুটি-ভাবে নিম্নলিখিত বংশ-পীঠিকা মতো :—



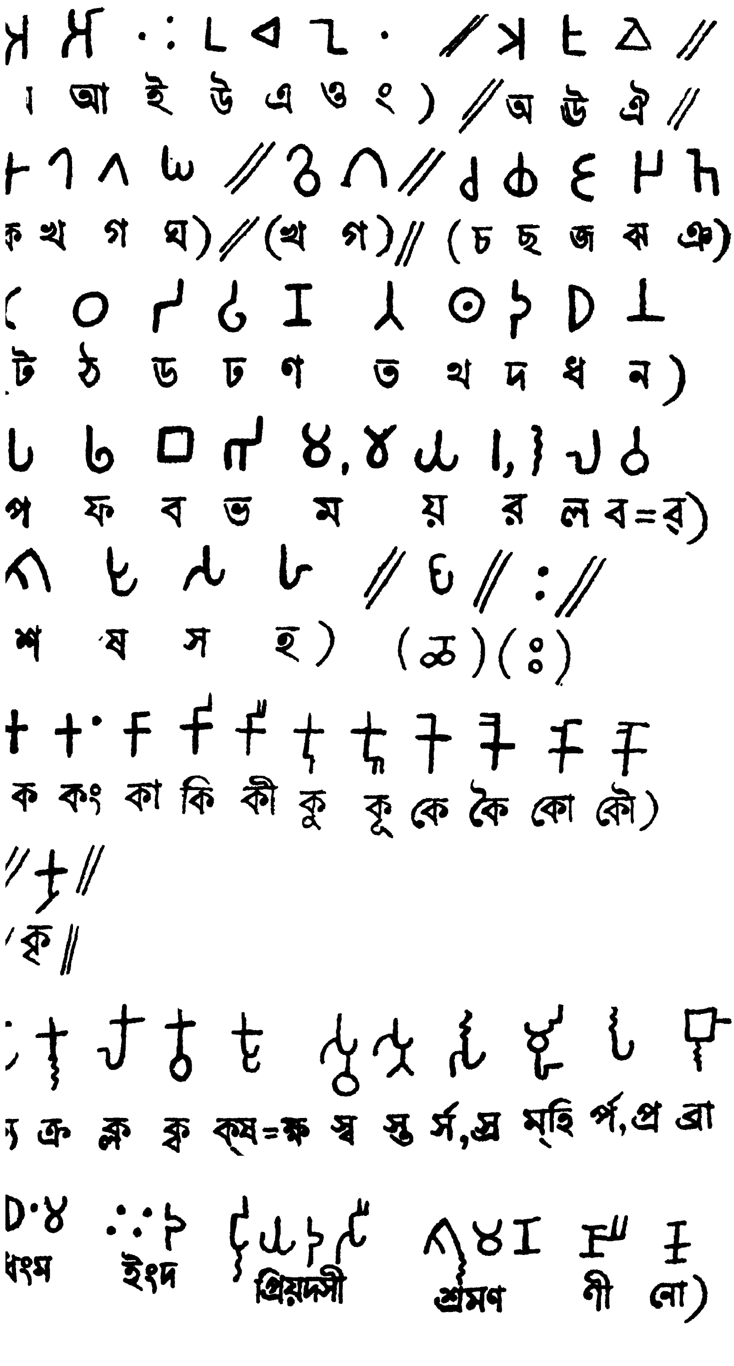
ব্রাহ্মী লিপি ভারতের সর্বপ্রাচীন লিপি যাহা আমরা পাঠ করিতে পারি—আর্য্য ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট ইহা-ই ভারতের প্রাচীনতম লিপি। আমাদের হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস অনেক প্রাচীন ; পুরাণে খ্রীষ্টপূর্ব বহু শত বৎসরের কথা বলে, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ৩০০-র পুর্বেকার কোনও ভারতীয় আর্য্য ভাষার লিপি এতাবৎ আবিষ্কৃত বা পঠিত হয় নাই। মৌর্য্য যুগের ব্রাহ্মীকেই উপস্থিত আধুনিক ভারতীয় লিপিসমূহের আদি বলিতে হয়। ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। এতাবৎ প্রায় সকলেই মনে করিতেন, মূলে ইহা ফিনীশীয় অক্ষর (খ্রীঃ পূঃ ১০০০ এর পুর্বেই সিরিয়া দেশের ফিনীশীয় ভাষাকে আশ্রয় করিয়া গঠিত প্রাচীন ফিনীশীয় লিপি) হইতে উৎপন্ন ; হয় দক্ষিণ-আরব ঘুরিয়া, না হয় পারস্য-উপসাগর হইয়া, দ্রাবিড়-জাতীয় বণিক্‌দের মারফৎ এই অক্ষর খ্রীঃ পূঃ ৯০০-৮০০-র দিকে ভারতে আনীত হয়, ও পরে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া এই অক্ষরমালার (ব্রাহ্মীর) সম্পূর্ণতা-সাধন ঘটে। কেহ কেহ ফিনীশীয় অক্ষর হইতে ব্রাহ্মী অক্ষরের উদ্ভব স্বীকার করিতেন না ;

তাঁহারা মনে করিতেন, ভারতবর্ষে আর্য্যভাষী জনগণ কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে, কোনও প্রকার মৌলিক চিত্রলিপি হইতে ব্রাহ্মীর উদ্ভব ঘটিয়াছে। সম্প্রতি মোহেন্-জো-দড়ো ও হড়প্পায় প্রাপ্ত শত-শত মুদ্রালিপি হইতে একটি নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে যে, প্রাগার্য্য যুগের চিত্রলিপির-ই এক বিকাশ ব্রাহ্মী-লিপি। আর একটি মত এই যে, প্রাচীন প্রাগ্-আর্য্য যুগের মোহেন্-জো-দড়োতে যে লিপি পাওয়া যায়, তাহার আধারেই ব্রাহ্মী লিপি গঠিত হয়, সম্ভবতঃ আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকে; এই সময়ে এই আদি বা প্রথম উদ্ভাবিত ব্রাহ্মী লিপিতে-ই চতুর্বেদ সর্বপ্রথম লিখিত হয়, এবং সংস্কৃত ভাষায় এই লিপি পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। এই মতটি-ই সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

যাহাই হউক, একথা ঠিক যে, খ্রীঃ পূঃ ১০০০-এর দিকে, অশোক প্রভৃতি মৌর্য্য সম্রাট্দের কালে ব্যবহৃত, আমাদের প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তির কাল বলিয়া ধরা যায়। ব্রাহ্মী লিপির অক্ষরগুলি সরল, এগুলিতে মাত্রা বা অন্য প্রকার কোনও অনাবশ্যক বাহুল্য ছিল না; অক্ষরগুলির ছাঁদ ঋজু ও সবল, গ্রীক বা রোমান "কাপিটাল" বা বড়ো হাতের অক্ষরের মতো। স্বরবর্ণের জন্য আ-কার, ই-কার, দীর্ঘ-ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার প্রভৃতি বিশেষ-বিশেষ চিহ্ন অক্ষরের মাথায় গায়ে পায়ে লাগানো হইত। এই পদ্ধতি এখনও ভারতীয় অক্ষরে বিদ্যমান।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় অশোকের সময়ে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপির চিত্র দেওয়া হইল। অশোকের ও তাঁহার পরবর্তী রাজাদের প্রাকৃত ভাষায় লিখিত অনুশাসনে সংস্কৃতের সব বর্ণ পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালের সংস্কৃত লেখ দেখিয়া, অশোকের ব্রাহ্মীতে এই সমস্ত সংস্কৃত বর্ণের পূর্ব রূপ অনুমান করিয়া লওয়া যায়—কিন্তু তাহা অবিসংবাদিত হইবে না। অশোকেব অনুশাসনে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণবিন্যাসে অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করা যায়, যেমন—সংযুক্ত ব্যঞ্জন 'প্র' লেখা হইয়াছে 'র্প' রূপে; 'ব্য' পাইতেছি 'য়্ব' রূপে; এবং অন্য ক্ষেত্রেও সংযুক্ত ধ্বনি প্রকাশের রীতি নিতান্ত অসম্পূর্ণ।)

ব্রাহ্মী বর্ণগুলির সারল্যের মধ্যে একটা ভাস্কর্য্য-সুলভ গুণ বিদ্যমান। এই অনাড়ম্বর অক্ষর, ধীরে ধীরে ছেনির দ্বারা পাথরের উপরে না কাটিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া কলম দিয়া ভূর্জত্বক্ বা তালপত্রের উপরে লিখিবার ফলে, উহার রূপ বদলাইতে লাগিল, অক্ষরগুলি ক্রমে কুণ্ডলাকৃতি ও জটিল হইতে


আ ই উ এ ও ং) //অ ঊ ঐ//
ক খ গ ঘ)//(খ গ)// (চ ছ জ ঝ ঞ)
ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন)
প ফ ব ভ ম য় র ল ব=ৱ)
শ ষ স হ) (ঌ)(ঃ)
ক কং কা কি কী কু কূ কে কৈ কো কৌ)
কৃ//
ক্র ক্ল ক্ব ক্‌ষ=ক্ষ স্ব স্ত র্স,স্র ম্হি র্প,প্র ব্রা
ধংম ইংদ প্রিয়দসী শ্রমণ ণী নো)

লাগিল। হাতের লেখায় অক্ষরের যে দশা অবশ্যম্ভাবী, তাহা ঘটিল। ক্রমে এই অক্ষরমালা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা প্রাদেশিক অক্ষরে পরিণত হইল। ব্রাহ্মীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই-সমস্ত প্রাদেশিক অক্ষর ক্রমে বিশেষ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেবনাগরী অক্ষর বাঙ্গালার পূর্ব রূপ নহে; নাগর বা দেবনাগরী, বাঙ্গালা অক্ষরের সোদর-স্থানীয়। উভয়ের উদ্ভব প্রায় এক-ই কালে, এখন হইতে মাত্র এক হাজার বৎসর পূর্বে। ব্রাহ্মী অক্ষর এখন হইতে আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার, একথা বলা চলে। ভারতবর্ষে লিপির ইতিহাস হইতেছে—ক্রমবর্ধনশীল জটিলতার ইতিহাস।

ওদিকে কিন্তু রোমান লিপিকে যেরূপে আমরা পাইতেছি, তাহা তাহার প্রাচীনতম রূপ হইতে বিশেষ পরিবর্তিত হইতে পারে নাই। ফিনীশীয় অক্ষর হইতে খ্রীঃ পূঃ ৮০০-র দিকে গ্রীক অক্ষরের উদ্ভব। দক্ষিণ-ইতালিতে উপনিবিষ্ট গ্রীকদের নিকট হইতে রোমের অধিবাসিগণ ইহার ২।১ শত বৎসরের মধ্যে লিপিবিদ্যা শিক্ষা করে, রোমানদের হাতে গ্রীক-লিপি ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া রোমান লিপিতে পরিণত হয়। প্রথম রোমান লিপিতে কেবল capital বা বড়ো-ছাঁদের অক্ষরগুলিই ছিল; এই বড়ো-ছাঁদের অক্ষর এখনও প্রায় অবিকৃত রূপে বিদ্যমান—যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে যে রূপটি ছিল, সেই রূপটি এখনও বিদ্যমান। খ্রীষ্ট-জন্মের ২০০।৩০০ বৎসর পরে রোমান অক্ষরের small letters বা ছোটো হাতের অক্ষরগুলির উদ্ভব হয়—দ্রুত-লিখন-চেষ্টার ফলে। এই small letters-ও প্রায় অবিকৃত আছে। মোটা কলমে একটু বাহার দেখাইয়া লিখিবার চেষ্টায়, ইউরোপে মধ্যযুগে রোমান অক্ষরের চেহারা নানা স্থানে একটু একটু বদলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মূল রোমান লিপির সারল্যটুকু লোকে এখন বিস্মৃত হয় নাই। এখনও জর্মানিতে এই মোটা-ছাঁদের বাহারে' অক্ষর —German Black Letter বা Gothic—কিছু কিছু চলে, কিন্তু জর্মানির লোকেরা এই বাহারে' অক্ষর বহুশঃ বর্জন করিয়া, সরল রোমান অক্ষরই গ্রহণ করিতেছে। ইহা-ই হইল সংক্ষেপে লিপির ইতিহাস।

ভারতবর্ষে পর্তুগীসদের আগমনের সময় হইতে এদেশে রোমান অক্ষরের আগমন। রোমান অক্ষর ইউরোপীয়দের ভাষার বাহন বলিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা

অনেক বেশি। সঙ্গে-সঙ্গে, ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায়, এবং জগৎ ব্যাপিয়া ইউরোপীয়দের ছড়াইয়া পড়ায়, বহু নিরক্ষর ভাষা প্রথম রোমান লিপিতেই লিখিত হইয়াছে; এরূপটি ভারতেও কতক পরিমাণে হইয়াছে। প্রাচীনকালে হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ) প্রচারক ও বণিক্‌দের প্রভাবের ফলে যেমন মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুলারেসি বা সেলেবেস, ফিলিপ্পীন প্রভৃতি দেশে তত্তৎ স্থানের ভাষা লিখনের জন্য ভারতীয় বর্ণমালা প্রসারলাভ করিয়াছিল। এখন কতকগুলি জাতি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজ প্রাচীন অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া রোমান লিপি গ্রহণ করিয়াছে বা করিবার চেষ্টা করিতেছে। তুর্কীরা ইতিমধ্যেই করিয়াছে,—ইন্দোনেসিয়াতেও গৃহীত হইয়াছে, এবং পারস্যে, জাপানে, ও কতক পরিমাণে চীনদেশেও এই চেষ্টা চলিতেছে।

রোমান তথা ভারতীয় লিপির অন্তর্নিহিত লিখন-প্রণালীর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে—সেটুকু প্রথম বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। এই দুটিই বিষয়ে এই পার্থক্য লক্ষণীয়—[১] ভারতীয় লিপিতে স্বরবর্ণগুলি ক্বচিৎ গৌণরূপে ধরা হয়, রোমান লিপিতে স্বরবর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সর্বত্র তুল্য মর্য্যাদা দেওয়া হয়। 'ক' = ka,—এই অক্ষরে ব্যঞ্জন 'ক্' = k মুখ্য-রূপে ও স্বরধ্বনি 'অ' = a গৌণ-রূপে লিখিত, অ-কার ব্যঞ্জনের গায়ে অন্তর্নিহিত হইয়া আছে। 'কা, কি, কু, কে' ইত্যাদি স্বরযুক্ত 'ক্' ধ্বনির লিখনে, স্বরধ্বনিদ্যোতক অক্ষরগুলি ব্যঞ্জনের আশ্রিত, তাহার আশেপাশে পায়ে মাথায় কোনও রকমে স্থান করিয়া রহিয়াছে। ভারতীয় লিপিতে স্বরধ্বনির বর্ণ দুই প্রস্থ—এক প্রস্থ, যখন স্বরধ্বনি শব্দের আদিতে (ক্বচিৎ মধ্যে) থাকে, তখন লিখিত হয় (অ, আ, ই, ঈ, ঋ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ), অন্য প্রস্থ, যখন ব্যঞ্জনের পরে আসে, তখন লিখিত হয় (া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ৢ, ে, ো, ৈ, ৌ)। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, ভারতীয় লিপির আধার হইতেছে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি মিলিত করিয়া সৃষ্ট syllable বা 'অক্ষর'; পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র ধৃত স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি প্রতীক letter বা 'বর্ণ' নহে। যেমন 'চতুর্থ' এই শব্দে তিনটি অক্ষর—'চ—তু—র্থ'; প্রত্যেকটি অক্ষরকে আবার ব্যঞ্জন ও স্বরে বিশ্লেষ করিতে পারা যায়। রোমান লিপিতে কিন্তু প্রত্যেক অক্ষর একা একটি স্বতন্ত্রাবস্থিত স্বর- বা ব্যঞ্জন-ধ্বনির প্রতীক—যথা—caturtha—c-a-t-u-r-th-a=c (চ্)+a (অ)+t (ত্)+u (উ)+r (র্)+th (থ্=ত্+হ্, মহাপ্রাণ ত্)+a (অ)।

[২] ভারতীয় লিপিতে ব্যঞ্জনের পরেই ব্যঞ্জনধ্বনি আসিলে, দুইটি বা ততোধিক ব্যঞ্জনের বর্ণকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া মিলিত করিয়া 'সংযুক্ত' অক্ষর করা হয়। অনেক সময় সংযুক্ত অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ নূতন অক্ষরের রূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছে। যথা—'ক্+ত'='ক্ত'; 'হ্+ম'='হ্ম'; 'র্'+'ম'='র্ম', 'ক্+র'='ক্র'; 'স্+ত্+র্+ঈ'='স্ত্রী'; ইত্যাদি। ইহাতে শিক্ষণীয় অক্ষরের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে,—নূতন-নূতন বহু অক্ষর শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করিতে হয় মাতৃভাষার পঠন শিক্ষা করিতে গেলে, সাধারণতঃ বাঙ্গালী বা হিন্দীভাষী বালককে দুই বৎসর ব্যয় করিতে হয়। রোমান লিপিতে এ বালাই নাই: k+t=kt; h+m=hm; r+m=rm; k+r=kr, বাঙ্গালা 'অ+ত্+য়্+উ+ক্+ত্+ই'='অত্যুক্তি', কিন্তু রোমানে a+t+y+u +k+t+i=atyukti—কোনও ঝঞ্ঝাট নাই।

তবে একথা ঠিক যে, প্রত্যেকটি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ রোমান বর্ণমালায় পৃথক করিয়া লেখায়, ইহাতে জায়গা একটু বেশি লাগে;—সংযুক্ত-বর্ণ থাকায়, বাঙ্গালা নাগরী প্রভৃতি ভারতীয় লিপিতে একটু জায়গা বাঁচে। কিন্তু সে লাভটুকু বর্জন করিলে, সাধারণতঃ যে বেশি লোকসান হইল, তাহা বলা চলে না।

স্বরবর্ণের গৌণত্ব, তথা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের অবস্থান—এই দুই কারণে ভারতীয় অক্ষরের সাহায্যে ভাষার শব্দের বিশ্লেষণ দেখানো একটু কষ্টকর হইয়া উঠে। শব্দের বিশ্লেষণ দুই উপায়ে হয়—[১] ধ্বনির বিশ্লেষণ, [২] রূপ বা ধাতু-প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ। যেমন 'রাখিলাম' rākhilām শব্দ [১] ধ্বনি-মূলক বিশ্লেষণ—'র্-আ-খ্-ই-ল্-আ-ম্'; [২] ধাতু প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ—যথা '(ধাতু) রাখ্+(অতীত-বাচক প্রত্যয়) -ইল্- +(পুরুষবাচক তিঙ্-প্রত্যয়) -আম'। এইরূপ বিশ্লেষণ রোমান লিপিতে ভারতীয় লিপি অপেক্ষা অনেক সহজে দেখানো যায়। যথা—[১] r-ā-kh-i-l-ā-m; [২] rākh-il-ām; ভাষা শিক্ষার পক্ষে রোমান লিপির উপযোগিতা অনেক বেশি।

স্বরবর্ণ পৃথক্ করিয়া লিখায়, রোমান লিপিতে একটু স্থান বেশি লাগে, কিন্তু লেখা সুখপাঠ্য হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং 'ক্ষ, ক্ত, স্ত্রী, স্ট্রে, হ্ম, ষ্ক্র, ভ্র' প্রভৃতি চীনা অক্ষরের অনুকারী জটিল অক্ষরের হাত হইতে আমরা উদ্ধার পাই।

রোমান লিপির আর একটি গুণ আছে—ইহার বর্ণগুলির গঠন অতি সরল; নাগরী ও বাঙ্গালার যে-কোনও অক্ষরের সহিত তুলনা করিলে

ইহা বুঝা যাইবে। যেমন ক্=k, ম্=m, হ্=h, র্=r, স্=s, ত্=t, l=ল্ ইত্যাদি।

ভারতীয় লিপি কিন্তু একটি বিষয়ে রোমান লিপির বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত—বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ভারতীয় বর্ণমালার অক্ষরের সমাবেশ। ইহাতে স্বরধ্বনিগুলি প্রথম প্রদত্ত হইয়াছে; তদনন্তর ব্যঞ্জনবর্ণগুলি—মুখ-বিবরের অভ্যন্তর বা কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া পর-পর উচ্চারণ-স্থান ধরিয়া তালু, মূর্ধা, দন্ত, ক্রমে মুখ-বিবরের বাহিরে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য—এই পাঁচটি স্পর্শবর্ণের বর্গ; প্রতি বর্গে আবার অঘোষ (যথা—ক, খ) এবং ঘোষ (যথা—গ, ঘ),—তথা নাসিক্য (যথা—ঙ)—এবং অঘোষ অল্পপ্রাণ (ক), অঘোষ মহাপ্রাণ (খ), ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ (গ), ঘোষবৎ মহাপ্রাণ (ঘ), এবং নাসিক্য (ঙ), এই হিসাবে বর্গের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ সজ্জিত। স্পর্শবর্ণের পরে অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব—ইংরেজিতে যেগুলিকে liquids and semivowels বলে), তদনন্তর উষ্মবর্ণ (শ ষ স হ—ইংরেজিতে spirants বলে)। এইরূপ বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণক্রম পৃথিবীর আর কোনও বর্ণমালায় নাই। এই বর্ণক্রমটুকু প্রাচীন ভারত হইতে প্রাপ্ত এক অতি মূল্যবান্ রিক্থ, ইহা আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না। এই শুদ্ধ বর্ণক্রমের সমক্ষে রোমান লিপির বর্ণক্রম দাঁড়াইতেই পারে না। রোমান লিপির বর্ণগুলি a b c d e f g h i-ইত্যাদি ক্রমে, যেমন-তেমন করিয়া খামখেয়ালী ভাবে সাজানো।

যদি আমরা রোমান বর্ণগুলি গ্রহণ করি, সেগুলিকে নূতন করিয়া আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার ক্রম অনুসারেই সাজাইয়া লইব।

রোমান বর্ণমালায়, ভারতীয় বর্ণমালার সমস্ত ধ্বনি নির্দেশ হওয়া সম্ভব নহে—উহার বর্ণসংখ্যা নিতান্ত অল্প। এক্ষেত্রে প্রচলিত রোমান অক্ষরে কতকগুলি বিশেষ নির্দেশক চিহ্ন দিয়া ভারতীয় বর্ণমালার প্রত্যক্ষরী-করণের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবশ্য কিছুই বাধা নাই।

প্রশ্ন হইতেছে, আমাদের ভারতীয় বর্ণমালা ছাড়িয়া রোমান বর্ণমালা লইতে যাইব কেন? তাহাতে লাভ কী? লাভ থাকিলেও, এরূপ করা জাতীয়তার বিরোধী হইবে কি না? আমরা হিন্দুরা ধর্মের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার একটি যোগ নির্ধারিত করিয়া লইয়াছি।

তান্ত্রিক বীজমন্ত্র—'ওঁ, ঐং, হ্রীং, ক্লীং, রং' ইত্যাদি ভারতীয় বর্ণমালায় লিখিয়া থাকি। এগুলিও রোমানে লিখি, এরূপ স্বপ্নের অগোচর কথা কেহ প্রস্তাবও করিতে পারে? দেশীয় অক্ষরে আমরা নিজেরা তো কিছু বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছি না; বিদেশীয় অজ্ঞাত জিনিসের মোহে নিজের পরিচিত জিনিস কেন ছাড়িয়া দেই?

আমার নিজের মনে হয়, রোমান লিপি গ্রহণ করিলে আমাদের সুবিধা অনেক হইবে; এবং জিনিসটা তলাইয়া বিচার করিয়া দেখিলে, ও যেভাবে রোমান অক্ষর আমাদের উপযোগী করিয়া লইবার প্রস্তাব আমি করিতেছি সেভাবে রোমান অক্ষর গ্রহণ করিলে, ইহাতে আমাদের জাতীয়তাবোধের বিরোধী কিছু-ই থাকিবে না। আপত্তিগুলি একে একে বিচার করিয়া দেখা যাক।

প্রথম, রোমান লিপি গ্রহণ করিলে মাতৃভাষা তথা বিদেশী ভাষা শিক্ষার পথ খুব-ই সহজ হইয়া যাইবে। বই ছাপানোও অপ্রত্যাশিতভাবে সহজ, সরল ও সুলভ হইয়া যাইবে। এখন বাঙ্গালা ছাপিতে গেলে প্রায় ৬০০ বিভিন্ন টাইপের দরকার। নাগরী 'কলকতিয়া' হরফে ছাপাইতে গেলে ৭০০ টাইপ চাই, 'বোম্বাইয়া' হরফে ৪৫০ টাইপ চাই। রোমানে ইংরেজি ছাপিতে সাকল্যে দুই প্রস্থ capital letter এক প্রস্থ small letter প্রভৃতিতে প্রায় ১৫০ টাইপের দরকার হয়। আমি যেভাবে ভারতীয় ভাষার জন্য রোমান অক্ষর ব্যবহার করিতে বলি (আমার পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হইল), তাহাতে অনধিক চল্লিশটি অক্ষরেই সব কাজ চলিবে। কোথায় চল্লিশটির চেয়েও কম অক্ষর, আর কোথায় ছয় শত অক্ষর! ইহার দ্বারা ছাপার ব্যয়-সংক্ষেপে ও সময়-সংক্ষেপ কত হইবে, তাহা অনুমান করা যায়। তারপর, মাত্র চল্লিশটি অক্ষর চিনিয়া লইলেই মাতৃভাষা পড়িতে পারা যাইবে—সেটিও কম কথা নহে। দুই বৎসর ধরিয়া 'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ' ও 'বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ' সাঙ্গ করিয়া তবে বাঙ্গালীর ছেলে মাতৃভাষায় লেখা বা ছাপা কিছু পড়িতে সমর্থ হয়। আমার প্রস্তাবিত রোমান হরফে সাধারণ বুদ্ধিমান্ ছেলে ৩।৪ মাসের মধ্যেই সমস্ত পড়িতে পারিবে।

'ক', 'খ', 'চ',—এইরূপ আকারের অক্ষরের বিশেষ কোনোও মাহাত্ম্য নাই; ইহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল ৮।৯ শত বৎসরের অতীত ইতিহাসের

যোগ আছে, এইটুকু মাত্র। যদি প্রাচীনত্ব ধরিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা বা নাগরী 'ক, খ, চ', প্রভৃতি বর্জন করিয়া ব্রাহ্মীকেই গ্রহণ করিতে হয়। 'ক'-এর যদি একটি সংক্ষিপ্ত, সহজ-লিখনযোগ্য আকার ব্যবহার করি, তাহাতে ক্ষতি কী? আর এই আকার যদি রোমানের k-র আকারই হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কী? 'ক' না লিখিয়া k লিখিব; k হইবে আমাদের 'ক'—k-কে আমরা বলিব 'ক'—ইংরেজেরা যেমন এই অক্ষরের নাম করিয়াছে kay 'কে', সে-রকম 'কে' নাম আমরা দিব না। 'গ'-র নূতন রূপ হিসাবেও g গ্রহণ করিব,—g এই চিহ্নের নাম দিব 'গ'—ইংরেজদের মতো ইহাকে jee 'জী' বলিব না, ফরাসীদের মতো g-কে zhi বলিব না, স্পেনীয়দের মতো g-কে 'খে' নাম দিব না। 'হ'-এর নূতন রূপ হিসাবে যদি h গ্রহণ করিয়া, 'h' এই চিহ্নকে 'হ' বলি—ইংরেজদের মতো aitch 'এইচ্' না বলি, ফরাসীদের মতো ache 'আশ্' না বলি, স্পেনীয়দের মতো ache 'আচে' না বলি, তাহা হইলে কী যায় আসে? সরলতর বিধায় রোমান অক্ষরগুলিকে দেশী নামে আমাদের ভারতীয় অক্ষরের নবরূপ বা প্রত্যক্ষর হিসাবে গ্রহণ করিব; এবং অক্ষরগুলিকে আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার 'অ আ, ক খ' আদি ক্রমে সাজাইব। ইহাতে ভারতীয় পদ্ধতির বর্ণক্রম বজায় থাকিবে, ভারতীয় নাম বজায় থাকিবে, আবার লেখা সহজ হইবে। এরূপ করিলে জাতীয়তাবোধ ক্ষুণ্ণ হইবার কোনও কারণ থাকিবে না।

সাধারণতঃ 'ভারতীয় রোমান' বা 'ভারত রোমক' বর্ণমালা ব্যবহৃত হইলেও, প্রাচীন ভারতীয় লিপি একেবারে বর্জিত হইবে না। তান্ত্রিক মন্ত্রাদি লিখনের জন্য, অলংকরণের জন্য ভারতীয় লিপি (নাগরী, বাঙ্গালা, তেলুগু, গ্রন্থ, এবং ব্রাহ্মী প্রভৃতি) ব্যবহৃত হইবার কোনও বাধা নাই। বিশেষ কার্য্যের জন্য কতকগুলি পণ্ডিত লোক দেশের প্রাচীন বর্ণমালা বলিয়া এক বা একাধিক ভারতীয় বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়া রাখিলে, ভবিষ্যতে সমগ্র জাতির কার্য্য বেশ চলিয়া যাইবে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধা হইতেছে না, অতএব উন্নতি করিবার আবশ্যকতা নাই—এইরূপ মনোভাব সকলে গ্রহণ করিবে না। আমাদের ভালো জিনিসই আছে; আরো ভাল হয় কি না, দেখিতে ক্ষতি কী? ৬০০-র বদলে ৪০, দুই বৎসরের বদলে চারি মাস,—জাতির

অর্থনৈতিক ও সময়-সম্পর্কীয় এবং মানসিক লাভালাভের খাতে এই দুই প্রকারের অঙ্কের অন্তর্নিহিত কথাটি ভাবিয়া দেখিবার নহে কি? স্থিরচিত্তে বিচার করিলে বুঝা যাইবে, একমাত্র sentiment অর্থাৎ জাতীয় লিপির প্রতি প্রাণের টান ছাড়া, রোমান অক্ষরের প্রতিকূলে কোনও যুক্তি নাই। অবশ্য sentiment একটা বড়ো জিনিস, এবং উপেক্ষণীয় নহে। তবে sentiment কেবল অন্ধভক্তি-প্রণোদিত না হইয়া, জ্ঞান- ও ভক্তি-মিশ্র হইলেই আমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়।

সমগ্র সভ্য জগতে যে জাতিগুলি সবচেয়ে অগ্রগামী, তাহাদের মধ্যে রোমান লিপির প্রচলন রহিয়াছে। আরও বহুজাতি রোমান গ্রহণ করিয়াছে, করিতেছে, এবং করিবে। রোমানের মারফৎ সমগ্র জগতের সহিত ভারতের যোগ সাধিত হইলে ক্ষতি কী? রোমান বর্ণমালা এখন আর রোম বা ইতালি বা ইউরোপেই নিবদ্ধ নহে, ইহা এখন সার্বভৌম বর্ণমালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইংরেজি ভাষা আর যেমন খালি ইংরেজ জাতির ভাষা নহে—ইহা সমগ্র জগতে আধুনিক যুগের সভ্যতার মুখ্য ভাষা লইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রোমান অক্ষর আজই কিংবা কালই আমাদের ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাসকে মুছিয়া দিয়া, ভারতীয় বর্ণমালাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, একদিনেই ভারতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করুক্, এরূপ পাগলের প্রলাপ কেহ করিবে না। রোমানের কথাটা উঠিয়াছে; দেশের সংস্কৃতিকে যাঁহারা উপেক্ষা করেন না, এমন চিন্তাশীল লোকেদের কেহ-কেহ ইহার পোষকতা করিতেছেন; জিনিসটা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কী?

একেবারে শিশুদের রোমান অক্ষর শিখাইতে যাওয়া বাতুলতা হইবে। শিশুদের উপর দিয়া পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; দেখা গিয়াছে যে, তাহারা রোমান হরফের সাহায্যে মাতৃভাষা আরও শীঘ্র-শীঘ্র পড়িতে শিখে। কিন্তু রোমান হরফে ছাপা বই দুই-চারিখানির বেশি নাই, এইভাবে শিখিলে তাহাদের কোনও কাজের হয় না, ভারতীয় অক্ষর পরে তাহাদের শিখিতেই হয়। আগে বয়োজ্যেষ্ঠদের বুঝানো দরকার। বছর ৩০।৪০।৫০ ধরিয়া দুই প্রকার বর্ণমালা পাশাপাশি চলিবে—ভারতীয় লিপিতে লেখা ভারতীয় ভাষা, রোমান লিপিতে লেখা ভারতীয় ভাষা। ইংরেজি আছে বলিয়া, এমনি-ই তো রোমান লিপি আমাদের অনেককেই জানিতে হইতেছে। শিক্ষিত লোকের মধ্যে রোমান লিপির সঙ্গে পরিচয় বাড়িতেছে;

ইংরেজ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও, ইংরেজি ভাষা ও সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী, জরমান প্রভৃতি ভাষা আমরা ছাড়িতে পারিব না। কিছু প্রচার দরকার—লিখিত জনসাধারণের মধ্যে, কলেজ ও ইস্কুলে ছাত্রদের মধ্যে, সাধারণ অক্ষর-জ্ঞান-যুক্ত লোকেদের মধ্যে আলোচনার আবশ্যক। রোমান লিপিতে বাঙ্গালা, রোমান লিপিতে হিন্দী, রোমান লিপিতে তেলুগু প্রভৃতি দুই এক স্তম্ভ করিয়া ঐ ঐ ভাষার সাধারণ খবরের কাগজে মাঝে মাঝে ছাপাইতে পারা যায়। রোমান লিপিতে মাতৃভাষা লিখন প্রথমটা কলেজে ও ইস্কুলসমূহের উচ্চ শ্রেণীতে শিখাইতে পারা যায়। লোকে যখন ইহার উপযোগিতা বুঝিবে, তখন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ভারতের সংস্কৃতির, ভারতের ভাষায় উপযোগী করিয়া ইহাকে গ্রহণ করিবে—তখন আর জাতীয় আত্মসম্মান লাঘবের কোনও কথাই থাকিবে না। বাহিরের বা উপরের চাপে ইহার প্রচার বা গ্রহণ ঘটিবে না—ইহার উপযোগিতা বুঝিয়া, আমাদের sentiment বা মনের টানের সঙ্গে মিশ খাওয়াইয়া, তবে আমরা নিজেরা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি।

একাধিক বার ভারতে রোমান লিপি চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কোনও বার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, কারণ সে চেষ্টা বাহির হইতে হইয়াছিল। আংশিক ভাবে দুই এক স্থলে রোমান লিপি চলিয়াছে, কিন্তু এতাবৎ দেশের অবস্থা ইহার পক্ষে অনুকূল ছিল না। পর্তুগীস রোমান কাথলিক পাদরিদের চেষ্টায় গোয়ার ভাষা কোঙ্কণী রোমান লিপিতে লিখিত হয়, গোয়ার খ্রীষ্টানেরা এই লিপি এখনও ব্যবহার করে। বাঙ্গালা ভাষায়ও রোমান লিপি ব্যবহৃত হয় পাদরিদের হাতে, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। কিন্তু তাহা মুষ্টিমেয় খ্রীষ্টানদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এবং পরে তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ হইতেই ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যালোচকগণ সংস্কৃত পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা রোমান লিপিতে লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং পরে ভারতীয় আধুনিক ভাষাও লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। মাঝে মাঝে দুই একজন উৎসাহী ইংরেজ, ব্যাপকভাবে ভারতীয় ভাষা লিখনের জন্য রোমান লিপি ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দেশের লোকেদের সমর্থন বা উৎসাহের অভাবে তাহা কার্য্যকর হয় নাই।

১৯৩৫ সালে একজন ভারতীয় সিভিলিয়ান শ্রীযুত এ. লতীফী ভারতের তাবৎ ভাষার জন্য All-India Alphabet (বা Latifi Alphabet) নাম দিয়া রোমান অক্ষরের আধারের উপরে একটি বর্ণমালা প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রচার করিয়াছিলেন। এই বর্ণমালায় রোমান বর্ণগুলির অতিরিক্ত নূতন কতকগুলি অক্ষর তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,—এই সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলিকে ধ্বনিবাচক চিহ্ন রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। লতীফী সাহেবের এই All-India-Alphabet ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে ; নানা বিষয়ে ইহা খুব গ্রহণযোগ্য নহে। আমি অন্যত্র ইহার সমালোচনা করিয়াছি। লতীফী সাহেব বড়োদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কবাড় বাহাদুরের কতকটা সমর্থন পাইয়াছিলেন, মহারাজার আনুকূল্যে তাঁহার প্রস্তাবিত 'লতীফী বর্ণমালা'র অল্প একটু প্রচারও হইয়াছিল।

রোমান বর্ণমালা ভারতীয় ভাষায় প্রয়োগ করিতে হইলে, কতকগুলি মুখ্য বিষয়ে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। যে কয়টি রোমান অক্ষর সর্বত্র পাওয়া যায়, কেবল সেইগুলিতেই যাহাতে কাজ চলে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। সম্পূর্ণ নূতন অক্ষর হইলে, বা প্রচলিত অক্ষরের সঙ্গে মাত্রা বা চিহ্ন জুড়িয়া নূতন অক্ষর প্রস্তুত করিলে, রোমান অক্ষর চালানো কঠিন হইবে—কারণ এরূপ অক্ষর দুর্লভ—ভারতীয় ভাষায় রোমান বর্ণমালার পরীক্ষা বা সমীক্ষার যুগে খুব কমই ছাপাখানা নূতন অক্ষর কিনিয়া আনিতে বা নূতন অক্ষরের ছেনি কাটাইয়া আনিতে রাজী হইবে।

এই সমীক্ষার জন্য, ভারতীয় ভাষায় চলে কিনা তাহা দেখিবার জন্য, বাঙ্গালা বা নাগরী অক্ষরের পাশাপাশি বা সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহারের উদ্দেশ্য লইয়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃতের উপযোগী রোমান বর্ণমালা নীচে প্রদর্শিত হইতেছে।

এই প্রস্তাবিত **ভারত-রোমক** বর্ণমালায় **a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ**, সর্বত্র প্রাপ্য এই সাতাশটি রোমান অক্ষর ব্যবহৃত হইবে। ইহার সবগুলি বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃতের জন্য দরকার হইবে না, কতকগুলির ব্যবহার ফারসী, উর্দু প্রভৃতির জন্য নিবদ্ধ থাকিবে। এতদ্ভিন্ন এরূপ ব্যবস্থাও থাকিবে যে, আবশ্যক হইলে, **c e f h j k v** এই কয়টি অক্ষরকে উল্টাইয়া নূতন অক্ষররূপে, অর্থাৎ **ɔ ə ɟ ɥ ſ ʞ ʌ** রূপে ব্যবহার করা যাইবে। এই নূতন অক্ষরের দ্বারা ও প্রচলিত ২৭টি অক্ষরের দ্বারা,

এবং নিম্নে প্রদর্শিত কয়টি indicator বা 'সূচক-চিহ্ন' সাহায্যে, ভারতীয় ভাষাবলীর প্রায় তাবৎ ধ্বনি বা অক্ষর দ্যোতিত হইতে পারিবে।

কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হইবে বলিতে পারি, ইংরেজিতে প্রচলিত এই ২৭টি বর্ণ ছাড়া অন্য প্রকারের নূতন বর্ণ—তাহা পুরাতন অক্ষরকে উল্‌টাইয়া লইয়াই হউক, অথবা গ্রীক রুষ প্রভৃতি বর্ণমালায় ২।৪টি অক্ষর ধার করিয়া লইয়াই হউক—লোকে সাধারণতঃ লইতে চাহিবে না। সমস্ত ছাপাখানায় এইরূপ নূতন আকারের বর্ণ মিলিবে না, এবং জনসাধারণ অপরিচিত বলিয়া এই-সব নূতন আকারের বর্ণ সম্বন্ধে উদাসীন অথবা বিরোধীই থাকিবে। সেইজন্য, প্রস্তাবিত 'ভারত-রোমক' বর্ণমালায় কেবল ইংরেজিতে ব্যবহৃত ২৭টি অক্ষরই রাখিতে হয়। তবে, ফরাসীতে বহুল প্রচলিত ও ফরাসী বর্ণমালায় ব্যবহৃত, আমাদের হাতের কাছে যাহা তৈয়ার রহিয়াছে এবং যাহা পাঠে ও প্রয়োগে অসুবিধা হইবে না, দীর্ঘস্বর জানাইবার জন্য এইরূপ টুপী-মাথায় এই পাঁচটি স্বরের হরফ 'ভারত-রোমক' বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়—সে পাঁচটি হরফ এই—â ê î ô û।

প্রস্তাবিত-সূচক চিহ্নগুলি এই—

[˙ : ′ ″ ']

˙=ফুট্‌কি বা বিন্দু;

:=কোলন, বা দুই বিন্দু;

′=বাড়ি, বা মিনিট চিহ্ন;

″=দুই বাড়ি, বা সেকেণ্ড চিহ্ন;

'=টিকি বা ঊর্ধ্ব কমা।

প্রচলিত রোমান হরফের পাশে (অর্থাৎ পরে) এই সূচক চিহ্নগুলিকে যথা-আবশ্যক বসাইয়া দিয়া, মূল রোমান হরফ বা বর্ণ এবং সংযোজিত সূচক-চিহ্ন এই দুইকে মিলাইয়া, নূতন অক্ষর গঠিত হইবে—অতি সহজে বিনা আয়াসে। উপরন্তু পৃথক্ নূতন হরফের দরকার হইবে না। যেমন, **n˙**, **n:**, **n″**, **t'**, **s'**, **a'**, **u′**, **m˙** ইত্যাদি।

একটা বড়ো কথা। ভারত-রোমক লিপিতে রোমান বর্ণমালার capital letters প্রযুক্ত হইবে না। ইহাতে অনাবশ্যক ২৭টি হরফ বাদ পড়িল। স্থান- ও পাত্র-বাচক নাম—Proper Noun—জানাইতে, নামের পূর্বে [*] তারকা-চিহ্ন দিলেই চলিবে। এবং 'খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ, ঢ়'—এই

১১টি মহাপ্রাণ বর্ণের বিশ্লেষ করিয়া অল্পপ্রাণ বর্ণ **k g c j t' d' t d p b r'**-এ প্রাণ বা হ-কার (**h**) যোগ করিলেই চলিবে—১১টি অক্ষরের বোঝা কমানো যাইবে।

প্রস্তাবিত ভারতীয়-রোমক বর্ণমালা এইরূপ দাঁড়াইবে (অক্ষরের পাশে বন্ধনীর মধ্যে যে নামে অক্ষরগুলিকে অভিহিত করিতে হইবে তাহা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইল—স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহাদের ইংরেজি নাম সর্বদা বর্জনীয়)—

ভারত-রোমক বর্ণমালা

(বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার জন্য)

স্বরবর্ণ

a = অ ;

â অথবা a´ = আ (ফরাসীতে ব্যবহৃত এই â পাওয়া না গেলে, a ব্যবহার করিতে হইবে);

i = ই ; î, অভাবে **i´** = ঈ ;

u = উ ; û, অভাবে **u´** = ঊ ;

r˙ = ঋ ; **r:** = ৠ ;

l˙ = ঌ ; **l:** = ৡ ;

e = এ ; **o** = ও ; (দক্ষিণের ভাষায়, **e o** = হ্রস্ব এ, হ্রস্ব ও ; ê বা **e´** = দীর্ঘ এ ; ô বা **o´** = দীর্ঘ ও।)

ai = ঐ ; **au** = ঔ ; (**aï**, বা **a-i** = অ-ই ; **aü** বা **a-u** = অ-উ।)

am˙ = অং ; **an:** = অঁ ; **ân:** বা **a´n:** = আঁ ; **ah:** = অঃ।

ব্যঞ্জনবর্ণ

k (= ক) ; **kh** (= ক-য়ে হ, বা ক-য়ে প্রাণ খ) ; **g** (গ) ; **gh** (গ-য়ে হ, বা গ-য়ে প্রাণ ঘ) ; **n˙** (মাথায়-ফুটকি ঙ) ;

c (চ) ; **ch** (চ-য়ে হ, বা চ-য়ে প্রাণ ছ) ; **j** (বর্গীয় জ) ; **jh** (জ-য়ে প্রাণ বা জ-য়ে হ ঝ) ; **n˝** (মাথায় দুই বাড়ি ঞ) ;

t' (মাথায়-টিকি ট) ; **t'h** (ট-য়ে প্রাণ বা ট-য়ে হ ঠ) ; **d'** (মাথায়-টিকি ড) ; **d'h** (ড-য়ে হ বা ড-য়ে প্রাণ ঢ) ; **n'** (মাথায়-টিকি মূর্দ্ধন্য ণ) ;

t (ত); th (ত-য়ে হ বা ত-য়ে হ প্রাণ থ); d (দ); dh (দ-য়ে হ বা দ-য়ে প্রাণ ধ); n (দন্ত্য ন);

p (প); ph (প-য়ে হ বা প-য়ে প্রাণ ফ); b (পুঁটলি-আলা বর্গীয় ব); bh (ব-য়ে প্রাণ বা ব-য়ে হ ভ); m (ম);

y (দো-ফরকা অন্তঃস্থ য়); r (র); l (ল); w (আনাগোনা অন্তঃস্থ ওয়);

s" (মাথায় দুই বাড়ি তালব্য শ); s' (মাথায়-টিকি মূর্ধন্য ষ); s (সাপ-খেলানো দন্ত্য স); h (হ); r' (মাথায়-টিকি ড়); r'h (ড়-য়ে হ বা ড়-য়ে প্রাণ ঢ়);

ks' (ক-য়ে মূর্ধন্য ষ ক্ষ), jn" (জ-য়ে ঞ জ্ঞ)।

মন্তব্য—(১) j=বর্গীয় জ; y=অন্তঃস্থ য় (=y); কিন্তু বাঙ্গালা উড়িয়ার 'য' (=অন্তঃস্থ 'জ') জানাইবার জন্য, উচ্চারণ ধরিয়া j লেখাই সুবিধার হইবে। তবে অন্তঃস্থ-য-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য জানাইবার জন্য, য=j" ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন, 'যাওয়া' শব্দ: jâwâ বা ja'wa' লেখাই সহজ হইবে, j"âoyâ বা j"a'oya' একটু কিম্ভূতকিমাকার হইবে। তবে বাঙ্গালায় অগণিত সংস্কৃত শব্দের বেলায় j" লেখা যাইতে পারে; যথা যোগ= j"og, যদি=j"adi, যাজ্ঞবল্ক্য=*j"âjn"abalkya, শুদ্ধ সংস্কৃত রূপ *yâjn'avalkya ইত্যাদি।

(২) শুদ্ধ সংস্কৃতে 'ড়, ঢ়' (r', r'h) নাই, কেবল 'ড, ঢ' (d', d'h).

(৩) সংস্কৃতের প্রতিবর্ণীকরণে 'বর্গীয় ব' (=b) এবং 'অন্তঃস্থ ব, বা ৱ' (=v) সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন, বাঙ্গালার জন্য æ অক্ষরটিকে বাঙ্গালার বাঁকা এ-কারের প্রতীক স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন, æk=এক, ekt'i=একটি; এবং চলিত বাঙ্গালার ইলেক-দেওয়া অ' (যেমন, ক'রে, চ'লে) ও আ' (যেমন, কা'ল) কে a' ও â' (বা a" রূপে লেখা চলিতে পারে—যথা, করে, চলে= kare, cale; ক'রে, চ'লে=ka're, ca'le; কাল=সময়, kâl, ka'l; 'কল্য'-অর্থে কা'ল=kâ'l, ka"l.

অক্ষরগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য

a=অ; বাঙ্গালা ও হিন্দীতে অ-কার, আ-কারের ধ্বনি হইতে পৃথক্, আ-কার এই দুই ভাষায় অ-কারের ধ্বনির দীর্ঘ রূপ নহে; আমরা 'স্বরে অ',

'স্বরে আ' বলি, কদাচ 'হ্রস্ব অ', 'দীর্ঘ আ' বলি না। কিন্তু সংস্কৃত হ্রস্ব-দী পদ্ধতি বজায় রাখিয়া—**a**=অ, â (বা **a'**)=আ।

শব্দের শেষে আধুনিক ভাষায় অনুচ্চারিত অ-কার ভারত-রোমকে লিখি হইবে না।

r'—একটি ফুটকি দ্বারা, **r:**=দীর্ঘ ঋ-কারের বর্ণ বা ধ্বনি হইতে পার্থক জানানো হইল। তদ্রূপ **l'**=ঌ, **l:**=ৡ।

n:—সানুনাসিকতার জন্য রোমান বর্ণমালায় (স্পেন দেশে ব্যবহৃত) যে tilde চিহ্ন আছে, (ইহার রূপ ~, স্বরের মাথায় বসে)—তাহা সর্বত্র সুলভ নহে বলিয়া, আমাদের প্রস্তাবিত ভারত-রোমক লিপিতে প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। [**:**] চিহ্ন (দুই বিন্দু) নাসিক্য **n**-বর্ণের পরে বসাইয়া, সমগ্র **n:**-কে, ँ=চন্দ্রবিন্দুর প্রতীকরূপে, স্বরের হরফের পরে ব্যবহার করা যাইবে; যেমন পাঁচ=**pân:c** বা **pa'n:c**, কাঁপ=**kân: p**)।

n'', s'',=ঞ, শ; ''-দ্বারা তালব্য ধ্বনি প্রকাশিত হইবে।

মাথায়-দীর্ঘ-মাত্রা-যুক্ত রোমান অক্ষর পাওয়া দুর্লভ, তাই অনন্যোপায় হইয়া স্বরবর্ণের স্বরে 'একবাড়ি' চিহ্ন দিয়া দীর্ঘস্বর জানানো হইবে—যথা â, ê, î, ô, û=আ, এ (দীর্ঘ), ঈ, ও (দীর্ঘ), ঊ-স্থলে **a'**, **e'**, **i'**, **o'**, **u'**। তলায় ফুট্‌কি বা অন্য চিহ্ন চক্ষুর পক্ষে পীড়াদায়ক—কিন্তু মাথায় বা পাশে চিহ্ন থাকিলে, পড়ার সময় কষ্ট হয় না; অধিকন্তু পৃথক্ বিশেষ চিহ্নের সহিত সংযুক্ত নূতন অক্ষরেরও আবশ্যকতা থাকে না।

বিদেশী ধ্বনি বা অক্ষরের জন্য ɔ, ə, ɥ, ʃ, ɱ, ɭ, **v**, **q**, **x**, **z''**, **z'**, **h'** ব্যবহৃত হইবে। ɔ, বিকল্পে বাঙ্গালা অ-কারের জন্য চলিতে পারে—কিন্তু হিন্দী ও সংস্কৃতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অ-কারের জন্য **a** ব্যবহার করাই ভালো।

বিদেশী ভাষার ধ্বনির জন্য প্রস্তাবিত বর্ণ—

ə=ইংরেজির অস্পষ্ট আ-কার (যথা—ago, China প্রভৃতি শব্দের a), **ɥ**=আরবীর 'অয়ন্ বা আয়েন' অক্ষর—সাধারণতঃ রোমান লিপিতে ইহা ['] রূপে প্রদর্শিত হয়; **f**, **v**—ইংরেজির দন্তৌষ্ঠ্য **f**, **v**-র ধ্বনি; **q**—উর্দূ, ফারসী, আরধীর 'বড়ী কাফ' অক্ষর; **x**=উর্দূ, ফারসী, আববীর 'খে' অক্ষর; **z**—ইংরেজির **z**, ফারসী ও উর্দূর জাল, জে, জোআদ ও জোয় অক্ষরগুলির জন্য; **z''**—ফারসীর ঝে অক্ষরের জন্য, ও ফরাসী j-র

ধ্বনির জন্য ; h' = আরবীর 'বড়ী হে' অক্ষরের জন্য ; ! = আরবীর 'আলিফ-হামজা'র জন্য।

ভারতীয় নামে অভিহিত এবং ভারতীয় বর্ণ-ক্রমে সজ্জিত 'ভারত-রোমক'-লিপির বর্ণমালা শিখিবার পরে, ভারতীয় বালক-বালিকাগণ যখন ইংরেজি শিখিবে, তখন ইংরেজি First Book পড়িবার কালে a, b, c, বলিয়া শিখিবে না; তাহারা ভারতীয় ভাবেই শিখিবে। ইংরেজি শব্দেরও বানান করিবার সময়ে তাহারা অক্ষরগুলির ভারতীয় নাম-ই বলিবে। ইংরেজি neighbour (n-e-i-g-h-b-o-u-r) শব্দ বানান করিতে —'দন্ত্য ন-এ-ই-গ-হ-ব-ও-উ-র' বলিবে, ইংরেজির মোতাবেক 'এন্-ঈ-আই-জী-এইচ্-বী-ও-য়ু-আর্' বলিবে না; যেমন ফরাসী দেশের ছেলে, ঐ ইংরেজি শব্দের বানান করিবার কালে, নিজ ভাষায় অক্ষরগুলির নাম অনুসারে— এন্-অ্যা-ই-ঝী-আশ্-বে-ও-য়ু-এয়ার্' বলে; কিংবা যেমন স্পেন-দেশের ছেলে, 'এনে-এ-ই-খে-আচে-বে-অ-উ-এরে', অথবা সুইডেনের ছেলে, 'এন্-এ-ঈ-ইয়ে-হো-বে-উ-এরে' বলে। তদ্রূপ *bhârater—এই শব্দ বাঙ্গালায় বানান করা হইবে—তারা-চিহ্ন, ব-য়ে হ ভ (bh), আ (â), র (r), অ (a), ত (t), এ (e), র (r)'; দৃষ্টি dr's't'i = 'দ (d), (মাথায় ফুটকি) ঋ-ফলা (r'), (মাথায় টিকি) মূর্দ্ধন্য ষ (s'), (মাথায় টিকি) ট (t'), ই (i)'। 'মাথায় ফুটকি, মাথায় টিকি, আনাগোনা র (w)' ইত্যাদি বর্ণনা, শিশু বা প্রথম শিক্ষার্থীদের চিত্তবিনোদন অথবা স্মরণ-বিষয়ে সাহায্যের জন্য প্রস্তাবিত হইতেছে।

বাঙ্গালায় এই ভারত-রোমক বর্ণমালার প্রয়োগ দেখাইবার জন্য, নিম্নে এই প্রবন্ধের প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদ এই বর্ণমালায় মুদ্রিত হইল। এই মুদ্রণ-কার্য্যে কোনও হরফের জন্য ছাপাখানার ইংরেজি টাইপ-কেসের বাহিরে যাইতে হয় নাই।

ভারতের সমস্ত ভাষা রোমান অক্ষরে লিখিবার একটি
***bhârater samasta bhâs'â *român aks'are likhibâr e'kt'i**
প্রস্তাব বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই প্রস্তাবটি
prastâb bahu kâl dhariyâ caliyâ âsiteche. ei prastâb-t'i
আপাত-দৃষ্টিতে এমনিই অনাবশ্যক ও জাতীয়তা--বিরোধী যে
âpâta-dr's't'ite emanii anâbas''yak o jâtîyatâ-birodhî j''e

আমাদের দেশে সকলেই এই প্রস্তাব উত্থাপন-মাত্রেই তাহা
âmâder des"e sakalei ei prastâb utthâpan-mâtrei tâhâ
জাতীয়তা-বোধ-বর্জিত পাগলের প্রলাপ বলিয়া "পত্র-পাঠ"
jâtîyatâ-bodh-barjita pâgaler pralâp baliyâ "patra-pât'h"
বর্জন করিয়া বসেন, তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে
barjan karîyâ basen, tâhâr sambandhe konao kathâ s"unite
চাহেন না। কিন্তু প্রস্তাবটি উঠিয়াছে; যদিও এখন
câhen nâ. kintu prastâb-t'i ut'hiyâche ;—j"adi-o ækhan
মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইহার পক্ষে, এবং দেশের জন-সাধারণ
mus't'imeya byakti ihâr paks'e, ebam' des"er jana-sâdhâran'
ইহার সম্বন্ধে উদাসীন অথবা ইহার বিরোধী; আমার মনে
ihâr sambandhe udâsîn athabâ ihâr birodhî ; âmâr mane
হয়, শিক্ষিত জন-গণের মধ্যে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে,
hay, s"iks'ita jana-gan'er madhye dhîre dhîre, ati dhîre,
এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে। তুর্কী দেশে আতাতুর্ক
e-dike dr's't'i âkars'ita haiteche. *turkî des"e *âtâ-turk
কামাল পাশা রোমান হরফ চালাইয়াছেন, সকলেই তাহার
***kâmâl pas"â *român haraph câlâiyâchen, sakalei tâhâr**
তারিফ করিতেছে—সমগ্র আরবী কোরান রোমান হরফে
târiph kariteche—samagra *ârbî *korân *român haraphe
ছাপা হইয়াছে; পারস্যে-ও রোমান অক্ষর গ্রহণের
châpâ haiyâche ; *pârasye-o *român aks'ar grahan'er
প্রস্তাব উঠিয়াছে, এবং ফারসি ভাষায় ইউরোপীয় স্বর-
prastâb ut'hiyâche, ebam' *phârsi bhâs'ây *iuropîya swara-
লিপি ব্যবহৃত হয় বলিয়া, এই স্বর-লিপির সহিত যে সব
lipi byabahr'ita hay baliyâ, ei swara-lipir sahit j"e sab
ফারসি গান প্রকাশিত হয়, বাধ্য হইয়া রোমান হরফেই
***phârsi gân prakâs"ita hay, bâdhyâ haiyâ *român haraphei**
লিখিত ও মুদ্রিত হইতেছে।
likhita o mudrita haiteche.

ভারতীয়-রোমক লিপিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

নিরুদ্দেশ-যাত্রা

niruddes"-j"âtra

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত)

(s"rîj"ukta *rabîndranâth *t'hâkur racita)

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী ?
âr kato dûre niye j"âbe more, he sundarî ?

বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী ?
balo, kon pâr bhir'ibe tomâr sonâr tarî ?

যখনই শুধাই, ওগো বিদেশীনী,
j"akhani s"udhâi, o go bides"înî,

তুমি হাসো শুধু মধুর-হাসিনী ;—
tumi hâso s"udhu, madhura-hâsinî ;—

বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে তোমার মনে।
bujhite nâ pâri, ki jâni ki âche tomâr mane.

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি—
nîrabe dækhâo an'guli tuli—

অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি—
akûl sindhu ut'hiche âkuli—

দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন-কোণে।
dûre pas"cime d'ubiche tapan gagan-kon'e.

কি আছে হোথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে ?
ki âche hothây, ca'lechi kiser anwes'an'e ?

অবশেষে ভারতীয়-রোমক লিপিতে সংস্কৃতের নিদর্শন-রূপে গীতার প্রথম দুইটি শ্লোক দিতেছি—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ :

***dhr'tarâs't'ra uvâca :**

ধর্ম-ক্ষেত্রে কুরু-ক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
dharma-ks'êtrê *kuru-ks'êtrê samavêtâ yuyutsavah:/

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিম্ অকুর্বত সঞ্জয়॥
mâmakâh: *pân'd'avâs"caiva kim akurvata *san"jaya//

সঞ্জয় উবাচ :

*san''jaya uvâcą :

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং

dr's'tvâ tu *pân'd'avânîkam' vyûd'ham'

দুর্যোধনস্ তদা।

***duryôdhans tadâ/**

আচার্যম্ উপসংগম্য রাজা বচনম্ অব্রবীৎ॥

âcâryam upasan'gamya râjâ vacanam abravît//

ছাপার কাজে রোমান অক্ষরের আর এক সুবিধার কথা বলিয়া—পূর্বে যে কথার উল্লেখ করা হয় নাই—আপাততঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রোমান অক্ষরগুলি স্বল্পরেখ ও সরল হওয়ায়, ইহার টাইপ খুব ছোটো করা যায়, এবং টাইপ ভাঙ্গেও কম, ও কালিতে জোবড়া হয়ও কম। বাঙ্গালাতে সাধারণতঃ স্মল-পাইকায় ছাপা হয়। আবার নাগরীতে স্মল-পাইকা বেশি চলে না, পাইকার-ই চল বেশি; বর্জাইসের মতো ছোটো অক্ষর নাগরীতে অত্যন্ত কম ব্যবহৃত হয়। জটিল অক্ষর বেশি ভঙ্গুর হয় বলিয়া, ও কালিতে বেশি জোবড়া হয় বলিয়া, চক্ষুর পক্ষে হানিকর। রোমান অক্ষরের মতো সরল বা স্বল্পরেখ অক্ষরে সে বিপদ্ কম।

পরিশেষে আর একটি কথা বলা উচিত। প্রস্তাবিত 'ভারত-রোমক বর্ণমালায় সূচক-চিহ্ন ব্যবহারের যে পদ্ধতি প্রদত্ত হইল, তাহা পরীক্ষা-মূলক মাত্র, চরম কিছু নহে। বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা ও অভিমত লইয়া এই পদ্ধতির খণ্ডন বা মণ্ডন অপেক্ষিত। রোমান লিপিতে প্রত্যক্ষর করার নীতি গৃহীত হইলে, বাকি সমস্ত সহজ ও সর্বজন-মান্য করিয়া লইতে দেরী হইবে না॥

"শারদীয়া আনন্দবাজার" পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত (১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)। কিছু-কিছু সংযোজন-সহ সংশোধিত রূপে পুনর্মুদ্রিত।